আশারায়ে মুবাশ্‌শারাসহ

জান্নাতী ২০ সাহাবী

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

আশারায়ে মুবাশ্‌শারাসহ

জান্নাতী
২০ সাহাবী

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

আশারায়ে মুবাশ্‌শারাসহ

জান্নাতী ২০ সাহাবী

সংকলনে

মো: নূরুল ইসলাম মণি

মো: রফিকুল ইসলাম

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী প্রথম
এম.এফ, এম.এ
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও: আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আশারায়ে মুবাশ্‌শারাসহ

জান্নাতী
২০ সাহাবী

প্রকাশক

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা - ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর - ২০১১ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : বাকো প্রেস

বাংলাবাজার, ঢাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

ISBN : 978-984-8885-29-1

সম্পাদকীয়

আশারায়ে মুবাশ্‌শারাসহ জান্নাতী ২০ সাহাবী নামক এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শোকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা গ্রন্থটির নাম দিয়েছি **আশারায়ে মুবাশ্‌শারাসহ জান্নাতী ২০ সাহাবী**। জান্নাতের শুধু ১০ সাহাবীই নয় বরং বদর ও বাইয়াতে রেদওয়ানে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারাও জান্নাতী। তারপরও রাসূল ﷺ বিশেষ একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ জনকে জান্নাতী বলে ঐতিহাসিক ঘোষণা দেন।

সাহাবা আরবি ভাষার শব্দ। এর একবচন সাহাবী। সাহাবী অর্থ সঙ্গী বা সাথী। যারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁকে নিজ চোখে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন তাঁরাই সাহাবা নামে পরিচিত।

মানব জাতির মধ্যে নবী ও রাসূলগণ সবচেয়ে বেশি সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য। তাঁদের পর তাঁদের সাহাবাগণই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাই সাহাবা শব্দের পর কেরাম كِرَامٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেরাম মানে সম্মানিত। সাহাবায়ে কেরাম মানে সম্মানিত সাহাবাগণ। শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ রাসূলগণের মধ্যে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি তাঁর সাহাবাগণও আর সব নবীর সাহাবাগণ থেকে বেশি মর্যাদার অধিকারী।

কোন সাহাবীর নাম নিলে নামের শেষে (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) বলতে হয়। এ কথার অর্থ হলো আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ কুরআনেই একথা ঘোষণা করেছেন যে 'আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট।'

ভাবতে অবাক লাগে যে, সেকালে আরবের মানুষ অসভ্য ও বর্বর ছিল বলে ইতিহাসে লেখা আছে। অথচ তাদের মধ্যে যারাই

রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর সাথী হয়েছেন তাঁরা কয়েক বছরের মধ্যেই মানুষ হিসেবে এত উন্নত কি করে হলেন? কোন যাদুর পরশে একটা অসভ্য সমাজের লোকেরা মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হলেন?

ইসলামই ঐ যাদু যা মেনে চলার কারণে অসভ্য মানুষও এমন সভ্য হতে পারে। রাসূল ﷺ নিজে ইসলাম মেনে চলেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম মনে প্রাণে রাসূল ﷺ-কে অনুসরণ করেছেন। রাসূল ﷺ নিজে মানব জাতির সবচেয়ে বড় আদর্শ। আর রাসূল ﷺ-কে কিভাবে মেনে চলতে হবে সে সব বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামই কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় আদর্শ।

তারিখ : ডিসেম্বর – ২০১১

সূচিপত্র

১. আবু বকর সিদ্দীক (রা)

রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবু বকরের ইহসানসমূহ এমন যে, তা পরিশোধ করতে আমি অপারগ। তার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহই দেবেন। তার অর্থ সম্পদ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন উপকারে আসেনি।

আবু বকর ও উমার (রা) ঐ সমস্ত জান্নাতীদের সরদার হবেন যারা বৃদ্ধ বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ طَلَعَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَانِ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، يَا عَلِىُّ لاَتُخْبِرْهُمَا ـ

আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ করে আবু বকর ও ওমর (রা) চলে আসল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তারা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের সরদার হবে, চাই তারা পূর্ববর্তী উম্মতের লোক হোক আর পরবর্তী উম্মতের। তবে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত। হে আলী! তুমি এ সংবাদ তাদেরকে দিও না। (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবু বকর সিদ্দীক- ৩/২৮৯৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতী হওয়ার সুংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা' বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى

الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ ـ

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ্ জান্নাতী।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবদুর রহমান ইবনে আওফ– ৩/২৯৪৬)

নাম ও পরিচিতি

নামকরণ : ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর (রা)-এর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ, উপাধি সিদ্দীক ও আতীক ডাক নাম বা কুনিয়াত আবু বকর। পিতার নাম 'উসমান, কুনিয়াত আবু কুহাফা। মাতার নাম উম্মুল খায়র সালমা বিনতে সখর।

নসবনামা : কুরাইশ বংশের ওপর দিকে ষষ্ঠ পুরুষ 'মুররাতে গিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নসবের সাথে তাঁর নসব একত্রিত হয়েছে। তিনি রাসূল ﷺ-এর দু'বছর চার মাসের 'ছোট। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর চাচাতো ভাই। পরে হযরত আশেয়া (রা) কে রাসূল ﷺ-এর কাছে বিয়ে দিয়ে রাসূল ﷺ-এর সম্মানিত শ্বশুরের মর্যাদা লাভ করেন।

জন্ম তারিখ : আবু বকর (রা) হিজরতের ৫০ বছর ৬ মাস পূর্বে 'আমুল ফীল'-এর ২ বছর চার মাস পরে ৫৭১-৫৭২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ-এর জন্মের দু'বছরের সামান্য কিছু বেশি সময় পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং অনুরূপ সময়ের ব্যবধানে তাঁরা উভয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন। তাই ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল রাসূলে করীম ﷺ-এর বয়সের সমান।

দৈহিক কাঠামো : তিনি ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, হালকা-পাতলা ছিপছিপে ও প্রশস্ত দেহের অধিকারী। শেষ বয়সে চুল পেকে গিয়েছিল তাই মেহেদীর খিজাব লাগাতেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের পূর্ব থেকেই রাসূল(সা)-এর সাথে তার সখ্যতা ছিল। ইসলাম গ্রহণকারী নারী-পুরুষের মাঝে তিনি দ্বিতীয় এবং বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম।

চারিত্রিক গুণাবলী : আবু বকর (রা) ছিলেন সম্মানিত কুরাইশ বংশের ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। জ্ঞান, মেধা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সচ্চরিত্রতার জন্য আপামর মক্কাবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জাহিলী যুগে মক্কাবাসীদের দিয়াত বা রক্তের ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ অর্থ তাঁর কাছে রাখা হতো। আরববাসীর নসব বা বংশবিষয়ক জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। কাব্য প্রতিভাও ছিল প্রচুর। অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল-ভাষী ছিলেন। বক্তৃতা ও বাগ্মিতায় আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

অমায়িক ব্যক্তিত্ব : তিনি ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র, বন্ধুবৎসল ও অমায়িক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, দানশীল ও চরিত্রবান। জাহিলী যুগেও কখনো তিনি শরাব পান করেননি। তাঁর অমায়িক মেলামেশা, পাণ্ডিত্য ও ব্যবসায়িক দক্ষতার কারণে অনেকেই তাঁর সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা গড়ে তুলতো। প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিয়মিত মজলিশ বসতো।

পিতার পরিচিতি : কুরাইশদের মধ্যে আবু বকর (রা)-এর পিতা আবু কুহাফা যথেষ্ট মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন বয়োঃবৃদ্ধ ও স্বচ্ছল। তাঁর ঘর একমাত্র ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না, সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর মতামত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হতো। মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তিনি আকৃষ্ট না হলেও পুত্র আবু বকরকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এমন কোন তথ্য প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। অবশ্য আলী (রা)-কে তিনি দেখলেই বলতেন : 'এ ছেলেটাই আমার ছেলেটিকে বিগড়ে দিয়েছে।' মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল করীম(সা)-এর খিদমতে হাজির হয়ে ইসলামের সুমহান ঘোষণা দান করেন।

মাতার পরিচিতি : আবু বকরের মা উম্মুল খায়ের স্বামীর অনেক পূর্বে মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্যায়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন। মক্কার 'দারুল আরকামে' ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। স্বামীর মতো তিনিও দীর্ঘজীবন লাভ করেন। প্রায় ৯০ বছর বয়সে সন্তানকে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত রেখে ইন্তিকাল করেন।

পিতার একমাত্র সন্তান : আবু বকর পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। অত্যন্ত আদর যত্ন ও প্রাচুর্যের মধ্যে পালিত হন। শৈশব থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত পিতার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। বিশ বছর বয়সে পিতার ব্যবসা- বাণিজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

সিরিয়া গমন : শৈশব থেকে রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে আবু বকরের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাসূল করীম ﷺ-এর বেশির ভাগ বাণিজ্য সফরের সাথী ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় আঠারো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স বিশ। তাঁরা যখন সিরিয়া সীমান্তে উপনীত হলেন; তখন বিশ্রামের জন্য নবী করীম ﷺ একটি গাছের নিচে বসেন। আবু বকর একটু সামনে অগ্রসর হয়ে এদিক ওদিক দৃষ্টি দিতে লাগলেন।

এক খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয় এবং ধর্ম বিষয়ে কিছু আলাপ-আলোচনা হয়। আলাপের মাঝখানে পাদ্রী জিজ্ঞেস করে, ওখানে গাছের নিচে কে? আবু বকর বললেন, এক কুরাইশ যুবক, নাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ। পাদ্রী বলে উঠল, এ ব্যক্তি আরবদের নবী হবেন। পাদ্রীর কথা শুনে আবু বকরের অন্তর আপ্লুত হয়ে উঠে। তখন থেকেই তাঁর অন্তরে নবী করীম ﷺ-এর প্রকৃত নবী হওয়া প্রসঙ্গে প্রত্যয় দৃঢ় হতে থাকে।

বয়স্কদের মধ্যে প্রথম মুসলমান : নবী করীম ﷺ-এর নুবওয়াত লাভের ঘোষণায় মক্কায় হৈ চৈ পড়ে গেল। মক্কার প্রভাবশালী ধনী নেতৃবৃন্দ তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল। কেউবা তাঁকে পাগল, কেউবা জ্বীনে আছর করেছে বলতে থাকে। নেতৃবৃন্দের ইশারায় ও তাদের দেখাদেখি সাধারণ মানুষও ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকে। এ বিষয়ে রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : 'আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেছি, একমাত্র আবু বকর ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু দ্বিধা-দ্বন্দের ভাব লক্ষ্য করেছি।' এভাবে আবু বকর হলেন বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম মুসলমান।

দাওয়াতী কাজে মনোনিবেশ : ইসলাম গ্রহণের পর দ্বীনের ভিত্তি সুদৃঢ় করার মানসে তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে দাওয়াতী কাজে নিজেকে মনোনিবেশ করেন। মক্কার আশপাশের সম্প্রদায়সমূহে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে লাগলেন। হজ্জের সময় বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে মানুষদের ইসলামের দাওয়াত

দিতেন। বহিরাগত মানুষের নিকট ইসলামের ও রাসূলের ﷺ পরিচয় তুলে ধরতেন। এভাবে আরববাসী রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রচারিত দ্বীন সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর ওপর ঈমান আনে। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ও চেষ্টায় তৎকালীন কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট যুবক উসমান, যুবাইর, আবদুর রহমান, সা'দ ও তালহার মতো ব্যক্তিবর্গসহ আরো অনেকে ইসলাম কবুল করেছিলেন।

দানশীলতা : রাসূলে করীম ﷺ-এর যখন নবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন, তখন আবু বকরের নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর সকল ধন-সম্পদ ওয়াক্‌ফ করে দেন। কুরাইশদের থেকে যেসব দাস-দাসী ইসলাম গ্রহণের কারণে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, এ অর্থ দ্বারা তিনি সেসব দাস-দাসী ক্রয় করে আযাদ করেন। তেরো বছর পর যখন রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে তিনি মদীনায় হিজরত করেন, তখন তাঁর নিকট এ অর্থের মাত্র আড়াই হাজার দিরহাম বাকি ছিল।

অল্পদিনের মধ্যে বাকি দিরহামগুলোও ইসলামের জন্য ব্যয় করা হয়। বেলাল, খাব্বাব, আম্মার, আম্মারের মা সুমাইয়্যা, সুহাইব, আবু ফুকাইহ প্রমুখ দাস-দাসী তাঁরই অর্থের বিনিময়ে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করেন। তাই পরবর্তীকালে রাসূলে করীম ﷺ- বলেছেন : আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবু বকরের ইহসানসমূহ এমন যে, তা পরিশোধ করতে আমি অপারগ। তার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহই দেবেন। তার অর্থ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন উপকারে আসেনি।

রাসূলের বিশ্বাসভাজন : রাসূলে করীম ﷺ-এর মুখে মিরাজের কথা শ্রবণ করে অনেকেই যখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছিল, তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। হাসান (রা) বলেন : 'মিরাজের কথা শ্রবণ করে কিছু সংখ্যক মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে। জনগণ আবু বকরের নিকট গিয়ে বলে : আবু বকর, তোমার বন্ধুকে তুমি কি বিশ্বাস কর? সে বলছে, সে নাকি গতরাতে বাইতুল মাকদাসে অবতরণ করেছে, সেখানে সে সালাত আদায় করেছে, পরিশেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছে।'

আবু বকর বললেন : তোমরা কি তাকে অবিশ্বাস কর? তারা বলল : হ্যাঁ, ঐতো মসজিদে বসে লোকজন এ কথাই বলাবলি করছে। আবু বকর বললেন : মহান আল্লাহর কসম, তিনি যদি এরূপ কথা বলে থাকেন তাহলে সত্যিই বলেছেন।

এতে আশ্চর্যের কি দেখলে? তিনি তো আমাকে বলে থাকেন, তাঁর নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে। তাঁর সে কথাও আমি বিশ্বাস করি।

সিদ্দীক উপাধি লাভ : তোমরা সে ঘটনায় আশ্চর্যবোধ করছ এটা তার চেয়েও বিস্ময়কর। তারপর তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি জনগণকে বলছেন যে, আপনি গতরাতে বাইতুল মাকদাস সফর করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর বললেন : আপনি সত্যই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবু বকর বললেন : আপনি সত্যই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। নবী করীম ﷺ- বললেন : হে আবু বকর! তুমি 'সিদ্দীক'। এভাবে আবু বকর 'সিদ্দীক' উপাধি লাভ করেন।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের সূরা যুমার ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ -

মক্কায় অবস্থান করে নবী করীম ﷺ-এর অভ্যাস ছিল প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আবু বকরের গৃহে গমন করতেন কোন বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন হলে তাঁর সাথে পরামর্শ করার জন্য। রাসূলে করীম ﷺ দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে কোথাও গমন করলে তিনিও সাধারণত সঙ্গী হিসেবে থাকতেন।

হাবশায় হিজরত : মুসলমানদের ওপর মুশরিকদের অত্যাচার যখন চরম আকার ধারণ করল তখন তিনি হাবশায় হিজরত করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু 'ইবনুদ দাগনাহ' নামক এক গোত্রপতি তাঁকে এ সিদ্ধান্ত থেকে নিবৃত রাখে। সে কুরাইশদের হাত থেকে এ শর্তে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয় যে, আবু বকর প্রকাশ্যে সালাত আদায় করবেন না, কিন্তু দীর্ঘদিন এ শর্ত পালন করা তাঁর পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ইবনুল দাগনাহর নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেন এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইদের যে অবস্থা হয় সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

রাসূলের সাহচর্য : রাসূলে করীম ﷺ-এর হিজরতের সে কঠিন মুহূর্তে আবু বকরের কুরবানী, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও বন্ধুত্বের কথা ইতিহাসে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর সাহচর্যের কথা তো কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইবন ইসহাক বলেন "আবু বকর (রা) রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট হিজরতের

অনুমতি চাইলে রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে বলতেন : তুমি অস্থির হয়ো না। আল্লাহ হয়তো তোমাকে একজন সহযাত্রী বানিয়ে দেবেন। আবু বকর একথা শুনে ভাবতেন যে, নবী করীম ﷺ হয়তো নিজের কথাই বলছেন। তাই তিনি তখন থেকেই দুটি উট কিনে অত্যন্ত যত্ন সহকারে লালন-পালন করতে লাগলেন এ আশায় যে, হিজরতের সময় হয়তো কাজে লাগতে পারে।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলে করীম ﷺ দিনে অন্তত: একবার আবু বকরের গৃহে গমন করতেন। যে দিন হিজরতের নির্দেশ এলো সেদিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে আসলেন, পূবে এমন সময় কখনো তিনি আসেননি। তাঁকে দেখা মাত্র আবু বকর বলে উঠলেন, নিশ্চয় কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে। তা না হলে এমন সময় রাসূলে করীম ﷺ আসতেন না। তিনি বাড়িতে প্রবেশ করলে আবু বকর তাঁর খাটের একধারে সরে বসলেন। আবু বকরের গৃহে তখন আমি আর আমার বোন আসমা ছাড়া আর কেউ ছিল না। রাসূলে করীম ﷺ বললেন : তোমার এখানে অন্য যারা আছে তাদেরকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও।

আবু বকর বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুই কন্যা ব্যতীত আর কেউ নেই। আপনার কি হয়েছে? রাসূলে করীম ﷺ বললেন : আল্লাহ্ আমাকে হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, আমিও কি সাথে যেতে পারব? নবী করীম ﷺ বললেন : হ্যাঁ অবশ্যই যেতে পারবে। আয়েশা (রা) বলেন : সে দিনের আগে আমি জানতাম না যে, মানুষ আনন্দের আতিশয্যেও এত কাঁদতে পারে। আমি আবু বকর (রা)-কে সেদিন কাঁদতে দেখেছি। অতঃপর আবু বকর (রা) বললেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! দেখুন, আমি এ উট দু'টি এ কাজের জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছি।'

তাঁরা আবদুল্লাহ্ ইবন উরায়কাতকে পথ দেখিয়ে নেয়ার জন্য ভাড়া করে সাথে নিলেন। সে ছিল মুশরিক, তবে বিশ্বাসভাজন। রাতের অন্ধকারে তাঁরা আবু বকরের ঘরের পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং মক্কার নিম্নভূমিতে 'সাওর' পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। হাসান বসরী (রা) থেকে ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন : তাঁরা রাতে সাওর পর্বতের গুহায় পৌঁছেন। রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রবেশের পূর্বে আবু বকর (রা) গুহায় প্রবেশ করলেন। সেখানে কোন হিংস্র প্রাণী বা সাপ-বিচ্ছু আছে কিনা তা নিশ্চিত করে নিলেন। নবী করীম

ﷺ-এর বিপদমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

মক্কায় উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার মৃত্যুর পর রাসূলﷺ-কে যখন আবু বকর (রা) বিষণ্ন দেখলেন, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আদব সহকারে নিজের অল্পবয়স্কা কন্যা আয়েশাকে (রা) রাসূলে করীমﷺ-এর সাথে বিবাহ দেন। আয়েশা (রা) ও রাসূলﷺ-এর বিয়ের মোহরের অর্থও আবু বকর (রা) পরিশোধ করেন।

হিজরতের পর সকল অভিযানেই তিনি রাসূলে করীমﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। কোন একটি অভিযানেও অংশগ্রহণ থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করেননি। তাবুক অভিযানে তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী। এ অভিযানের সময় রাসূলে করীমﷺ-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে ঘরে যা কিছু অর্থ-সম্পদ ছিল সবই তিনি নবী করীমﷺ-এর হাতে তুলে দেন। আল্লাহর নবী ﷺ জিজ্ঞেস করেন, 'ছেলে-মেয়েদের জন্য গৃহে কিছু রেখেছ কি?' জবাব দিলেন, 'তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই যথেষ্ট।'

হজ্জের আমির নিযুক্ত : মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে প্রথম ইসলামী হজ্জ উপলক্ষে নবী করীমﷺ-এর আবু বকর (রা)-কে 'আমীরুল হজ্জ' হিসেবে নিয়োগ দান করেন। নবী করীমﷺ-এর ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্তে রোগ শয্যায় তাঁরই নির্দেশে মসজিদে নববীর সালাতের ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। মূলকথা, রাসূলে করীমﷺ-এর জীবদ্দশায় আবু বকর (রা) তাঁর উযীর ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ : রাসূলে করীমﷺ-এর ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। 'খলিফাতু রাসূলিল্লাহ'– এ উপাধিটি অধিকার লাভ করেন। পরবর্তী খলিফাদের 'আমীরুল মু'মিনীন' উপাধি দেয়া হয়েছে।

তাঁর পেশা ছিল ব্যবসায়। তিনি ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরাইশদের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরেও জীবিকার অন্বেষণে এ পেশা চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে খলিফা হওয়ার পর খিলাফতের গুরু দায়িত্ব অর্পণ হওয়ায় তিনি ব্যবসায় গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন। 'ওমর ও আবু উবাইদার পীড়াপীড়িতে মজলিশে শূরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজন অনুপাতে 'বাইতুল মাল' থেকে নূন্যতম ভাতা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। যার পরিমাণ ছিল বছরে আড়াই হাজার দিরহাম। তবে ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বিক্রি করে

'বাইতুল মাল' থেকে সংগ্রহীত সমস্ত অর্থ ফেরত দানের নির্দেশ প্রদান করে যান।

রাসূলে করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের সংবাদে সাহাবাগণ যখন সম্পূর্ণ হতভম্ব, তাঁদের যখন চিন্তাই আসেনি, রাসূলের ﷺ ইন্তিকাল হতে পারে, এমনকি 'ওমর (রা) কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ঘোষণা করে বসেন– 'যে বলবে রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়েছে তাঁকে হত্যা করব।' এমনই এক ভাব–বিহ্বল পরিবেশেও আবু বকর (রা) ছিলেন অতীব দৃঢ় ও অবিচল চিত্তের অধিকারী। উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি ঘোষণা দেন : 'যারা মুহাম্মদের ইবাদাত করবে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মদ ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত কর তারা জেনে রাখ আল্লাহ্ চিরঞ্জীব– তাঁর কোন মৃত্যু নেই।' তারপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন–

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ـ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল ব্যতীত আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি পেছনে প্রত্যাবর্তন করবে? যারা পশ্চাতে ফিরে যাবে তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। যারা কৃতজ্ঞতা শুনেছে অচিরেই আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান দান করেন। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৪৪)

আবু বকরের মুখে এ আয়াত শুনে সাথে সাথে জনগণ যেন চেতনা ফিরে পেল। তাদের কাছে মনে হল আলোচ্য আয়াত যেন তারা এ প্রথম শুনেছে। এভাবে রাসূলে করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের সাথে সাথে প্রথম যে প্রকট সমস্যাটি দেখা দেয়, আবু বকর (রা)-এর দৃঢ় হস্তক্ষেপে তার সমাপ্তি ঘটে।

রাসূলে করীম ﷺ-এর কাফন-দাফন তখনো সুসম্পন্ন হয়নি। এরই মধ্যে তাঁর স্থলাভিষক্তির বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করল। মদীনার জনগণ, বিশেষত আনসাররা 'সাকীফা বনী সায়েদা' নামক স্থানে মিলিত হলো। আনসারগণ দাবি করল, যেহেতু আমরা রাসূলে করীম ﷺ-কে আশ্রয় দিয়েছি, নিজেদের জান-মালের বিনিময়ে দুর্বল ইসলামকে সবল ও শক্তিশালী করেছি, আমাদের

মধ্যে থেকে কাউকে রাসূলে করীম ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। মুহাজিরদের কাছে এ দাবি গ্রহণযোগ্য হয়নি। তারা বলল : ইসলামের বীজ আমরা রোপন করেছি এবং আমরাই তাতে পানি সঞ্চালন করেছি। কাজেই আমরাই খিলাফতের সর্বাধিক হকদার। পরিস্থিতি ভিন্নখাতে মোড় নিল। আবু বকর (রা)-কে আহ্বান করা হল। তিনি তখন রাসূলে করীম ﷺ-এর পবিত্র লাশের কাছে। তিনি উপস্থিত হয়ে ধীর-স্থিরভাবে কথা বললেন। তাঁর যুক্তি ও প্রমাণের কাছে আনসাররা নতি স্বীকার করল। এভাবে রাসূলে করীম ﷺ-এর ইনতিকালের পর দ্বিতীয় যে সমস্যাটি দেখা দেয়, আবু বকরের (রা) বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় এর সুন্দর সমাধান হয়।

আবু বকর খলিফা নির্বাচিত হলেন। খলীফা হওয়ার পর উপস্থিত মুহাজির ও আনসারদের উদ্দেশ্যে এক প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে উল্লেখ করেন : 'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে খলীফা নির্বাচন করা হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি আশা করেছিলাম, আপনাদের মধ্য থেকে অন্য কেউ এ গুরু দায়িত্ব বহন করুক। আমি স্মরণ করে দিতে চাই, আপনারা যদি প্রত্যাশা করেন আমার আচরণ নবী করীম ﷺ-এর আচরণের মত হোক, তাহলে আমাকে সেই পর্যায়ে পৌঁছার বিষয়ে অক্ষম মনে করবেন।

তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত নবী। ভুলত্রুটি থেকে ছিলেন অতি পবিত্র। তাঁর মতো আমার কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ। আপনাদের কোন একজন সাধারণ ব্যক্তি থেকেও উত্তম হওয়ার দাবি আমি করতে পারিনা। ..... আপনারা যদি দেখেন আমি যথার্থ কাজ করছি, আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন। নীতিনির্ধারণী সংক্ষিপ্ত প্রথম ভাষণটি চিরকাল বিশেষ সফল রাষ্ট্রনায়কদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

গুণাবলী : তাঁর চরিত্রের সীমাহীন দৃঢ়তার আর এক বহি:প্রকাশ ঘটে রাসূলে করীম ﷺ-এর ইনতিকালের পরে উসামা ইবন যায়িদের বাহিনীকে প্রেরণের মাধ্যমে। নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের অল্পকিছু দিন পূর্বে মূতা অভিযানে যায়িদ ইবন হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। এ বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করেন নওজোয়ান উসামা ইবনে যায়েদকে। রাসূলে করীম ﷺ-এর নির্দেশে উসামা তাঁর বাহিনীসহ সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁরা

মদীনা থেকে বের হতেই নবী করীম ﷺ-ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁরা মদীনার উপকণ্ঠে একটি শিবির স্থাপন করে নবী করীম ﷺ-এর রোগমুক্তির প্রতীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু এ রোগেই নবী করীম ﷺ ইনতিকাল করেন।

আবু বকর (রা) খলীফা হলেন। এদিকে রাসূলে করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের সংবাদে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন দিকে নানা অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কেউ বা ইসলাম ত্যাগ করতে, কেউ বা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, আবার কেউবা নবুওয়াত দাবি করে বসে। এমনি এক চরম হতাশাজনক অবস্থায় অনেকে পরামর্শ দিলেন উসামার বাহিনী প্রেরণের বিষয়টি স্থগিত রাখতে।

কিন্তু আবু বকর (রা) অত্যন্ত কঠিন ও কঠোরভাবে এ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি যদি এ বাহিনী প্রেরণ করতে দ্বিধা প্রকাশ করতেন বা বিলম্ব করতেন তাহলে খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর এটা হতো নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশের প্রথম বিরুদ্ধাচরণ ও অবমাননা। কারণ, নবী করীম (স) রোগশয্যায় উসামার বাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবু বকর (রা) উসামার বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্তে দৃঢ় ছিলেন। তখন আনসারদের একটি দল দাবি করলেন, তাহলে অন্তত উসামাকে নের্তৃত্বের পদ থেকে অপসারণ করে অন্য কোনো বয়স্ক সাহাবীকে তাঁর স্থলে নিয়োগ দেয়া হোক। উল্লেখ্য যে, তখন উসামার বয়স মাত্র বিশ বছর। সকলের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি ওমর তুলে ধরলেন। প্রস্তাব শুনে আবু বকর (রা) রাগান্বিত হলেন। তিনি ওমরের (রা) দাড়ি ধরে বললেন : 'নবী করীম ﷺ যাকে নিয়োগ দান করেছেন আবু বকর তাকে অপসারণ করবে?' এভাবে এ প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

ওমরও ছিলেন উসামার এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একজন সৈনিক। অথচ সদ্য নির্বাচিত খলিফার জন্য তখন তাঁর মদীনায় থাকা অপরিহার্য। খলিফা ইচ্ছা করলে তাঁকে নিজেই মদীনায় অবস্থান করতে বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি উসামার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করে তাঁর কাছে আবেদন জানালেন, ওমরকে মদীনায় অবস্থান করার জন্য। উসামা খলিফার আবেদন মঞ্জুর করলেন। কারণ, আবু বকর অনুভব করেছিলেন উসামার নিয়োগকর্তা স্বয়ং রাসূলে করীম ﷺ-এর। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উসামার ক্ষমতা তাঁর ক্ষমতার উর্ধ্বে। এভাবে আবু বকর (রা) নবী করীম ﷺ-এর আদেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেন এবং তাঁর সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ থেকেও বিরত থাকেন।

যাকাত আদায়ে কঠোরতা : নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আব্বাস ও জুবইয়ান গোত্রদ্বয় যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। বিষয়টি নিয়ে খলিফার দরবারে আলোচনা হয়। সাহাবীদের অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান না চালানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু আবু বকর (রা) ছিলেন সিদ্ধান্তে অটল। তিনি বললেন : 'আল্লাহর কসম, রাসূলে করীম ﷺ-এর যুগে উটের যে বাচ্চাটির যাকাত প্রেরণ করা হতো এখন যদি কেউ তা দিতে অস্বীকার জ্ঞাপন করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।'

ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে অভিযান : কতিপয় লোক নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার ছিল। আবু বকর (রা) অসীম সাহস ও অতীব দৃঢ়তা সহকারে এসব ভণ্ডনবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ইসলামের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন। তাই ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেছেন : আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহের পর যদি আবু বকরের এ দৃঢ়তা না হতো, মুসলিম জাতির ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিপিবদ্ধ হতো।

এমনকি সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, আবু বকর (রা)-এর স্বভাবে দুটি পরস্পরবিরোধী গুণের সমন্বয় ঘটেছিল, সীমাহীন দৃঢ়তা ও অতীব কোমলতা। এ কারণে তাঁর চরিত্রে সর্বদা একটা ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজ ছিল। যদি কোন ব্যক্তির স্বভাবের এ দু'টি গুণের একটি বিদ্যমান থাকে এবং অন্যটি থাকে বিলুপ্ত, তখন তার চরিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সমূহসম্ভাবনা প্রখর হয়ে উঠবে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে এ দুটি গুণ তাঁর চরিত্রে সমানভাবে সন্নিবেশিত ছিল।

অনাড়ম্বর জীবন-যাপন : আবু বকর (রা) যদিও মুসলমানদের নেতা ও খলিফা ছিলেন, তবুও তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত অনাড়ম্বর। খলিফা হওয়া সত্ত্বেও মদীনার অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে জনগণের অবস্থা অনুভব করতেন এবং তাদের ব্যক্তিগত কাজও সময় সময় নিজ হাতে সমাধান করতেন। ওমর (রা) বলেন : 'আমি প্রতিদিন সকালে এক বৃদ্ধার ঘরে তার ঘরের কাজ করে দিতাম। প্রতিদিনের মতো একদিন তার ঘরে উপস্থিত হলে বৃদ্ধা বললেন : আজ কোন কাজ নেই। এক নেককার ব্যক্তি তোমার পূর্বেই কাজগুলো শেষ করে গেছে।

ওমর পরে জানতে পারেন, সে নেককার লোকটি আবু বকর (রা)। খলিফা হওয়া সত্ত্বেও এভাবে এক অনাথ বৃদ্ধার ঘরের কাজ করে দিয়ে যেতেন। আবু বকর (রা) মাত্র আড়াই বছরের মতো খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে তাঁর এ

সময়টুকু ইসলামের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। নবী করীম ﷺ-এর ইনতিকালের পর তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা ও আরবের বিদ্রোহগুলো দমন করা। রাষ্ট্র ও সরকারকে তিনি এত শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন যে, ইরান ও রোমের মতো দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে মুসলমানদের অধিক সাহসী মনোবল তৈরি হয় এবং কম সময়ের মধ্যে তাদের বহু অঞ্চল অধিকার করে নেয়।

কুরআন সংকলক ও সংরক্ষক : আবু বকর (রা)-এর আরেকটি অবদান পবিত্র কুরআন কারীমের সংকলন ও সংরক্ষণ। তাঁর খিলাফতকালের প্রথম অধ্যায়ে আরবের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেসব বিদ্রোহ নির্মূল করতে গিয়ে বেশ কিছু হাফেজে কুরআন শহীদ হন। কেবলমাত্র মুসায়লামা কাজ্জাবের সাথে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতেই সাতশ' হাফেজ শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর ওমরের পরামর্শে আবু বকর (রা) সম্পূর্ণ কুরআন একত্র করে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন এবং কপিটি নিজের কাছে হেফাযত করেন। ইতিহাসে কুরআনের এ পুরানো কপিটি 'মাসহাফে সিদ্দীকী' নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে 'উসমান (রা)-এর যুগে কুরআনের যে কপিগুলো করা হয় তা মূলত : 'মাসহাফে সিদ্দীকীর' অনুলিপি মাত্র।

কুরআনে কারীম ও রাসূলের বাণীতে আবু বকরের সীমাহীন মর্যাদা ও সম্মানের কথা বহুবার বহু স্থানে ঘোষিত হয়েছে।

তাঁর গুণাবলীসমূহ

উমার (রা)-এর বাণী : উমার (রা) বলেন, হে রাসূলের প্রতিনিধি! আপনি আপনার পরবর্তীদের কঠিন পরীক্ষায় নিমজ্জিত করে গেলেন। আপনার পথের ওপর দিয়ে চলাতো দূরের কথা, পদানুসরণ করাও কঠিন ব্যাপার। আমি আপনার সাথে কেমনে বৈঠকে মিলিত হবো।

আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সাথে প্রেম : আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি তাঁর প্রেমের নমুনা তাঁরই মুখ নিঃসৃত বাণী হতে শুনা যাক। তিনি বলেন, আমার নিকট দুনিয়ার তিনটি বস্তু অতি প্রিয়।

১. রাসূল ﷺ-এর পবিত্র মুখের পানে তাকিয়ে থাকা,

২. রাসূল ﷺ-এর প্রতি স্বীয় মাল ব্যয় করা,

৩. আমার কন্যা আয়েশা রাসূলের গৃহিণী।

স্বয়ং বিশ্ব রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ্ আবূ বকরের প্রতি রহম করুন, তিনি তার বিদূষী কন্যা আয়েশাকে আমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেছেন এবং হিজরতকালে আমাকে মাদীনা পর্যন্ত পৌছিয়েও দিয়েছেন। আবূ বকর (রা) ক্রীতদাস বিলালকে মুক্তিদান করেন।

সালাত : তিনি যখন রুকুতে যেতেন তখন কোমরকে পুরোপুরি বাঁকা করতে পারতেন না। সালিম ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্ণিত আছে, আবূ বকর (রা) বলেন, এসো, আমরা ফজর পর্যন্ত এভাবেই সালাত পড়ি তাহলেই কোমর বাঁকা করা সম্ভব হয়ে যাবে। বলে তিনি পূর্ণ রজনী সালাত পড়লেন এবং তার পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, ফজরের পূর্ব পর্যন্ত গৃহের দরজা বন্ধ রাখবে।

সিয়াম : গ্রীষ্মকালে তিনি সর্বদা নফল সিয়াম বা রোজা পালন করতেন।

বাহাদুরী : একবার আলী (রা) জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের নিকট সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি কে? সবাই বললেন, আপনি। তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করি এটা কোন বীরত্ব নয়, বরং আসল বীর ও শক্তিশালী কে তাই বলো? সবাই বলেন, এটা আমাদের অজানা। তিনি বললেন, আমাদের মাঝে সবচেয়ে বাহাদুর হলেন আবূ বকর (রা)। বদর প্রান্তরে রাসূল ﷺ-এর জন্য পাশেই তাঁবু খাটানো হয়। প্রশ্ন হলো, কাফিরদের বাধাদানের জন্য রাসূলের দেহরক্ষী হয়ে কে থাকবে? কেউই এ দায়িত্ব গ্রহণের দুঃসাহস দেখাল না। আবূ বকর (রা) শক্ত হাতে তরবারি ধারণ করে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং প্রতিটি আঘাতের দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব দিলেন। একবার মক্কার পৌত্তলিকরা রাসূল ﷺ-এর প্রতি সীমাহীন নির্যাতন নিস্পেষণ চালায় এবং বলে, তুমিই এক প্রভুর আহ্বান জানাচ্ছ। সেদিন মুশরিকদের বিরোধিতা করার একমাত্র আবূ বকর ছাড়া দ্বিতীয় কেউই সাহস করেননি। তিনি ধাক্কা দিয়ে মুশরিকদেরকে বিতাড়িত করলেন এবং বললেন আফসোস! তোমরা এমন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি বলেন, আমার প্রভু এক ও অদ্বিতীয়। এই বলে তিনি কেঁদে ফেলেন।

ঈমান : আলী (রা) আরও প্রশ্ন করেন, ফিরাউনের বংশধরের মু'মিন ভালো, না আবূ বকর? সবাই নিশ্চুপ। তিনি বললেন, কেন নীরব, আবূ বকরের এক ঘণ্টা তাদের হাজার ঘণ্টা অপেক্ষাও উত্তম। কেননা তারা তাদের ঈমান গোপন রাখতো। অপরদিকে আবূ বকর তার ঈমান প্রকাশ করে দেন।

আল্লাহ ভীরুতা : ইমাম হাসান হতে বর্ণিত আছে, আবূ বকর (রা) তার ইন্তিকালের পূর্বে বলেন– এ উষ্ট্রি যার আমরা দুধ পান করতাম এবং এ পেয়ালা যাতে আমরা খাবার খেতাম, আর এ চাদর উমর (রা)-এর নিকট পৌছিয়ে দিবে যেহেতু এগুলো আমি বাইতুল মাল হতে নিয়েছিলাম। যখন এগুলো ওমর (রা)-এর নিকট পৌছানো হলো, তিনি বললেন, আল্লাহ আবূ বকরের প্রতি রহম করুন, তিনি খিলাফতের দায়িত্ব কত কঠিন করে গেছেন।

কুরআনী জ্ঞান : ইমাম আশ'আরী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সালাতে ইমামতি সেই ব্যক্তি করবে যে সর্বাধিক কুরআন বিষয়ে জ্ঞান রাখবে। এ বর্ণনার পর আমরা যখন দেখলাম আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্যে রাসূল ﷺ আবূ বকর (রা)-কে ইমামতি করার হুকুম দিলেন তখন স্পষ্টভাবে বুঝা গেল, সমস্ত সাহাবাকেরামের মধ্যে আবূ বকর (রা) কুরআন বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।

ইলমে হাদীস : আবূ বকর (রা), উমার (রা), উসমান (রা), আলী (রা), আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে উমাইর, হুজাইফাহ ইবনে ইয়ামান, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালিক, যায়দ ইবনে সাবিত, বারা ইবনে আযিব, আবূ হুরাইরা, উকবা ইবনে হারিস, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল, আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর, যায়দ ইবনে আকরাম, উকবা ইবনে আমির জুহানী, ইমরান ইবনে হুসাইন, আবূ বারযা আসলামী, আবূ সাঈদ খুদরী, আবূ মূসা আশ'আরী, আবূ তুফাইল লাইসী, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আয়েশা সিদ্দীকা, আসমা, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস, জানাবাহি, মুররাহ, কায়েস ইবনে আবূ হাযিম, সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ প্রমুখ বহু তাবিয়ী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইলমে তা'বীর : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন যিনি ইলমে তাবীরে সর্বাধিক অভিজ্ঞ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন আবূ বকর (রা)-এর নিকট স্বপ্ন ব্যাখ্যা করি।

পিতা-মাতার অধিকার এবং আদব : এক ব্যক্তি তার পিতা সম্পর্কে অরুচিপূর্ণ কথা বলেছিল, এ বেয়াদবীর কারণে আবূ বকর (রা) বলেন, তার গর্দান উড়িয়ে দাও। তার মাথায় শয়তান বাসা বেঁধেছে। একদা আসিম ইবনে ফারুক তার মায়ের সাথে ঝগড়া করছিল, তখন তিনি বললেন, হে আসিম! তুমি স্মরণ রাখ তোমার মায়ের প্রতিটি শব্দ তোমার চেয়ে উত্তম।

প্রতিবেশীর অধিকার : একদিন আবদুর রহমান ইবনে আওফকে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখে বলেন, প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করো না। কারণ প্রতিবেশীর সঙ্গে পুনরায় তোমার সম্পর্ক গড়ে উঠবে, কিন্তু যারা তোমাদের ঝগড়া দেখল তারা বিভিন্ন জায়গায় চলে যাবে এবং তোমাদের ঝগড়ার কথা স্মরণ করবে।

প্রজা রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্মচারীদের প্রতি হুঁশিয়ারী : একজন মুহাজির ইয়ামামায় কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় একজন মুসলিম মহিলা নবী ﷺ-এর সম্পর্কে খারাপ উক্তি করে। সেখানকার নেতৃবৃন্দ মহিলাটির হাত কেটে দেয় এবং দাঁত ভেঙ্গে দেয়। অনুরূপ আরও একটি মহিলা মুসলমানদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে। তাকেও এ শাস্তি দেয়া হয়। আবূ বকর (রা) তাদের এ মীমাংসা জানতে পেরে তাদের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন– তোমরা যদি শাস্তি না দিয়ে ফেলতে তাহলে আমি তাকে হত্যার নির্দেশ দিতাম। কেননা কোন মুসলিমের নাবীগণকে গালি দেয়ার অর্থ হলো সে ইসলাম চ্যুত হয়ে গেছে এবং তাকে স্বধর্মত্যাগী বলা হয়। যদি কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত অমুসলিম এ অপরাধে দণ্ডিত হয় তাহলে তাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে জঙ্গী হিসেবে গণ্য করা হবে। যদি কোন জিম্মী মহিলা মুসলমান সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে তাহলে তোমরা যে শাস্তি দিয়েছ তা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। কারণ সে তো শির্কে লিপ্ত। তার সাথে চুক্তি সম্পাদিত আছে। তার জান-মালের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। শুধু মুসলমানকে গালি দিলেই তাকে ঐ শাস্তি কেমন করে দেয়া যাবে? ভবিষ্যতে এরূপ আচরণ হতে বিরত থাকবে।

সেনাপতির প্রতি ফরমান : ইয়াযীদ আল খায়েরকে যখন সিরিয়ায় সৈন্যদের সেনাপতি করে প্রেরণ করা হয়, তখন তিনি কতকগুলো সৎ উপদেশ দেন, তন্মধ্যে একটি হলো- কোন নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করবে না। ফলের বৃক্ষ কাটবে না, শস্য ক্ষেত নষ্ট করবে না, খেজুর গাছ কাটবে না, পুড়িয়েও দেবে না এবং মাত্রাতিরিক্ত খরচও করবে না। উটের পা কাটবে না, তবে খাওয়া এবং ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করতে পার।

আবূ বকর (রা) সম্পর্কে হাদীসসমূহ : আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করবে তাঁকে জান্নাতের দারোয়ান প্রতিটি দরজা দিয়ে ডাক দিবে, এদিকে আসুন। এ কথা শুনে আবূ বকর (রা)

বললেন, সেই ব্যক্তির জন্য কোন চিন্তা নেই। রাসূল ﷺ বললেন, আমি আশা করি তুমি হবে তাদের একজন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে হতে কে সিয়াম পালন করেছ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। ইবনেরায় জিজ্ঞেস করলেন, আজকে জানাযার সঙ্গে কে গিয়েছিলে? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। পুনরায় রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন,.ভিক্ষুককে আজ কে খেতে দিয়েছ? আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, রোগীর শয্যা পাশে কে গিয়েছিলে? এবারও আবূ বকর (রা) বললেন, আমি। রাসূল ﷺ আবূ বকর (রা)-এর প্রতিটি গুণের সমাবেশ শুনে বললেন, যার মধ্যে উপরিউক্ত চারটি গুণ বিদ্যমান সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে।

আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ فِىْ مَحَبَّتِهِ وَمَالِهِ أَبُوْ بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ لاَ تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً۔

আমাকে মাল দিয়ে, জান দিয়ে সব চেয়ে বেশি উপকৃত করেছে আবূ বকর (রা)। তিনি আরও বলেন, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবূ বকরকেই করতাম।

যুবাইর ইবনে মুতয়িম হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (রা)-এর নিকট এক মহিলা এসে কথোপকথন করে চলে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি ইন্তেকাল করলে কার নিকট যাব? রাসূল ﷺ বললেন–

فَاِنْ لَمْ تَجِدِيْنِىْ فَأْتِىْ اَبَا بَكْرٍ، اَنْتَ صَاحِبِىْ فِى الْغَارِ وَصَاحِبِىْ عَلَى الْحَوْضِ۔

আমাকে না পেলে আবূ বকরের নিকট আসবে। রাসূল ﷺ আবূ বকরকে বলেন, তুমি সওর নামক গুহাতে আমার বন্ধু ছিলে, হাউজে কাওসারেও তুমি আমার বন্ধু থাকবে।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত আছে, আমার আব্বা আবূ বকর রাসূলের দরবারে তাশরীফ আনেন। তখন রাসূল ﷺ বলেন–

اَنْتَ عَتِيْقٌ مِنَ النَّارِ۔

তুমি জাহান্নাম হতে মুক্তি প্রাপ্ত। সেদিন হতে তাঁর নাম হয়ে যায় আতীক।

রাসূল ﷺ আরও বলেন–

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِيْ ۔

হে আবূ বকর! আমার উম্মাতের মধ্য হতে তুমি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

সাহাবায়ে কিরাম এবং ইমামগণের উক্তি

উমার (রা) বলেন–

أَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

আবূ বকর (রা) ছিলেন আমাদের নেতা এবং আমাদের মধ্য হতে সবচেয়ে সেরা মানব। আবূ বকর (রা) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর অতি প্রিয় মানুষ।

আলী (রা) বলেন, আমরা কেউই আবূ বকরের সমান নেকী অর্জন করা তো দূরের কথা তাঁর নিকটবর্তীও হতে পারিনি।

বর্ণনাকারী ইবনে ইউনুস বলেন, পূর্ববর্তী কিতাবে আবূ বকরের উদাহরণ দেয়া হয়েছে বৃষ্টির সঙ্গে। যেখানেই বৃষ্টির কণা পড়ে সেখানেই উপকার হয়। আবূ বকর (রা)-এর মতো পূর্ববর্তী কোন নবীর সহচর ছিল না।

ইসলামী জাহানের দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা) বলেন, সারা বিশ্বের মানুষের ঈমান যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর অপর পাল্লায় রাখা হয় আবূ বকর (রা)-এর ঈমান, তাহলে আবূ বকর (রা)-এর ঈমানী পাল্লাই ঝুলে যাবে। তিনি আরও বলেন, আবূ বকর (রা) সর্বদিক দিয়ে আমাদের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তিনি আরও বলেন, আমি যদি আবূ বকরের বক্ষের পশমও হতাম তাহলেই আমার জীবন ধন্য হতো।

ওমর (রা) বলেন, আবূ বকর (রা)-কে যে অবস্থায় জান্নাতে দেখেছি আমারও এরূপ আকাঙ্ক্ষা হয়। আবু বকরের শরীরের দুর্গন্ধ মিশকে আম্বরের চেয়ে অধিক সুগন্ধযুক্ত। আবূ হুসাইন বলেন, আদম সন্তানের মধ্যে নবীদের পরেই আবূ বকরের স্থান। তিনি স্ব-ধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে একজন নবীর মতো কঠোরতা করেছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে যুবাইর বর্ণনা করেন, আমি হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কিছু সংখ্যক লোকের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। আপনি সঠিক

তথ্য পরিবেশন করে সন্দেহমুক্ত করুন। আচ্ছা আবূ বকরকে খলিফা নির্বাচন কি রাসূল ﷺ করেছিলেন? তিনি এ কথায় গর্জে উঠে বলেন, তোমার কি তাতে সন্দেহ আছে; আল্লাহর শপথ, আল্লাহই তাঁকে খলিফা নির্বাচন করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে করবেন না কেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিজ্ঞ, স্বচ্ছ জ্ঞানের অধিকারী এবং আল্লাহভীরু। তাঁকে খলিফা নির্বাচন করাতো যথার্থই হয়েছে। তিনি যদি ইসলাম জাহানের খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ না করতেন তাহলে শিশুকালেই ইসলাম বিদায় হয়ে যেত। তিনি তো খলিফা হওয়ার অভিলাষী ছিলেন না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, যদি চিন্তার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যাবে তিন জন লোক জ্ঞানে গুণে এবং দূরদর্শিতায় সর্বাগ্রে, তন্মধ্যে একজন আবূ বকর (রা)। বিশিষ্ট সাহাবী আবূ হুরায়রাহ (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) যদি প্রথম খলিফা না হতেন তাহলে এক প্রভুর উপাসক একজনও থাকত না।

ইমাম শাবী বলেন, আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে এমন চারটি গুণের সমাবেশ আছে যা অন্য কারও মধ্যে পাওয়া যায় না।

১. একমাত্র তাঁরই নাম সিদ্দীক,

২. সওর নামক গুহায় রাসূলের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য তাঁরই জুটেছিল,

৩. নবী ﷺ তাঁকে ইমাম করেছিলেন,

৪. রাসূলের সঙ্গে তিনি মাদীনায় হিজরত করেছিলেন।

রাকিম আবূ বকরের আরও গুণ বাড়িয়ে দেন সেটা হলো রাসূল ﷺ তার জীবনের শেষ সালাত আবূ বকরের মুক্তাদী হয়ে পড়েন। ইমাম আবূ জাফর বলেন, আবূ বকর (রা), রাসূল ﷺ এবং জিবরাঈল আমীনের মধ্যেকার আলাপ-আলোচনা শুনতে পেতেন, কিন্তু তা দেখতে পেতেন না।

হাদীস বর্ণনা : আবু বকর (রা) রাসূলে করীম ﷺ-এর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা জাহাবী 'তাজকিরাতুল হুফফাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন খুব সতর্ক। অত্যধিক সতর্কতার কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় নিতান্তই কম। ওমর, উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, ইবনে মাসউদ, ইবনে ওমর, ইবনে আমর, ইবনে আব্বাস, হুজাইফা, যায়েদ ইবনে সাবিত, উকবা, মা'কাল, আনাস, আবু হুরায়রা, আবু

উমামা, আবু বারাযা, আবু মূসা, তাঁর দু'কন্যা আয়েশা ও আসমা প্রমুখ সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। বিশিষ্ট তাবেয়ীরাও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু : ১৩ হিজরীর ৭ জমাদিউল উখরা আবু বকর (রা) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ১৫ দিন রোগাক্রান্ত থাকার পর হিজরী ১৩ সনের ২১ জামাদিউল উখরা মোতাবিক ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

সমাধি : আয়েশা (রা)-এর হুজরায় নবী করীম ﷺ-এর রওজার একটু পূর্ব পাশ্বে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি দু'বছর তিন মাস দশ দিন খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর অসিয়ত : আবূ বকর (রা) তাঁর মালের এক-পঞ্চমাংশ অভাবীদের মাঝে বিতরণের অসীয়ত করে।
অতঃপর তিনি বলেন–

أَخَذْتُ مِنْ مَالِىْ مَا أَخَذَ اللّٰهُ مِنْ فَئِى الْمُسْلِمِيْنَ ـ

আল্লাহ্ 'ফায়ের' মাল যতটা গ্রহণ করেন আমি সেই পরিমাণ মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করলাম। তিনি বললেন, আমি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণের পর যে পরিমাণ মাল গ্রহণ করেছি তোমরা তা পরিশোধ করে দিও। তিনি ইন্তেকালের ক্ষণকাল পূর্বে বলেন, আজ কি বার? উত্তর এল সোমবার। যদি আজ রাতে ইন্তেকাল করি, তাহলে আমার দাফনের জন্য পরবর্তী দিনের অপেক্ষা করবে না। আমার নিকট মৃত্যুই শ্রেয়। কারণ এরপরই আমি নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভ করব।

আবু বকর (রা) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ–

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ

اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَ اَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ

كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ط وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ

যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'বিষণ্ন হও না, আল্লাহ্ তো আমাদের সঙ্গে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আল্লাহ্র কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ : আয়াত-৪০)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَاتَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ـ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হও না এবং আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু কর না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না; কারণ তাতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।

(সূরা হুজুরাত : আয়াত-২-৩)

وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْۤا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ص وَلْيَعْفُوْا

وَلْيَصْفَحُوْا ط اَلَاتُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না; তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নূর : আয়াত-২২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

হে মু'মিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের ওপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন। (সূরা মায়িদা : আয়াত-১০৫)

২. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)

তোমরা আমাকে মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে চল। 'ওমরের একথা শুনে এতক্ষণে খাব্বাব ঘরের গোপন স্থান থেকে বের হয়ে এলেন। বললেন : 'সুসংবাদ 'উমার! বৃহস্পতিবার রাতে নবী করীম(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার জন্য দোয়া করেছিলেন। আমি আশা করি তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। তিনি বলেছিলেন : হে 'আল্লাহ! 'উমার ইবনুল খাত্তাব অথবা 'আমর ইবন হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর।'

আবু বকর ও উমার (রা) ঐ সমস্ত জান্নাতীদের সরদার হবেন যারা বৃদ্ধ বয়সে ইন্তেকাল করেছেন।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ طَلَعَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَانِ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، يَا عَلِىُّ لاَتُخْبِرْهُمَا ـ

আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি একদা রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ করে আবু বকর ও উমার (রা) চলে আসল, রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তারা উভয়ে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণকারী মুসলমানদের সরদার হবেন, চাই তারা পূর্ববর্তী উম্মতের লোক হোক আর পরবর্তী উম্মতের। তবে নবী রাসূলগণ ব্যতীত। হে আলী তুমি এ সংবাদ তাদেরকে দিও না।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবু বকর সিদ্দীক– ৩/২৮৯৭)

রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দশজনকে দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে আশারায়ে মুবাশ্‌শারা বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ ـ

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ জান্নাতী।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবদুর রহমান ইবনে আওফ– ৩/২৯৪৬)

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম 'উমার, উপাধি ফারুক এবং কুনিয়াত আবু হাফস। পিতা খাত্তাব ও মাতা হানতামা। কুরাইশ বংশের আ'দী গোত্রের লোক। 'উমারের অষ্টম উর্ধ্ব পুরুষ কা'ব নামক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসূলে করীম ﷺ-এর নসবের সাথে তাঁর নসব এক হয়েছে। পিতা খাত্তাব কুরাইশ বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মাতা 'হানাতামা' কুরাইশ বংশের একজন বিখ্যাত সেনাপতি হিশাম ইবন মুগীরার কন্যা। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এ মুগীরার নাতী। মক্কার 'জাবালে 'আকিব'-এর পাদদেশে ছিল অন্ধকার যুগে বনী 'আ'দী ইবন কাবের বসতি। আর এখানেই ছিল উমারের বাসস্থান। ইসলামী যুগে 'উমারের নামানুসারে পাহাড়টির নাম হল 'জাবালে 'উমার' বা 'উমারের পাহাড়। (তাবাকাতে ইবন সা'দ ৩/৬৬)

জন্ম : রাসূলে করীম ﷺ-এর জন্মের তের বছর পর তাঁর জন্ম। মৃত্যুকালেও তাঁর বয়স হয়েছিল রাসূলে করীম ﷺ-এর বয়সের সমান ৬৩ বছর। তবে তাঁর জন্ম ও ইসলাম গ্রহণের সময়, প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

দৈহিক কাঠামো : উমার ইবনে খাত্তাব (রা)-এর গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। টাকা, মাথা, গণ্ডদেশ মাংসহীন, ঘন দাড়ি, মোঁচের দু'পাশে লম্বা ও পুরু এবং দেহ দীর্ঘাকৃতির। হাজার মানুষের মধ্যেও তাঁকেই লম্বা দেখা যেত।

বাল্যকাল : ইতিহাসে তাঁর জন্ম ও বাল্যকাল প্রসঙ্গে তেমন কিছু জানা যায়নি। ইবনে আসাকির তাঁর তারীখে 'আমর ইবন 'আস (রা) থেকে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে জানা যায়, একদিন 'আমর ইবনে আস কিছু সংখ্যক সঙ্গী-সাথী নিয়ে বসে আছেন, এমন সময় হৈ চৈ শুনতে পেলেন। সংবাদ নিয়ে জানতে পেলেন, খাত্তাবের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে। এ খবরের ভিত্তিতে মনে হয়, ওমরের জন্মের সময় বেশ একটা আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

যৌবনকাল : তাঁর যৌবনের অবস্থাও প্রায় অনেকটা অজানা। কে জানত যে এ সাধারণ একরোখা ধরনের যুবকটি একদিন 'ফারুকে আযম' হিসেবে হবেন। কৈশোরে 'উমারের পিতা তাঁকে উটের রাখালী কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি মক্কার সন্নিকটে 'দাজনান' নামক স্থানে উট চরাতেন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে একবার এ মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের নিকট বাল্যের স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে : 'এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমী পোশাক পরে এ মাঠে প্রখর রোদে খাত্তাবের উট চরাতাম। খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত কঠিন ও নীরব ব্যক্তি। ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিলে পিতার হাতে নির্মমভাবে আঘাত প্রাপ্ত হতাম। কিন্তু বর্তমানে আমার এমন দিন এসেছে যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আমার ওপর কর্তৃত্ব করার আর কেউ নেই।' (তাবাকাত : ৩/২৬৬-৬৭)

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি তৎকালীন অভিজাত আরবদের অবশ্য-শিক্ষণীয় দিকগুলো যথা : যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ তালিকা প্রভৃতি শিক্ষা অর্জন করেন। বংশ তালিকা বা নসবনামা বিদ্যা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। তাঁর পিতা ও দাদা উভয়ে ছিলেন এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। আরবের 'উকায' মেলায় তিনি কুস্তি লড়তেন। আল্লামা যুবইয়ানী বলেছেন : 'উমার ছিলেন এক বিরাট শক্তিশালী পাহলোয়ান।' তিনি ছিলেন জাহিলী আরবের এক খ্যাতনামা ঘোড় সওয়ার।

প্রতিভা : আল্লামা জাহিয বলেছেন : 'উমার ঘোড়ায় চড়লে মনে হতো, ঘোড়ার চামড়ার সাথে তাঁর দেহ মিশে গেছে।' (আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন) তাঁর মধ্যে

কাব্য প্রতিভাও ছিল। তৎকালীন খ্যাতনামা কবিদের প্রায় সব কবিতাই তাঁর মুখস্থ ছিল। আরবি কাব্য সমালোচনা বিজ্ঞানভিত্তিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা মূলত তিনিই। ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর মতাদর্শন পাঠ করলে এ বিষয়ে তাঁর যে কতখানি অর্জন ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। বাগ্মিতা ছিল তাঁর সহজাত এক অনন্য গুণ। যৌবনে তিনি সামান্য কিছু লেখাপড়া অর্জন করেছিলেন। বালাজুরী বর্ণনা করেছেন : 'রাসূলে করীম ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় সমস্ত কুরাইশ বংশের মাত্র সতের জন লেখা-পড়া জানতেন। তাদের মধ্যে 'উমার ছিলেন অন্যতম।

ব্যবসায়িক জীবন : ব্যবসায় বাণিজ্য ছিল জাহিলী যুগের আরব জাতির সম্মানজনক এক পেশা। 'উমারও ব্যবসা শুরু করেন এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ব্যবসা উপলক্ষে অনেক দূরদেশে গমন এবং বহু জ্ঞানী-গুণী সমাজের সাথে উঠাবসার সুযোগ লাভ করেন। মাসউদী বলেন : 'উমার (রা) ইসলামের প্রাথমিক যুগে সিরিয়া ও ইরাকে ব্যবসা উপলক্ষ্যে সফরে যেতেন। ফলে আরব ও আজমের অনেক রাজা-বাদশার সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন।' শিবলী নুমানী বলেন : 'ইসলামের প্রাথমিক যুগেই 'উমারের সুনাম গোটা আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে কুরাইশরা সর্বদা তাঁকেই দৌত্যগিরিতে নিয়োগ করত। অন্যান্য গোত্রের সাথে কোন বিরোধ হলে তা সমাধানের জন্য তাঁকেই দূত হিসেবে প্রেরণ করা হতো।' (আল-ফারুক পৃষ্ঠা-১৪)

ইসলাম গ্রহণের কাহিনী : 'উমারের ইসলাম গ্রহণ এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা। তাঁর চাচাত ভাই যায়েদের পুত্র সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেন। সাঈদ আবার 'উমারের বোন ফাতিমাকে বিবাহ করেন। স্বামীর সাথে ফাতিমাও ইসলাম কবুল করেন। 'উমারের বংশের আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি নাঈম ইবন আবদুল্লাহও ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত 'উমার ইসলাম প্রসঙ্গে কোন খবরাদী রাখতেন না। সর্বপ্রথম যখন ইসলামের কথা শুনেন, তখন ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন। তাঁর বংশে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তিনি পরম শত্রু হিসেবে দেখতেন। এর মধ্যে জানতে পারলেন, 'লাবীনা' নামে তাঁর এক দাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যাঁদের ওপর তাঁর চলত নির্মম উৎপীড়ন ও অত্যাচার। এক পর্যায়ে তিনি মনস্থির করলেন, ইসলামের মূল প্রচারক মুহাম্মদ ﷺ-কেই জগত থেকে চিরতরে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। যে কথা সেই কাজ।

আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে ওমর পথ চলছেন। পথে বনি যুহরার এক ব্যক্তির (মতান্তরে নাঈম ইবন আবদুল্লাহর) সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : কোথায় যাচ্ছ 'উমার? উমার বললেন : মুহাম্মদের সাথে একটা দফারফা করতে। লোকটি বললেন , মুহাম্মদ ﷺ-এর দফারফা করে বনি হাশিম ও বনি যুহরার হাত থেকে রক্ষা পাবে কিভাবে? একথা শুনে 'উমার বলে উঠলেন : মনে হচ্ছে, তুমিও পৈতৃক ধর্ম পরিহার করে বিধর্মী হয়েছ।

লোকটি বললেন : 'উমার, একটি আশ্চর্য খবর শুন, তোমার বোন ও ভগ্নিপতি ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গেছে। (আসলে লোকটির উদ্দেশ্য ছিল, 'উমারকে তার লক্ষ্য থেকে অন্যত্র ফিরে দেয়া) একথা শুনে 'উমার রাগে ক্রোধান্বিত হয়ে ছুটলেন তাঁর বোন ও ভগ্নপতির বাড়ির দিকে। ঘরের দরজায় উমার (রা)-এর করাঘাত করল। সে মুহূর্তে তাঁরা দু'জনে খাব্বাব ইবনে আল-আরাত এর কাছে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করছিল।

'উমারের আভাস পেয়ে খাব্বাব বাড়ির অন্য একটি ঘরে লুকিয়ে পড়ল। 'ওমর বোন ও ভগ্নিপতিকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের এখানে গুণগুণ কিসের আওয়াজ শুনছিলাম? তাঁরা তখন কুরআনের সূরা ত্বাহা পাঠ করছিলেন। তাঁরা উত্তর দিলেন : আমরা নিজেদের মধ্য কথপোকথন করছিলাম। 'উমার বললেন : সম্ভবত তোমরা দু'জন ধর্মত্যাগী হয়েছ। ভগ্নিপতি বললেন : তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও যদি সত্য দেখতে পাও তুমি কি করবে 'উমার?

'উমার তাঁর ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দুপায়ে ভীষণভাবে তাঁকে প্রহার করতে লাগলেন। বোন তাঁর স্বামীকে রক্ষা করতে এলে 'উমার তাঁকে ধরে এমন চপোটাঘাত করলেন যে, তাঁর চেহারা রক্তাক্ত হয়ে গেল। তার বোন রাগে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন : সত্য যদি তোমার ধর্মের বাইরে অন্য কোথাও থাকে, তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।

এ ঘটনার কিছুদিন পূর্ব থেকে 'উমারের মধ্যে একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। কুরাইশরা মক্কায় মুসলমানদের ওপর নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে একজনকেও প্রথম থেকে ফেরাতে পারেনি। মুসলমানরা চুপিসারে সবকিছু নীরবে

মাথা পেতে নিয়েছে। প্রয়োজনে ঘর-বাড়ি ত্যাগ করেছে তথাপি ইসলাম ত্যাগ করেনি। এতে 'উমারের মনে প্রবল একটা নাড়া লেগেছিল। তিনি একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঘুরপাক খাচ্ছিলেন।

আজ তাঁর প্রিয় সহোদরার চেহারার রক্তাক্ত দৃশ্য, তার সত্যের সাক্ষ্য তাঁকে এমন একটি নাড়া দিল যে, তাঁর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল। মুহূর্তে অন্তর তাঁর সত্যের দিকে ধাবিত হল। তিনি পুত:পবিত্র হয়ে বোনের হাত থেকে সূরা ত্বাহার নিম্নলিখিত অংশটুকু নিয়ে পাঠ করতে শুরু করলেন–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

ভূমণ্ডলে নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। তিনি ক্ষমতাশীল প্রজ্ঞাময়। (সূরা জুমু'আ : আয়াত-১)

যখন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন তখন জ্ঞান শূন্য হয়ে যেতে লাগলেন। তিনি পড়তে পড়তে এ আয়াতের নিকট এসে পৌঁছেন–

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং যা কিছুর মালিক তোমাদেরকে করা হয়েছে সেখান হতে খরচ করো– যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার হও। (সূরা হাদীদ : আয়াত-৭)

পড়া শেষে বললেন : তোমরা আমাকে মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট নিয়ে চল। 'উমারের একথা শুনে এতক্ষণে খাব্বাব ঘরের গোপন স্থান থেকে বের হয়ে এলেন। বললেন : 'সুসংবাদ 'উমার! বৃহস্পতিবার রাতে নবী করীম ﷺ-এর তোমার জন্য দোয়া করেছিলেন। আমি আশা করি তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। তিনি বলেছিলেন : হে 'আল্লাহ! 'উমার ইবনুল খাত্তাব অথবা 'আমর ইবন হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর।' খাব্বাব আরো বললেন : রাসূলে করীম ﷺ এখন সাফার পাদদেশে 'দারুল আরকামে আছেন।'

'উমার চললেন 'রওয়ানা দিল আকরামের' দিকে। হামযা এবং তালহার সাথে আরো কিছু সাহাবী তখন আরকামের ঘরের দরজায় প্রহররত ছিল। 'উমারকে

দেখে তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তবে হামযা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : আল্লাহ 'উমারের কল্যাণ চাইলে সে ইসলাম কবুল করে রাসূলের অনুসারী হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের ভেতরে তখন তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। ক্ষাণিক পরে তিনি বেরিয়ে 'উমারের কাছে এলেন।

'উমারের পোশাক ও তরবারির বাট মুট করে ধরে বললেন : 'উমার! তুমি কি বিরত হবে না?' .... তারপর দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! 'উমার আমার সামনে, হে আল্লাহ! 'উমারের দ্বারা দ্বীনকে শক্তিশালী করে দাও।' 'উমার বলে উঠলেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। ইসলাম কবুল করেই তিনি আহ্বান জানালেন : 'হে আল্লাহর রাসূল। ঘর থেকে বের হয়ে যান।' (তাবকাতুল কুবরা/ইবন সা'দ ৩/২৬৭-৬৯) এটা নবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের ঘটনা।

ইমাম যুহরী বর্ণনা করেন : রাসূল করীম ﷺ-এর দারুল আরকামে প্রবেশের পর 'উমার ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে নারী-পুরুষ সর্বমোট ৪০ অথবা চল্লিশের কিছু বেশি লোক ইসলাম কবুল করেছিলেন। 'উমারের ইসলাম গ্রহণের পর জিবরাইল (আ) এসে বলেন : "মুহাম্মদ, 'উমারের ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা আনন্দিত হয়েছে।" (তাবাকাত : ৩/২৬৯)

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার : 'উমারের ইসলাম গ্রহণে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হলো। যদিও তখন পর্যন্ত ৪০/৫০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে হামযাও ছিলেন অন্যতম তথাপি মুসলমানদের পক্ষে কা'বায় প্রবেশ করে সালাত আদায় তো দূরের কথা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করাও নিরাপদ ছিল না। 'উমারের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এ অবস্থার পটভূমি পরিবর্তন সাধিত হলো। তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিলেন এবং অন্যদের সংগে নিয়ে কা'বা ঘরে সালাত আদায় শুরু করলেন।

'উমার (রা) বলেন : আমি ইসলাম গ্রহণের পর সে রাতেই চিন্তা করলাম, মক্কাবাসীদের মধ্যে রাসূলে করীম ﷺ-এর সবচেয়ে কট্টর শত্রু কে আছে! আমি নিজে গিয়ে তাকে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানাব। আমি মনে করলাম, আবু জাহেলই ইসলাম ও নবীর সবচেয়ে বড় শত্রু। সকাল হতেই আমি তার

দরজায় করাঘাত করলাম। আবু জাহেল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'হে উমার! কি মনে করে?' আমি বললাম : 'আপনাকে একথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদের ﷺ প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনীত বিধান ও বাণীকে মনে প্রাণে মেনে বিশ্বাস করেছি।' একথা শুনামাত্রই সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বলল : 'আল্লাহ্ তোমাকে কলংকিত করুক এবং যে খবর তুই এসেছিস তাকেও কলংকিত করুক।

(সীরাত ইবনে হিশাম)

এভাবে এ প্রথমবারের মতো মক্কার পৌত্তলিক শক্তি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব বলেন : 'উমারের ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্য রূপ নেয়।' আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : 'উমার ইসলাম গ্রহণ করে কুরাইশদের সাথে বাক-বিতর্ক শুরু করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কা'বায় সালাত আদায় করলেন। আমরাও সকলে তাঁর সাথে একত্রে সালাত আদায় করলাম।'

সুহায়িব ইবনে সিনান বলেন : তাঁর ইসলাম কবুলের পর আমরা কা'বার পাশে সারিবেধে একত্রে বসতাম, কা'বার তাওয়াফ করতাম, আমাদের সাথে কেউ রূঢ় আচারণ করলে তার প্রতিশোধ নিতাম এবং আমাদের ওপর যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করতাম। (তাবাকাত : ৩/২৬৯)

আল ফারুক উপাধি : রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে 'আল-ফারুক' উপাধি দেন। কারণ, তাঁরই কারণে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'উমারের জিহ্বা ও অন্তঃকরণে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যকে দৃঢ় করে দিয়েছেন। তাই সে 'ফারুক'। আল্লাহ্ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন। (তাবাকাত : ৩/২৭০)

যাঁরা মক্কায় মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন, রাসূলে করীম ﷺ তাদেরকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। আবু সালামা, আবদুল্লাহ্ ইবনে আশহাল, বিলাল ও আম্মার ইবনে ইয়াসিরের মদীনায় হিজরতের পর বিশজন আত্মীয়-বন্ধুসহ উমার মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। এ বিশজনের মধ্যে তাঁর ভাই যায়েদ, ভাতিজা-সাঈদ ও জামাই খুনাইসও সাথে ছিলেন। মদীনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে তিনি রিফায়া' ইবনে আবদুল মুনজিরের ঘরে আশ্রয় নেন।

হিজরত : উমারের হিজরত ও অন্যদের হিজরতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। অন্যদের হিজরত ছিল নীরবে নীরবে। সকলের অলক্ষে অগোচরে। আর ওমরের হিজরত ছিল জনসম্মুখে প্রকাশ্যে। তার মধ্যে ছিল কুরাইশদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও বিদ্রোহের সুধ্বনি। মক্কা থেকে মদীনায় রওয়ানা পূর্বে তিনি প্রথমে কা'বা তাওয়াফ করলেন। তারপর কুরাইশদের আড্ডায় এসে ঘোষণা করলেন, আমি মদীনায় চলছি। কেউ যদি তার মাকে পুত্র শোক প্রদান করতে চায়, সে যেন উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়। এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি সোজা মদীনার পথে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস দেখাল না। (তারীখুল উম্মাহ আল-ইসলামিয়্যাহ : খিদরী বেক, ১/১৯৮)

ধর্মীয় ভাই সম্পর্ক স্থাপন : বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, রাসূলে করীম ﷺ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সাথে 'উমারের ধর্মীয় ভাই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। আবু বকর সিদ্দীক, উয়াইস ইবনে সায়িদা, ইতবান ইবনে মালিক ও মু'আজ ইবনে আফরা (রা) ছিলেন 'উমারের ধর্মীয় ভাই। তবে এটা নিশ্চিত যে, মদীনায় হিজরতের পর বনী সালেমের সরদার ইতবান ইবনে মালিকের সাথে তাঁর দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। (তাবাকাত : ৩/২৭২)

সর্বদা রাসূলের সাহচর্য : হিজরী প্রথম বছর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত 'উমার (রা)-এর কর্মজীবন মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মময় জীবনেরই একটি অংশ বিশেষ। রাসূলে করীম ﷺ-কে যত সংগ্রাম ও যত চুক্তি করতে হয়েছিল, কিংবা সময় সময় যত বিধি বিধান প্রবর্তন করতে হয়েছিল এবং ইসলাম প্রচারের জন্য যত কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল তার এমন একটি ঘটনাও নেই, যা ওমরের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত সম্পাদন হয়েছে। এজন্য এসব ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে গেলে তা 'উমারের (রা) জীবনী না হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনীতে পরিণত হয়। তাঁর কর্মবহুল জীবন ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : 'উমার বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আরো বেশ কিছু 'সারিয়্যা' (যে-সব ছোট অভিযানে রাসূল করীম ﷺ নিজে হাজির হননি তাতে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পরামর্শদান ও সৈন্য পরিচালনা থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে একান্তভাবে কাজ করেন। বদর

যুদ্ধের বন্দীদের প্রসঙ্গে তাঁর পরামর্শই আল্লাহর পছন্দসই হয়েছিল। এ যুদ্ধে তাঁর যে ভূমিকা রয়েছে তা নিম্নরূপ–

১. এ সংগ্রামে কুরাইশ বংশের প্রত্যেক শাখা থেকে লোক অংশগ্রহণ করে; কিন্তু বনী আ'দী অর্থাৎ 'উমারের খান্দান থেকে একটি লোকও অংশগ্রহণ করেনি। উমারের প্রভাবেই এমনটি হয়েছিল।

২. বদর যুদ্ধে ইসলামের বিপক্ষে 'উমারের সাথে তাঁর গোত্র ও চুক্তিবদ্ধ লোকদের থেকে মোট বারো জন লোক অংশগ্রহণ করেছিল।

৩. বদর যুদ্ধে 'উমার তাঁর আপন মামা আ'সী ইবনে হিশামকে নিজ হাতে হত্যা করেন। এ হত্যার মাধ্যমে তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, সত্যের পথে আত্মীয় ও প্রিয়জনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

উহুদ যুদ্ধেও উমার (রা) ছিলেন একজন অগ্রসৈনিক। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে মুসলিম সৈন্যরা যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন এবং রাসূলে করীম ﷺ আহত হয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গী-সাথীসহ পাহাড়ের এক নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিলেন, তখন কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান নিকটবর্তী হয়ে উচ্চ কণ্ঠে মুহাম্মদ ﷺ, আবু বকর (রা) 'উমার (রা) প্রমূখের নাম ধরে আহ্বান করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জীবিত আছ কি? রাসূল ﷺ-এর ইশারায় কেউই আবু সুফিয়ানের জবাবে সাড়া দিল না। সাড়া না পেয়ে আবু সুফিয়ান ঘোষণা করল : 'নিশ্চয় তারা সকলে মৃত্যুবরণ করেছে।' এ কথায় 'উমারের ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগল। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না।' বলে উঠলেন : আমরা সবাই জীবিত।' আবু সুফিয়ান বলল, 'উলু হুবল– হুবলের জয় হোক।' রাসূলে করীম ﷺ-এর ইঙ্গিতে 'উমার জবাব দিলেন : "আল্লাহ্ তা'আলা ও জাল্লাজালালু– আল্লাহ্ মহান ও সম্মানী।'

খন্দকের যুদ্ধেও উমার সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। উমারের ওপর খন্দকের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান রক্ষা করার দায়িত্ব পড়েছিল। বর্তমানেও সেখানে তাঁর নামে একটি মসজিদ রয়েছে তাঁর সেই স্মৃতি বহন করছে। এ সংগ্রামে একদিন তিনি প্রতিরক্ষায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর আসরের সালাত ছুটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন : 'ব্যস্ততার কারণে আমিও এখন পর্যন্ত সালাত আদায় করতে পারিনি।'

(আল-ফারুক লেখক শিবলী নুমানী পৃষ্ঠা-২৫)

হুদাইবিয়ার প্রতিশ্রুতির পূর্বেই 'উমার যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন। পুত্র আবদুল্লাহকে কোন এক আনসারীর নিকট থেকে ঘোড়া আনার জন্য প্রেরণ করলেন। তিনি এসে খবর দিলেন, 'সাহাবায়ে কেরাম মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করছেন।' 'উমার তখন রণসজ্জায় সজ্জিত। এ অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যদৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হলে 'উমার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। প্রথমে আবু বকর, তারপর স্বয়ং নবী করীম ﷺ-এর নিকট এ সন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। রাসূলে করীম ﷺ বললেন : 'আমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোন কাজ আমি করিনা।' 'উমার শান্ত হলেন। তিনি এর জন্য অনুতপ্ত হলেন। নফল রোযা রেখে, সালাত আদায় করে, গোলাম আযাদ করে এবং দান খয়রাত করে তিনি এ ক্রোধের কাফফারা আদায় করলেন।

খাইবার প্রান্তরে ইহুদীদের অনেকগুলো সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। কয়েকটি সহজেই বিজয় লাভ করল। কিন্তু দু'টি দুর্গ কিছুতেই বিজয় লাভ করা গেল না। রাসূলে করীম ﷺ প্রথম দিন আবু বকর, দ্বিতীয় দিন 'উমারকে প্রেরণ করলেন দুর্গ দু'টি জয় করার জন্য। তাঁরা দু'জনই ফিরে এলেন নিষ্ফল হয়ে। তৃতীয় দিন রাসূলে করীম ﷺ ঘোষণা করলেন : 'আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।' পরদিন সাহাবায়ে কিরাম অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাসূলে করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। প্রত্যেকেরই অন্তরে এই উপস্থিত অর্জনের বাসনা। 'ওমর (রা) বলেন : 'আমি খাইবারে এ ঘটনা ছাড়া কোনদিনই সেনাপতিত্ব বা নের্তৃত্বের জন্য লালায়িত হইনি।' সে দিনের এ গৌরব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন শের-ই খোদা আলী (রা)।

খাইবারের বিজিত ভূমি মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হলো। উমার (রা) তাঁর ভাগ্যের অংশটুকু আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম ওয়াকফ। (আল-ফারুক লেখক শিবলী নুমানী পৃষ্ঠা-৩০)

মক্কা বিজয়ের সময় উমার (রা) ছায়ার মতো মুহাম্মদ ﷺ-কে সঙ্গ দান করেন। ইসলামের চিরশত্রু আবু সুফিয়ান আত্মসমর্পণ করতে এলে 'উমার রাসূলে করীম ﷺ-কে অনুরোধ করেন : আদেশ করুন এখনই ওকে শেষ করে দিই। এদিন

মক্কার পুরুষেরা রাসূলে করীম-এর হাতে এবং নারীগণ রাসূলে করীম-এর নির্দেশে 'উমারের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন।

হুনাইন অভিযানেও উমার অংশগ্রহণ করে বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেছিলেন। এ যুদ্ধ কাফিরদের তীব্র আক্রমণে বারো হাজার মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ইবনে ইসহাক বলেন : মুহাজির ও আনসারদের মাত্র কয়েকজন বীরই এ বিপদকালে নবী করীম-এর সাথে একীভূত ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু বকর, উমার ও আব্বাস (রা) অন্যতম।

তাবুক অভিযানের সময় নবী করীম-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে 'উমার (রা) তাঁর মোট সম্পদের অর্ধেক নবী করীম-এর কাছে তুলে দেন।

রাসূলুল্লাহ-এর ইন্তিকালের সংবাদ শুনে 'উমার কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে বসে থাকেন। তারপর মসজিদে নববীর সামনে গমণ করে তরবারি কোষমুক্ত করে ঘোষণা করেন, 'যে বলবে রাসূলে করীম-এর ইন্তিকাল করেছেন, আমি তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলব।' এ ঘটনা থেকে রাসূলে করীম-এর প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালোবাসার পরিমাণ সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

রাসূলুল্লাহ-এর ইনতিকালের পর 'সাকীফা বনী সায়েদায়' দীর্ঘ আলোচনার পর্যালোচনার পর 'উমার খুব তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আবু বকরের হাতে খিলাফতের বাই'আত গ্রহণ করেন। ফলে খলিফা নির্বাচনের মহাসংকট খুব সহজেই দূরীভূত হয়।

খিলাফত লাভ : খলিফা আবু বকর যখন উপলব্ধি করলেন, তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে, মৃত্যুর পূর্বেই পরবর্তী খলীফা নির্বাচন করে যাওয়াকে তিনি কল্যাণকর মনে করলেন। তাঁর মতে 'উমার (রা) ছিলেন খিলাফতের একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও উঁচু পর্যায়ের সাহাবীদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করা সমীচীন মনে করলেন। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-কে আহ্বান করে বললেন, 'উমার প্রসঙ্গে আপনার অভিমত আমাকে জানান। তিনি বললেন : 'তিনি তো যে কোন ব্যক্তি থেকে উত্তম; কিন্তু তাঁর চরিত্রে কিছু কঠোরতা আছে।' আবু বকর বললেন : 'তার কারণ, আমাকে তিনি কোমল দেখেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে নিলে এ কঠোরতা অনেকটা হ্রাস পাবে।'

তারপর আবু বকর অনুরোধ করলেন, তাঁর সাথে আলোচিত বিষয়টি কারো কাছে প্রকাশ না করার জন্য। অতঃপর তিনি 'উসমান ইবনে আফফানকে ডাকলেন।

বললেন, 'হে আবু আবদুল্লাহ! 'উমার প্রসঙ্গে আপনার অভিমত আমাকে অবগত করুন।' 'উসমান বললেন : আমার থেকে আপনিই তাঁকে বেশি জানেন। আবু বকর বললেন : তা সত্ত্বেও আপনার অভিমত আমাকে ব্যক্ত করুন। 'উসমান বললেন : তাঁকে আমি যতটুকু জানি, তাতে তাঁর বাইরের থেকে ভেতরটা অনেক উত্তম। তাঁর মতো আর কেউ আমাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি নেই। আবু বকর (রা) তাঁদের দু'জনের মধ্যে আলোচিত বিষয়টি গোপন রাখার অনুরোধ করে তাঁকে বিদায় জানালেন।

এভাবে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে মতামত নেয়া শেষ হলে তিনি উসমান ইবনে আফফানকে ডেকে বলে দিলেন : 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা আবু বকর ইবনে আবু কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি প্রতিশ্রুতি। আম্মাবাদ'– এতটুকু বলার পর তিনি মূছা যান। তারপর 'উসমান ইবনে আফফান নিজেই সংযোজন করেন– 'আমি তোমাদের জন্য 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে খলিফা নির্বাচিত করলাম এবং এ বিষয়ে তোমাদের কল্যাণ কামনায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। অতঃপর আবু বকর (রা)-এর জ্ঞান ফিরে এলে লিখিত অংশটুকু তাঁকে পাঠ করে শুনানো হলো।' সবটুকু শুনে তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে ওঠেন এবং বলেন : আমার ভয় হচ্ছিল, আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জনগণ মতানৈক্য সৃষ্টি করবে। 'উসমানকে উদ্দেশ্য করে তিনি আরো বলেন : আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানদের তরফ থেকে আপনাকে কল্যাণ দান করুন।

তাবারী বলেন : অতঃপর আবু বকর জনগণের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস তখন তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তিনি বলেন : 'যে ব্যক্তিকে আমি আপনাদের জন্য নির্বাচন করে যাচ্ছি তাঁর প্রতি কি আপনারা সন্তুষ্ট? আল্লাহর কসম! মানুষের মতামত নিতে আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। আমার কোন নিকট আত্মীয়কে এ পদে বহাল করিনি। আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে আপনাদের খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেছি। আপনারা তাঁর কথা শুনুন, তাঁর আনুগত্য করুন।' এভাবে 'উমারের (রা) খিলাফত আরম্ভ হয় হি: ১৩ সনের ২২ জামাদিউস সানী অনুযায়ী ১৩ আগস্ট ৬৩৪ খৃ:।

রাষ্ট্রনায়ক : 'উমারের রাষ্ট্র শাসন পদ্ধতি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা সম্ভব নয়। দশ বছরের স্বল্পসময়ে গোটা বাইজান্টাইন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। তাঁর যুগে বিভিন্ন অঞ্চলসহ মোট ১০৩৬টি শহর বিজয় অর্জিত হয়।

ইসলামী হুকুমাতের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা মূলত: তাঁর যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার বা রাষ্ট্রের সকল শাখা তাঁর যুগেই আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর শাসন ও ইনসাফের কথা গোটা বিশ্বের মানুষের কাছে কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে রয়েছে।

আমিরুল মু'মিনীন উপাধি : 'উমার প্রথম খলিফা যিনি 'আমীরুল মু'মিনীন' উপাধি লাভ করেন। তিনি সর্বপ্রথম হিজরী সন প্রবর্তন করেন, তারাবীর সালাত জামাআতে আদায়ের প্রচলন করেন, জনশাসনের জন্য দুর্রা বা ছড়ি ব্যবহার করেন, মদপানে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন, বহু রাজ্য বিজয় লাভ করেন, নগর পত্তন করেন, সেনাবাহিনীর স্তরভেদ ও বিভিন্ন ব্যাটালিয়ান নির্দিষ্ট করেন, জাতীয় রেজিস্টার বা নাগরিক তালিকা তৈরি করেন, কাযী নিয়োগ করেন এবং রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন।

রাষ্ট্র পরিচালনা : উমার (রা) ছিলেন রাসূলে করীম ﷺ-এর অন্যতম লেখক। নিজ কন্যা হাফসাকে রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে বিবাহ দেন। তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর ও আবু বকর (রা)-এর মন্ত্রী ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে ব্যবসা ছিল তাঁর জীবিকার একমাত্র সম্বল। খিলাফতের গুরুদায়িত্ব কাঁধে পড়ার পরও কয়েক বছর পর্যন্ত ব্যবসা চালিয়ে যান। কিন্তু পরে তা অসম্ভব হয়ে পড়লে আলী (রা) সহ উঁচু পর্যায়ের সাহাবায়ে কেরামগণ পরামর্শ অনুযায়ী বাইতুল মাল থেকে বাৎসরিক মাত্র আট শ' দিরহাম বেতন নির্ধারণ করেন। হিজরী ১৫ সনে বাইতুল মাল থেকে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বেতন নির্ধারিত হলে বিশিষ্ট সাহাবীদের বেতনের সমান তাঁরও বেতন ধার্য করা হয় মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম।

বাইতুল মালের অর্থ প্রসঙ্গে 'উমার (রা)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইয়াতিমের অর্থের মতো। ইয়াতিমের অভিভাবক যেমন ইয়াতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইয়াতিম ও নিজের জন্য প্রয়োজন মতো ব্যয় করতে পারে, কিন্তু অপচয় করতে পারে না। প্রয়োজন না হলে ইয়াতিমের সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে শুধু হিফাজত করে এবং ইয়াতিম বড় হলে তাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেয়। বাইতুল মালের প্রতি উমার (রা)-এর এ দৃষ্টিভঙ্গিই সর্বদা তাঁর কর্ম ও আচরণের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

'উমার সব সময় একটি লাঠি নিয়ে পথ চলতেন। শয়তানও তাঁকে দেখে ভয়ে দূরে পালিয়ে যেত। (তাজকিরাতুল হুফফাজ) তাই বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কঠোর ন্যায়বিচারক। মানুষকে তিনি আন্তরিকভাবে

ভালোবাসতেন, মানুষও তাঁকে ভালোবাসতো। তাঁর প্রজাপালনের বহু কাহিনীর বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

মর্যাদা : ফারুকে আযমের ফযিলাত ও মর্যাদা প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে এত বেশি ইঙ্গিত ও প্রকাশ্য বাণী রয়েছে যে, সংক্ষিপ্ত কোন প্রবন্ধে তা প্রকাশ করা যাবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলﷺ-এর কাছে তাঁর স্থান সর্বোচ্চে। এজন্য বলা হয়েছে, 'উমার সব মতের সমর্থনেই সর্বদা কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।' আলী (রা) মন্তব্য করেছেন : خَيْرُ اُمَّتِي بَعْدَ نَبِيِّ اَبُوْبَكْرٍ 'উমার রাসূল ﷺ-এর পর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর, তারপর ওমর। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : 'উমারের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের বিজয়। তাঁর হিজরত আল্লাহর সাহায্য এবং তাঁর খিলাফত আল্লাহর রহমাত।' 'উমারের যাবতীয় গুণাবলী লক্ষ্য করেই রাসূলে করীমﷺ বলেছিলেন : لَوْكَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ আমার পরে কেউ নবী তবে উমারই হতো। কারণ তাঁর মধ্যে ছিল নবীদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য।

অবদান : জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে 'উমারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি আরবি কবিতা পঠন-পাঠন ও সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। আরবি ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক; তাঁর সামনে ভাষা প্রসঙ্গে কেউ ভুল করলে শাসিয়ে দিতেন। বিশুদ্ধভাবে আরবী ভাষা শিক্ষা করাকে তিনি দ্বীনের অঙ্গ বলে বিশ্বাস করতেন। আল্লামা জাহাবী 'তাজকিরাতুল হুফফাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'উমার ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে একই হাদীস বর্ণনার প্রতি তিনি গুরুত্ব দেন।

মৃত্যুবরণ : প্রখ্যাত সাহাবী মুগীরা ইবন শু'বার (রা) অগ্নি উপাসক দাস আবু লু'লু ফিরোজ ফজরের সালাত আদায়রত অবস্থায় এ মহান খলীফাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত হওয়ার তৃতীয় দিনে হিজরী ২৩ সনের ২৭ জিলহজ্জ বুধবার তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পূর্বে আলী, উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সা'দ, যুবাইর ও তালহা (রা)–এ ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাদের মধ্যে থেকে কোন একজনকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। সুহাইব (রা) জানাযার ইমামতি করেন।

সমাহিত : রওজায়ে নববীর মধ্যে সিদ্দীকে আকবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর সালাতে জানাযার ইমামতি করেন সুহাইব (রা) ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর খিলাফতকাল ছিল দশ বছর ছয় মাস চার দিন।

উমার ফারূক (রা) সম্পর্কে অথবা তাঁর অভিপ্রায় ও উক্তি অনুসারে কুরআন মাজীদের যে সকল আয়াত নাযিল হয়েছে–

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ط وَعَهِدْ نَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآ ئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী ইতিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১২৫)

عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِ لَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ـ

যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তার প্রতিপালক সম্ভবত তোমাদের স্থলে তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী– যারা হবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, 'ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী। (সূরা তাহরীম : আয়াত-৫)

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ـ

অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! (সূরা আল মু'মিনূন : আয়াত-১৪)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ـ

যে কেউ আল্লাহর তাঁর ফিরিশতাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মীকাঈলের শত্রু, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ নিশ্চয় কাফিরদের শত্রু।
(সূরা আল বাক্বারা : আয়াত-৯৮)

৩. 'উসমান ইবনে 'আফফান (রা)

তাঁর চাচা হাকাম ইবনে আবিল 'আস তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে নির্মম নির্যাতন করত। সে বলত, একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ-দাদার মুখে কালিমা অংকন করে কলংক করেছ। এ ধর্ম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া হবে না। এতে 'উসমান ঈমানের পথ থেকে একটুও টলেনি। তিনি বলতেন : তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর, এ ধর্ম আমি কখনো পরিত্যাগ করবো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে আশারায়ে মুবাশ্‌শারা বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ -

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ জান্নাতী। (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবদুর রহমান ইবনে আওফ– ৩/২৯৪৬)

নাম : তাঁর নাম 'উসমান, উপনাম আবু 'আমর, আবু আবদিল্লাহ, আবু লায়লা এবং উপাধী যুন নূরাইন। (তাবাকাত ৩/৫৩, তাহজীবুত তাহজীব)

পরিচিতি : পিতা 'আফফান, মাতা আওয়া বিনতে কুরাইয। কুরাইশ বংশের উমাইয়া বংশের সন্তান। তাঁর উর্ধ্ব পুরুষ 'আবদে মান্নাফে গিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নসবের সাথে তাঁর নসব এক হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলিফা। তাঁর নানী বায়দা বিনতে আবদিল মুত্তালিব নবী করীম ﷺ-এর ফুফু।

জন্ম : জন্ম হস্তীসনের ছ'বছর পরে ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে (আল-ইসতিয়াব) এ হিসেবে নবী করীম ﷺ থেকে তিনি ছয় বছর ছোট। তবে তাঁর জন্মসন প্রসঙ্গে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। ফলে শাহাদাতের সময় তাঁর সঠিক বয়স কত ছিল সে বিষয়ে অনুরূপ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন বর্ণনা মতে, তায়েফে তাঁর জন্ম হয়। (ফিতনাতুল কুবরা, ড. তোহা হুসাইন।)

দৈহিক বিবরণ : উসমান (রা) ছিলেন মধ্যমাকৃতির একজন সুঠাম দেহের অধিকারী। মাংসহীন গণ্ডদেশ, ঘন দাড়ি, উজ্জ্বল ফর্সা, ঘন কেশ, বুক ও কোমর চওড়া, কান পর্যন্ত ঝোলানো যুলকী, পায়ের নলা মোটা, পশম ভরা দীর্ঘ বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদী রঙের দাড়ি এবং স্বর্ণখচিত দাঁত।

ইসলাম পূর্ব জীবন : উসমানের জীবনের প্রাথমিক অবস্থা অন্যান্য সাহাবীর মতো জাহিলী যুগের অন্ধকারেই রয়ে গেছে। তাঁর ইসলাম পূর্ব জীবন এমনভাবে একাভূত হয়েছে যেন ইসলামের সাথেই তাঁর জন্ম। ইসলাম পূর্ব জীবনের বিশেষ কোন তথ্য ঐতিহাসিকরা আমাদের নিকট পৌঁছাতে পারেননি।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : উসমান (রা) ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম কুষ্টিবিদ্যা বিশারদ। কুরাইশদের প্রাচীন ইতিহাসেও ছিল তাঁর নাম। তাঁর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সৌজন্যবোধ ও লৌকিকতাবোধ ইত্যাদি গুণাবলীর জন্য সর্বদা তাঁর পাশে মানুষের ভীড় জমে থাকত। জাহিলী যুগের কোন অপকর্ম তাঁকে একটুকুও স্পর্শ করতে পারেনি। লজ্জা ও অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর মহান চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গণী উপাধি : যৌবনে তিনি অন্যান্য অভিজাত কুরাইশদের মতো ব্যবসা শুরু করেন। সীমাহীন সততা ও অতীব বিশ্বস্ততার গুণে ব্যবসায় অসাধারণ সফলতা লাভ করেন। মক্কার সমাজে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে 'গণী' উপাধিতে ভূষিত হন।

ইসলাম গ্রহণ : 'উসমানকে 'আস-সাবেকুনাল আওয়ালুন' (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী), 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা' এবং সে ছ'জন শ্রেষ্ঠ সাহাবীর মধ্যে গণ্য

করা হয় যাঁদের প্রতি রাসূলে মাকবূল ﷺ আমরণ সন্তুষ্ট ছিলেন। আবু বকর সিদ্দীকের সাথে তাঁর সুগভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরই তাবলীগ ও উৎসাহে তিনি ইসলাম কবুল করেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম) মক্কার আরো অনেক নেতৃবৃন্দের আচরণের বিপরীত উসমান রাসূলে করীম ﷺ-এর নবুওয়াতের সূচনা পর্বেই তাঁর দাওয়াতে এগিয়ে আসেন এবং আজীবন জান-মাল ও সহায় সম্পত্তি দ্বারা মুসলমানদের কল্যাণকামী ছিলেন। 'উসমান বলেন : 'আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ। (উসদুল গাবা) ইবনে ইসহাকের মতে, আবু বকর, আলী এবং যায়েদ ইবনে হারিসের পরে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হলেন উসমান (রা)।

উসমানের ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে সীরাত লেখক ও মুহাদ্দীসগণ যেসব বিবরণ তুলে ধরেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ–

কেউ কেউ বলেন, তাঁর খালা সু'দা ছিলেন যে যুগের একজন বিশিষ্ট 'কাহিন' বা ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি রাসূলে করীম ﷺ প্রসঙ্গে উসমানকে কিছু কথা ব্যক্ত করেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণে উৎসাহিত করেন। তারই উৎসাহ পেয়ে তিনি ইসলাম কবুল করেন। (আল ফিতনাতুল কুবরা) পক্ষান্তরে ইবনে সা'দসহ আরো বহু বর্ণনা করেন : উসমান সিরিয়া সফররত ছিলেন। যখন তিনি 'মুয়ান ও যারকার' মধ্যবর্তী স্থানে বিশ্রাম করছিলেন তখন তন্দ্রালু অবস্থায় এক আহবানকারীকে বলতে শুনলেন : ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা! তাড়াতাড়ি কর। আহমদ নামের রাসূল মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে শুনতে পেলেন ব্যাপারটি সত্য। অতঃপর আবু বকরের ডাকে ইসলাম কবুল করেন।

(তাবাকাত : ৩/৫৫)

উসমান যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স তিরিশোর্ধ। ইসলামপূর্ব যুগেও আবু বকরের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর আবু বকরের গৃহে তাঁর আসা যাওয়া ছিল। একদিন আবু বকর (রা) তাঁর সামনে ইসলাম উপস্থাপন করলেন। ঘটনাক্রমে রাসূলে করীম ﷺ ও তখন সে পথ দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি বললেন : 'উসমান, জান্নাতে প্রবেশকে গ্রহণ করে নাও। আমি তোমাদের এবং আল্লাহর সকল মাখলুকের প্রতি তাঁর রাসূল হিসেবে আগমন করেছি। একথা শোনার সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। 'উসমানের ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর খালা সু'দা তাঁকে স্বাগতম ও অভিনন্দন জানিয়ে একটি কাসীদা রচনা করেছিলেন।

উসমানের সহোদর আমীনা, বৈপিত্রীয় ভাই বোন ওয়ালীদ, খালিদ, আম্মারা, উম্মু কুলসুম সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের পিতা উকবা ইবনে আবু মুয়ীত। দারু কুতনী বর্ণনা করেছেন, উম্মু কুলসুম প্রথম পর্বের একজন মুহাজির। বলা হয়েছে তিনিই প্রথম কুরাইশ বধূ যিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। উসমানের অন্য ভাই-বোন বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

নির্মম অত্যাচারের স্বীকার : ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ইসলামের শত্রুদের লাঞ্ছনা গঞ্জনার শিকার হতে হয়। তাঁর চাচা হাকাম ইবনে আবিল 'আস তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে নির্মম নির্যাতন করত। সে বলত, একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ-দাদার মুখে কালিমা অংকন করে কলংক করেছ। এ ধর্ম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া হবে না। এতে 'উসমান ঈমানের পথ থেকে একটুও টলেনি। তিনি বলতেন : তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর, এ ধর্ম আমি কখনো পরিত্যাগ করবো না।

(তাবাকাত : ৩/৫৫)

বিবাহ : উসমান (রা) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলে করীম ﷺ-এর নিজ কন্যা 'রুকাইয়্যাকে' তাঁর সাথে রাসূল বিবাহ দেন। হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনায় রুকাইয়্যা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে নবী করীম ﷺ-এর তাঁর দ্বি তীয় কন্যা উম্মু কুলসুমকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। এ কারণে তিনি 'যুন নূরাইন'– দুই জ্যোতির অধিকারী উপাধি লাভ করেন।

রুকাইয়্যা খাদীজা (রা)-এর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় উতবা ইবনে আবু লাহাবের সাথে এবং উম্মু কুলসুমের বিবাহ হয় আবু লাহাবের দ্বিতীয় পুত্র উতাইবার সাথে। আবু লাহাব ছিল আল্লাহর নবীর কট্টর দুশমন। পবিত্র কুরআনের সূরা লাহাব নাযিল হওয়ার পর আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল (হাম্মা লাতাল হাতাব) তাদের পুত্রদ্বয়কে আদেশ দিল মুহাম্মদের কন্যাদ্বয়কে তালাক প্রদান করার জন্য। অবশেষে তারা তালাক দিল। অবশ্য ইমাম সূয়ূতী মনে করেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই রুকাইয়্যার সাথে উসমানের বিবাহ সম্পাদন হয়। উপরিউক্ত ঘটনার আলোকে সুয়ুতীর অভিমতটি অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

হাবশায় হিজরত : নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে মক্কার মুশরিকদের প্রবল অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম যে দলটি হাবশায় হিজরত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উসমান ও তাঁর স্ত্রী রুকাইয়্যাও অন্যতম। আনাস ইবনে মালেক (রা)

বলেন : 'হাবশার মাটিতে প্রথম হিজরতকারী উসমান ও তাঁর স্ত্রী নবী দুহিতা রুকাইয়্যা।' রাসূলে করীম ﷺ দীর্ঘদিন তাঁদের কোন খোঁজ-খবর না পেয়ে ভীষণ উৎকণ্ঠের মধ্যে দিন কাটান। সে সময় এক কুরাইশ রমণী হাবশা থেকে মক্কায় গমন করল। তার কাছে রাসূলে করীম ﷺ তাঁদের দু'জনের খোঁজ খবর নেন।

সে সংবাদ দেয়, 'আমি দেখেছি, রুকাইয়্যা গাধার ওপর সওয়ার হয়ে আছে এবং 'উসমান গাধাটি হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূলে করীম ﷺ তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন : আল্লাহ তার ওপর সহায় হোন। লূত (আ)-এর পর 'উসমান আল্লাহর পথে পরিবার পরিজনসহ প্রথম হিজরতকারী। (আল-ইসাবা) হাবশা অবস্থানকালে তাঁদের সন্তান আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে এবং এ পুত্রের নাম অনুসারে তাঁর কুনিয়াত হয় আবু আবদিল্লাহ। হিজরী ৪র্থ সনে আবদুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। রুকাইয়্যার সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন খুবই সুখের হয়েছিল। লোকেরা বলাবলি করত কেউ যদি সর্বোত্তম জুটি দেখতে চায়, সে যেন উসমান ও রুকাইয়্যাকে দেখে।

মদীনায় হিজরত : উসমান বেশ কিছুদিন হাবশায় বসবাস করেন। অতঃপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন এ গুজব শুনে যে, মক্কার নেতৃবৃন্দ ইসলাম কবুল করেছে। রাসূলে করীম ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পর ইবনেরায় তিনি মদীনায় হিজরত করেন। এভাবে তিনি 'যুল হিজরাতাইন' দুই হিজরাতের অধিকারী হন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : একমাত্র বদর যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসূলে করীম ﷺ যখন বদর যুদ্ধে অগ্রসর হন, রুকাইয়্যা তখন ভীষণ অসুস্থ। রাসূলে করীম ﷺ-এর নির্দেশে 'উসমান অসুস্থ স্ত্রীর সেবার জন্য মদীনায় থেকে যান। বদরের বিজয়ের সংবাদ যেদিন মদীনায় এসে পৌছলো সেদিনই রুকাইয়্যা মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলে করীম ﷺ উসমানের জন্য বদরের যোদ্ধাদের মতো সওয়াব ও গনীমতের অংশ ঘোষণা করেন। (তাবাকাত : ৩/৫৬) এ হিসেবে পরোক্ষভাবে তিনিও একজন বদরী সাহাবী।

দ্বিতীয় বিবাহ : রুকাইয়্যার ইনতিকালের পর রাসূলে করীম ﷺ রুকাইয়্যার ছোট বোন উম্মু কুলসুমকে উসমানের সাথে বিবাহ দেন হিজরী তৃতীয় সনে। একটি বর্ণনায় জানা যায়, আল্লাহর নির্দেশেই রাসূলে করীম ﷺ উম্মে কুলসুমকে 'উসমানের সাথে বিবাহ দেন। হিজরী নবম সনে উম্মে কুলসুমও নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তিকাল করেন করেন। উম্মে কুলসুমের ইন্তিকালের পর রাসূলে করীম

ﷺ বলেন : 'আমার যদি তৃতীয় কোন কন্যা থাকত তাকেও আমি 'উসমানের সাথে বিবাহ দিতাম।' (হায়াতু 'উসমান : রিজা মিসরী)

উসমান উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সে মুষ্টিমেয় কিছু যোদ্ধাদের মতো রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে অটল থাকতে পারেননি। অধিকাংশ মুজাহিদদের সাথে তিনিও ময়দান ত্যাগ করেন। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী সকল যুদ্ধেই অন্যসব বিশিষ্ট সাহাবীদের মতো অংশগ্রহণ করেছেন।

দানশীলতা : রাসূলে করীম ﷺ তাবুক অভিযানের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। মক্কা ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহেও নির্দেশ দিলেন এ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য। ইসলামী ফৌজের সংগঠন ও ব্যয় নির্বাহের সাহায্যের আবেদন জানালেন। সাহাবীরা ব্যাপকভাবে সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করলেন। আবু বকর তাঁর সকল অর্থ রাসূলে করীম ﷺ-এর হাতে তুলে দিলেন। 'উমার তাঁর মোট অর্থের অর্ধেক নিয়ে হাজির হলেন। আর এ যুদ্ধের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্যের সমুদয় খরচ উসমান নিজ কাঁধে তুলে নিলেন।

তিনি সাড়ে নয় শ' উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া সরবরাহ করেন। ইবনে ইসহাক বলেন, উসমান এত বিপুল অর্থ খরচ করেন যে, তাঁর সমপরিমাণ আর কেউ খরচ করতে পারে নি। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের প্রস্তুতির জন্য উসমান এক হাজার দীনার নিয়ে এসে রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে তুলে দেন। রাসূল করীম ﷺ খুশীতে দীনারগুলো উল্টে-পাল্টে দেখেন এবং বলেন : 'আজ থেকে 'উসমান যা কিছুই করবে, কোন কিছুই তার জন্য অকল্যাণকর হবে না।' এভাবে অধিকাংশ যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় তিনি হাত খুলে দান করতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের যুদ্ধে তাঁর দানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসূলে করীম ﷺ তাঁর পূর্বের পরের যাবতীয় পাপ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেন। (আল-ফিতনাতুল কুবরা)

দায়িত্ব পালন : হুদাইবিয়ার ঘটনা। রাসূলে করীম ﷺ 'উমারকে ডেকে বললেন : তুমি মক্কায় যাও। মক্কার নেতৃবৃন্দকে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য অবগত কর। 'উমার বিনীতভাবে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! কুরাইশদের কাছ থেকে আমার জীবনের আশঙ্কা করছি। আপনি জানেন তাদের সাথে আমার

শত্রুতা কতখানি। আমি মনে করি উসমানই এ কাজের জন্য উপযুক্ত। রাসূলে করীম ﷺ উসমানকে ডাকলেন। আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে এ পয়গামসহ উসমানকে পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ নয়, বরং 'বাইতুল্লাহর' যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেছি।

রাসূলে করীম ﷺ-এর পয়গাম নিয়ে উসমান মক্কায় এসে পৌঁছলেন। সর্বপ্রথম আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আস-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আবান তাঁকে নিরাপত্তা দানের আশ্বাস দেন। আবানকে সঙ্গে করে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে রাসূলে করীম ﷺ-এর পয়গাম পৌঁছে দেন। তারা উসমানকে বলে, তুমি ইচ্ছে করলে 'তাওয়াফ' আদায় করতে পার। কিন্তু 'উসমান তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, রাসূলে করীম ﷺ যতক্ষণ 'তাওয়াফ' না করেন, আমি 'তাওয়াফ' করতে পারিনে। কুরাইশরা তাঁর এ কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বন্দি করে।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, 'উসমানকে তারা তিনদিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখে। এ দিকে হুদাইবিয়ায় মুসলিম শিবিরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে উসমানকে শহীদ করা হয়েছে। রাসূলে করীম ﷺ ঘোষণা করলেন, 'উসমানের রক্তের বিনিময় না নিয়ে আমরা ফিরব না। রাসূলে করীম ﷺ নিজের ডান হাতটি বাম হাতের ওপরে রেখে বলেন : হে আল্লাহ! এ বাই'আত 'উসমানের পক্ষ থেকে। সে তোমার ও তোমার রাসূলের কাজে মক্কায় গিয়েছে। 'উসমান মক্কা থেকে ফিরে এসে বাই'আতের কথা শুনতে পান। তিনি নিজেও নবী করীম ﷺ-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এ ঘটনাকে বাই'আতুর রিদওয়ান, বাইআতুশ শাজারা ইত্যাদি নামে পরিচিত। পবিত্র কুরআনে এ বাই'আতের প্রশংসা করা হয়েছে।

বাইয়াত গ্রহণ : নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের পর যখন আবু বকরের হাতে বাই'আত গ্রহণ করা হচ্ছিল উসমান সংবাদ পেয়ে খুব দ্রুত সেখানে আগমন করেন এবং আবু বকরের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। ইন্তিকালের সময় আবু বকর উমার (রা)-কে খলিফা নির্বাচিত করে যে অঙ্গীকার পত্রটি লিখে যান, তার লিখক ছিলেন 'ওসমান (রা)। খলিফা 'উমারের (রা) হাতে তিনিই সর্বপ্রথম বাই'আত করেন।

খলিফা নির্বাচন : উমার (রা) ছুরিকাহত হয়ে যখন অন্তিম শয্যায়, তাঁর কাছে দাবি করা হলো পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য। কিন্তু তিনি ইতস্তত: করে বললেন : আমি যদি খলিফা নির্বাচন করে যাই, তবে তার দৃষ্টান্ত অবশ্য রয়েছে, যেমনটি করেছেন আমার থেকেও এক উত্তম ব্যক্তি, অর্থাৎ আবু বকর (রা)। আর যদি নাও নির্বাচন করে যাই তারও দৃষ্টান্ত আছে। যেমনটি করেছিলেন আমার থেকেও এক উত্তম ব্যক্তি, অর্থাৎ নবী করীম ﷺ। তিনি আরো বললেন : আবু 'উবাইদা জীবিত থাকলে তাকেই খলিফা নির্বাচিত করে যেতাম।

আমার পালনকর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আপনার নবীকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি এ উম্মাতের আমীন বা পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি। যদি আবু হুজাইফার আযাদকৃত দাস সালেমও আজ জীবিত থাকত, তাকেও খলিফা নির্বাচন করে যেতে পারতাম, আমার পালনকর্তা জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আপনার নবীকে আমি বলতে শুনেছি, সালেম বড় আল্লাহ-প্রেমিক। এক ব্যক্তি তখন বলল, আবদুল্লাহ ইবনে উমার তো রয়েছে। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন। কসম আল্লাহর, আমি আল্লাহর নিকট এমনটি চাই না। .... খিলাফতের এ দায়িত্বের মধ্যে যদি উত্তম কিছু থেকে থাকে, আমার বংশ থেকে আমি তা লাভ করেছি।

আর যদি তা নিতান্ত মন্দ হয় তাও আমরা অর্জন করেছি। উমারের বংশের এক ব্যক্তির হিসাব-নিকাশই এজন্য যথেষ্ট। আমি আমার নিজের আত্মার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, আমার পরিবারবর্গকে বঞ্চিত করেছি। কোন পুরস্কার প্রাপ্তিও নয় এবং কোন তিরষ্কারও নয় এমনভাবে যদি আমি কোন মতে মুক্তি লাভ করি, নিজেকে কল্যাণকর মনে করব।

যখন একই কথা তাঁর কাছে পুনরায় ব্যক্ত করা হলো, তিনি আলী (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমাদেরকে সত্য ও আদর্শের ওপর পরিচালনার তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। তবে আমি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় এ দায়িত্ব বহন করতে সম্মত নই। তোমাদের সামনে এ একটি দল আছেন, যাঁদের সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন, তাঁরা জান্নাতের অধিবাসী। তাঁরা হলেন আবদে মান্নাফের দুই পুত্র আলী ও উসমান, রাসূলে করীম ﷺ-এর দুই মাতুল আবদুর রাহমান ও সা'দ রাসূলের ﷺ হাওয়ারী ও ফুফাতো ভাই যুবাইর ইবনুল আওয়াম এবং তালহা। তাঁদের যে কোন একজনকে খলিফা নির্বাচিত করবে।

তাঁদের যে কেউ খলিফা নির্বাচিত হলে তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে, তাঁর সাথে উত্তম সদাচরণ করবে। তিনি যদি তোমাদের কারো ওপর কোন দায়িত্ব দেন, যথাযথভাবে তোমরা তা পালন করবে।

উমার উল্লেখিত দলটির সদস্যদের ডেকে বললেন, আপনাদের প্রসঙ্গে আমি ভেবে দেখেছি। আপনারা জনসাধারণের নেতা ও পরিচালক। খিলাফতের দায়িত্বটি আপনাদের মধ্যেই থাকা অপরিহার্য। আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট থেকে নবী করীম ইন্তিকাল করেছেন। আপনারা ঠিক থাকলে জনগণের ব্যাপারে আমার কোন শংকা নেই। তবে আপনাদের পারস্পরিক বিবাদকে আমি ভয় করি। জনগণ তাতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে।

অত:পর তিনি নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করেছিলেন তাঁর ইন্তিকালের পর তিন দিন তিন রাত্রি। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে বললেন, আমাকে সমাহিত করার পর এ দলটিকে একত্র করবে এবং তাঁরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবে। সুহায়িবকে বললেন : তিন দিন তুমি সালাতের জামা'আতের ইমামতি করে নিবে। আলী, উসমান, সা'দ 'আবদুর রাহমান, যুবাইর ও তালহার কাছে আগমন করবে, যদি তালহা মদীনায় অবস্থান করে (তালহা তখন মদীনার বাইরে ছিলেন)। তাদেরকে এক স্থানে একত্রিত করবে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমারকেও উপস্থিত করবে। তবে খিলাফতের কোন হক তার নেই। তাঁদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। তাঁদের পাঁচজন যদি কোন একজন সম্পর্কে ঐক্যমত হয় এবং একজন দ্বিমত পোষণ করে, তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে ফেলবে। আর যদি চারজন একমত হয় এবং দু'জন অস্বীকার করে, তবে সে দু'জনের গর্দান উপড়ে ফেলবে। আর যদি তিনজন করে দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়, আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার যে পক্ষ অবলম্বন করবে তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবে। অন্য পক্ষ যদি আবদুল্লাহ ইবনে 'উমারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, তাহলে আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ যে দিকে অবস্থান করবে তোমরা সে দিকে যাবে। বিরোধীরা যদি জনগণের সিদ্ধান্ত মেনে না নেয় তাহলে তাদেরকে মানাতে বাধ্য করবে।

উমারকে সমাহিত করার পর মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ শূরার সদস্যদের মিসওয়ার ইবনুল মাখরামা মতান্তরে আয়েশা সিদ্দীকার কক্ষে একত্র করলেন। তাঁরা পাঁচজন। তালহা তখনো মদীনার বাইরে অবস্থিত। তাঁদের সাথে যুক্ত

হলেন আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার। বাড়ির দরজায় দারোয়ান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলো আবু তালহাকে। বিয়ষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও তুমুল বাক-বিতণ্ডা হলো। এক পর্যায়ে আবদুর রহমান বললেন : তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে তার দাবি ছাড়তে পার এবং তোমাদের উত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচনের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করতে পার? আমি আমার খিলাফতের দাবি ছেড়েছি। 'উসমান সর্বপ্রথম এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আবদুর রহমানের হাতে তাঁর ক্ষমতা অর্পণ করলেন। তারপর অন্য সকলে তাঁর অনুসরণ করলেন। এভাবে খলিফা নির্বাচনের সম্পূর্ণ দায়িত্বটা আবদুর রাহমানের কাঁধে এসে পড়ে।

আবদুর রহমান দিনরাত রাসূলে করীম ﷺ-এর অন্যসব সাহাবী, মদীনায় অবস্থানরতম সকল সেনা-অফিসার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গসহ সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করলেন। কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো সম্মিলিতভাবে। প্রায় সকলেই উসমানের পক্ষে তাদের অভিমত পেশ করলেন।

যেদিন সকালে 'উমারে নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হবে, সে রাতে আবদুর রহমান এলেন মাখরামার ঘরে। তিনি প্রথমে যুবাইর ও সা'দকে ডেকে মসজিদে নববীর সুফফায় বসে এক এক করে তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন, এভাবে উসমান ও আলীর সাথেও সুবহে সাদিক পর্যন্ত একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ : এদিকে মসজিদে নববীতে লোকে লোকারণ্য। শেষ সিদ্ধান্তটি শোনার জন্য সবাই অস্থির। ফজরের সালাতের পর উপস্থিত মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত এক ভাষণের পর আবদুর রহমান খলিফা হিসেবে 'উসমানের নামটি ঘোষণা করেন এবং তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। তারপরই আলীও বাই'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর উপস্থিত জনগণ 'উসমানের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। হিজরী ২৪ সনের ১ মুহাররম সোমবার ভোরবেলা তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। (তারীখুল উম্মাহ আল ইসলামিয়্যাহ, খিদরী বেক)

'উসমান অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। খিলাফতের প্রথম পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে তেমন কোন অভিযোগ উত্থাপন হয়নি। তবে শেষের দিকে বসরা, কুফা, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। মুলত: এ অসন্তোষ সৃষ্টির পেছনে বিশেষ

ভূমিকা পালন করে পরাজিত ইয়াহুদী শক্তি। আস্তে আস্তে তারা সংঘটিত হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে থাকে এবং মদীনায় খলিফার বাসভবন ঘেরাও করে। এ বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন স্বনামধন্য ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

শাহাদত বরণ : তারা খলিফাকে হত্যার হুমকি দিয়ে পদত্যাগ দাবি করে। খলীফার বাসস্থানের খাবার ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। মসজিদে সালাত আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে তারা খলিফার ঘরে প্রবেশ করে এবং রোযা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতরত বয়োবৃদ্ধ খলিফাকে হত্যা করে। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এ ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরী ৩৫ সনের ১৮ যিলহজ্জ, শুক্রবার আসর সালাতের পর। রাসূলে করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের ও উসমানের শাহাদাতের মধ্যে ২৫ বছরের ব্যবধান। বারো দিন কম বারো বছর একটানা তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

সমাহিত : জহান্নাতুল বাকীর 'হাশশে কাওকাব' নামক অংশে তাঁকে দাফন করা হয়। মাগরিব ও এশার মাঝামাঝি সময়ে তাঁর দাফন কার্য সমাধা হয়। যুবাইর ইবনে মুতঈম (রা) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। কাবুল থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল খিলাফতের কর্ণধারের জানাযায় মাত্র সত্তরজন মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স কত হয়েছিল সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে ৮২ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ছিল বলে অধিক অভিমত রয়েছে।

(আল-ফিতনাতুল কুবরা)

সহজ-সরল ব্যক্তিত্ব : খলিফা উসমান বিদ্রোহীদের দ্বারা বেষ্টিত হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তাদের সমূলে নির্মূল করতে পারতেন। অন্য সাহাবীরা সেজন্য প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু উসমান নিজের জন্য কোন মুসলমানের রক্ত ঝরাতে চাননি। তিনি চাননি মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাতের সূচনাকারী হতে। বাস্তবেই এমন এক নাজুক মুহূর্তে উসমান (রা) যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন তা একজন খলিফা ও একজন বাদশার মধ্যে যে তফাৎ তা স্পষ্ট করে তুলেছিল। তাঁর স্থলে যদি কোন বাদশাহ হতো, নিজের ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে যেকোন কৌশল অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করত না। তাতে যত ক্ষতি বা ধ্বংসই হোক না কেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খলিফা রাশেদ। নিজের জীবন দেয়াকে তুচ্ছ মনে করছেন। নিজের জীবন একজন মুসলমানের সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া আবশ্যক।'

(খিলাফত ও মুলকিয়্যাত : আবুল আলা মওদূদী)

ইসলামের জন্য অবদান : ইসলামের জন্য 'উসমানের অপরিসীম অবদান মুসলিম জাতি কোন দিন ভুলতে পারবে না। ইসলামের সে সংকট মুহূর্তে আল্লাহর পথে তিনি যেভাবে খরচ করেছেন, অন্য কোন ধনাঢ্য মুসলমানের মধ্যে তার কোন উদাহরণ নেই। তিনি বিশাল অর্থের মাধ্যমে ইয়াহূদী মালিকানাধীন 'বীরে রুমা'– কূপটি ক্রয় করে মদীনার মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। বিনিময়ে নবী করীম ﷺ তাঁকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! যিনি একদিন 'বীরে রুমা' ওয়াক্ফ করে মদীনাবাসীদের পানি-কষ্ট দূর করেছিলেন, তাঁর বাড়িতেই সে কূপের পানি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। সে ঘেরাও অবস্থায় একদিন তিনি জানালা দিয়ে মাথা বের করে মদীনাবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, রাসূলে করীম ﷺ-এর নির্দেশে আমিই বীরে রুমা ক্রয় করে সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্ফ করেছি। আজ সে কূপের পানি থেকেই তোমরা আমাকে বঞ্চিত করলে। আমি আজ পানির অভাবে ময়লা পানি দিয়ে ইফতার করছি।

মর্যাদা : উসমানের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলে করীম ﷺ থেকে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সারকথা : তিনি নবী করীম ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী ছিলেন। রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। নবী করীম ﷺ বার বার তাঁকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : 'প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে উসমান।' (তিরমিযী) আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার বলেন : নবী ﷺ-এর সময়ে মুসলমানরা আবু বকর, উমার ও উসমানকে সকলের থেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করতেন। তা ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীদের বিশেষ কোন মর্যাদা দেয়া হতো না।

আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত–

اِنْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ (صعلم) فَدَخَلَ حَائِطًا لِاَنْصَارٍ فَقَضٰى حَاجَتَهٗ فَقَالَ لِىْ يَا اَبَا مُوْسٰى اَمْلِكْ عَلَى الْبَابِ فَلاَ يَدْخُلَنَّ اَحَدٌ اِلاَّ بِاِذْنٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاْذِنُ قَالَ ائْذَنْ لَهٗ

وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ قَالَ افْتَحْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهٗ وَدَخَلَ فَبَشَّرْتُهٗ بِالْجَنَّةِ فَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَضَرَبَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ قَالَ افْتَحْ لَهٗ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى يُصِيْبُهٗ ـ

আমি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যাচ্ছিলাম হঠাৎ করে তিনি আনসারের এক উদ্যানে ঢুকলেন, সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করে আমাকে বলেন, হে আবূ মূসা! তুমি দরজায় দাঁড়াও, কেউ যেন বিনা অনুমতিতে আমার নিকট না আসে। ইতোমধ্যে দরজায় একজন আঘাত করল, আমি বললাম কে? বললেন, আমি আবূ বকর, আসার অনুমতি চাচ্ছি। রাসূল ﷺ বললেন, প্রবেশের অনুমতি দাও এবং জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়ে দাও। আরেক জন এসে দরজায় আঘাত করল। আমি প্রশ্ন করলাম, কে তুমি? উত্তরে বলেন, আমি উমার। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! উমার ভিতরে আসার অনুমতি তলব করছে। রাসূল ﷺ বললেন, তাকে আসার অনুমতি দিয়ে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিয়ে দাও। পুনরায় দরজায় আরেকজন আঘাত করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি? উত্তরে বললেন, আমি উসমান ভিতরে আসার অনুমতি চাই। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! উসমান ভিতরে আসতে চায়। রাসূল ﷺ বললেন, আসার অনুমতি দিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, যখন আমি উসমানকে রাসূল ﷺ-এর প্রদত্ত শুভ সংবাদ দেই, তখন তিনি আল-হামদুলিল্লাহ পড়েন।

রাসূল ﷺ উসমানকে দূত হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেন, যার ফলে বাইআতুর রিজওয়ান' এর ব্যবস্থা হয়। সে সময় রাসূল ﷺ বলেন, উসমান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কাজে নিমগ্ন। অতঃপর রাসূল ﷺ স্বীয় এক হাত অপর হাতের উপর রেখে উসমানের পক্ষ থেকে বাইআত করেন। রাসূল ﷺ-এর হাত উসমানের হাত অপেক্ষা উত্তম। একদা রাসূল ﷺ-এর দরবারে আবূ বকর আসেন, রাসূল ﷺ শুয়েই থাকলেন। তিনি কথাবার্তা বলে চলে গেলেন।

অতঃপর উমার আসলেন তবুও রাসূল ﷺ পূর্বের ন্যায় শুয়ে থাকলেন। উমারও কথাবার্তা বলে চলে গেলেন। এবার আসলেন উসমান। তখন রাসূল ﷺ উঠে ভালোভাবে কাপড়-চোপড় পরিধান করে বললেন–

اَلاَ اَسْتَحْيِ رَجُلاً تَسْتَحْيِ مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ .

আমি কি এমন ব্যক্তিকে দেখে লজ্জা করব না যাকে দেখে স্বয়ং ফেরেশতারা লজ্জা করে। অপর বর্ণনায় রয়েছে–

اِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيٌّ وَاِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ اَذِنْتُ لَهُ عَلٰى تِلْكَ الْحَالَةِ اَنْ لاَ يَبْلُغَ اَنِّيْ فِيْ حَاجَتِهِ .

উসমান (রা) অত্যন্ত লজ্জাশীল ব্যক্তি। আমি যদি তাকে ঐ অবস্থায় ডাকতাম তাহলে হয়ত সে তার আগমনের উদ্দেশ্যই বলতে পারত না। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ বলেন–

يَا عُثْمَانُ اِنَّهُ لَعَلَّ اللّٰهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا فَاِنْ اَرَادُوْكَ عَلٰى خُلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْ لَهُمْ .

হে উসমান! আল্লাহ্ তোমাকে নিজ হাতে জামা পরিয়ে দেবেন। যদি লোকেরা সে জামা খুলতে চায় তাহলে তুমি অবশ্যই খুলতে দেবে না। আশেকে রাসূল আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) বলেন রাসূল ﷺ একটি ফিতনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন–

يُقْتَلُ هٰذَا فِيْهَا مَظْلُوْمَ لِعُثْمَانَ .

সে ফিতনায় উসমান (রা) মজলুম হয়ে নিহত হবে।

কাতিবে অহী : উসমান (রা) রাসূলে করীম ﷺ-এর সময়ে 'কাতিবে অহী' তথা অহী লিখক ছিলেন। সিদ্দীকী ও ফারুকী যুগে ছিলেন সুদক্ষ পরামর্শদাতা। প্রতিবছরই তিনি হজ্জ্ব পালন করতেন। তবে যে বছর তিনি শাহাদাতবরণ করেন, সে বছর ঘেরাও থাকার কারণে হজ্জ্ব আদায় করতে পারেননি। সারা বছরই রোযা

রাখতেন। সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন। এক রাক'আতে একবার সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করতেন। রাতে কারও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতেন না। রাতে চাকরদের খিদমত নিতেন না।

নম্রতা ও লজ্জাশীলতা : তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের। রাসূল করীম ﷺ বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে উসমান সর্বাধিক লজ্জাশীল। তিনি আরো বলেছেন : উসমানকে দেখে ফিরিশতারাও লজ্জা পায়। আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সদয়। তাঁর গুণাবলী ও মর্যাদা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় শেষ করা যাবে না।

সাক্ষাৎকার ও পরামর্শ এবং উসমান (রা)-এর জবাব

মুগীরা ইবনে শু'বা উসমান (রা)-এর সঙ্গে তাঁর গৃহবন্দী অবস্থায় সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, আপনি খলিফা হওয়া সত্ত্বেও আপনার প্রতি ভয়াবহ বিপদ! আপনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন, আপনার সমর্থক আছে। দ্বিতীয়ত: আপনি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, ওরা অন্যায়ের পক্ষপাতী। আর না হয় আপনি মক্কার হারামে আশ্রয় গ্রহণ করুন। অথবা সিরিয়া গমন করুন, সেখানে মুয়াবিয়া আপনাকে সাহায্য করবে। আমীরুল মু'মিনীন বললেন, আমি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে রক্তের বন্যা বহাতে পারব না। মক্কায় আশ্রয় গ্রহণও পছন্দ করছি না। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

يُلْحَدُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ يَكُوْنُ عَلَيْهِ نِصْفُ عَذَابِ الْعَالَمِ فَلَنْ اَكُوْنَ اَنَا .

একজন কুরাইশী ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং তার ওপর দুনিয়ার অর্ধেক শাস্তিও দেয়া হবে। সে জন্য আমি মক্কায় যেতে চাই না। আমি সিরিয়া এজন্য যাব না যে, সেখানে গেলে আমি হিজরতের স্থান এবং রাসূলুল্লাহর আত্মীয়-স্বজন হতে দূরে পড়ে যাব।

সুমামা ইবনে হযনুল কুশাইরী হতে বর্ণিত। আমীরুল মু'মিনীন 'উসমান (রা) গৃহবন্দী অবস্থায় একদিন ছাদের উপর উঠে বলেন, আমি তোমাদের খিদমতে উপস্থিত, তোমরা সেই দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট হাজির কর যারা আমার প্রতি

তোমাদেরকে চড়াও হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তাদেরকে হাজির করা হলো। তাদের চেহারা ছিল অদ্ভূত ঘোড়ার মতো। এবার তিনি তাদেরকে বললেন–

اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْاِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يَسْتَعْذِبُ غَيْرٌ بِئْرُوْمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَشْتَرِىْ بِئْرَرُوْمَةِ فَيَجْعَلُ دَلْوَهٗ مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ يُخَيِّرُ لَهٗ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِى فَاَنْتُمُ الْيَوْمَ تَمْنَعُوْنَ اَنْ اَشْرَبَ مِنْهَا حَتّٰى اَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ قَالُوْا اللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْاِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِاَهْلِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّشْتَرِىْ بقعه ال قلان فَيَزِ يْدُهَا فِى الْمَسْجِدِ يُخَيِّرُلَهٗ مِنْهَا فِى الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِىٍ وَاَنْتُمْ تَمْنَعُوْنَ فِى الْيَوْمِ اَنْ اُصَلِّىَ فِيْهَا رَكْعَتَيْنِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْاِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ مَالِىْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَالْاِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عَلٰى ثُبَيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهٗ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتّٰى تَسَاقَطَتْ حِجَارَتُهٗ بِالْحَضِيْضِ قَالَ فَرَكَزَهٗ فَقَالَ اسْكُنْ ثُبَيْرُ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِىٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ قَالُوْا اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ شَهِدُوْا لِىْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اَنِّىْ شَهِيْدٌ ثَلاَثًا .

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর এবং ইসলামের শপথ দিয়ে বলছি এ পবিত্র নগরীতে 'রুমার' কূপ ব্যতীত আর অন্য কোন সুস্বাদু পানি পানের কূপ ছিল না। একদা রাসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি এ কূপ খরিদ করে ওয়াকফ করে দিয়ে মুসলমানদের পানি পানের সুযোগ করে দিবে তার বিনিময় জান্নাত হতে চয়ন করে দেয়া হবে। রাসূলের এ প্রতিশ্রুতির ফলে আমি উক্ত কূপ খরিদ করি, কিন্তু আজ আমাকে সেই কূপের পানি পান করতে দেয়া হচ্ছে না। যার ফলে আমি লবণাক্ত পানি পান করছি। তারা বলল, আল্লাহর শপথ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি আবারও শপথ করে বললেন, তোমরা সবাই অবগত আছ যে, মুসল্লীদের জন্য মাসজিদ ছিল অত্যন্ত ছোট। একদা রাসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি এই জায়গা ক্রয় করে মাসজিদ বড় করবে তাকে জান্নাত হতে বেছে বেছে পুরস্কার দেয়া হবে। রাসূল ﷺ-এর পূর্ব কথা মতো আমি সেই জায়গা আমার মূল সম্পদ হতে ক্রয় করি, কিন্তু আজ আমাকে সেই মাসজিদে দু' রাক'আত সালাত পড়তে দেয়া হচ্ছে না। তারা এ কথার সত্যতা স্বীকার করল।

তিনি বলেন : তোমরা প্রত্যেকেই জান, তাবুক যুদ্ধে অস্ত্রের ব্যবস্থা করেছিলাম। তারা বলল হ্যাঁ, আপনিই করেছিলেন। তিনি পুনরায় শপথ করে বললেন, তোমরা জান রাসূল ﷺ মক্কায় সাবীর পাহাড়ে উঠেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলাম আমি, আবূ বকর (রা) ও উমার (রা)। পাহাড় আনন্দে আত্মহারা হয়ে নড়াচড়া আরম্ভ করে দিল। রাসূল ﷺ বললেন, পাহাড় থেমে যাও। কেননা তোমার ওপর নবী মুহাম্মদ ﷺ আবূ বকর এবং শহীদ ব্যক্তিদ্বয় দাঁড়িয়ে। বিদ্রোহীরা পূর্বের মতোই জবাব দিল ঠিক বলেছেন। এবার 'উসমান (রা) তাকবীর দিয়ে বললেন, তোমরা আমার জন্য সাক্ষ্য দিলে আল্লাহর শপথ আমি শহীদ হব। এ বাক্য তিনি তিনবার বললেন।

উসমান ইবনে আফফান (রা) হতে বর্ণিত হাদীস মুয়াত্তাতে ইমাম মালিক এ ৪৮, বুখারীতে ২৪, মুসলিমে ২৬, আবু দাউদে ১৯ এবং তিরমিজীতে ২৬টি রয়েছে।

৪. আলী ইবনে আবু তালিব (রা)

আলী (রা) নিজেকে একজন সাধারণ মুসলমানের সমতুল্য মনে করতেন এবং যে কোন ভুলের কৈফিয়তের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। একবার এক ইয়াহুদী তাঁর বর্ম চুরি করে। আলী (রা) বাজারে বর্মটি বিক্রি করতে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি ইচ্ছা করলে সেটা জোর করে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। আইন মোতাবিক ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে মামলা দায়ের করেন। কাজীও ছিলেন একজন কঠোর ন্যায়বিচারক। তিনি আলী (রা)-এর দাবির সমর্থনে প্রমাণ চাইলেন। আলী (রা) প্রমাণ দিতে অপারগ হলেন। কাজী ইয়াহূদীর পক্ষে মামলার রায় প্রদান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে দুনিয়াতেই জান্নাতী হওয়ার সুংবাদ দিয়েছেন, তাঁদেরকে আশারায়ে মুবাশ্‌শারা বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ ـ

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ জান্নাতী।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মনাকেব আবদুর রহমান ইবনে আওফ– ৩/২৯৪৬)

নামকরণ ও পরিচিতি : ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী ইবনে আবু তালিব (রা)। তাঁর নাম– আলী, উপাধী– আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতাজা, উপনাম– আবুল হাসান ও আবু তুরাব। পিতা– আবু তালিব আবদে মান্নাফ, মাতা– ফাতিমা। পিতা-মাতা উভয়ে কুরাইশ বংশের হাশিমী গোত্রের সন্তান। আলী (রা) রাসূলে করীম ﷺ-এর আপন চাচাতো ভাই।

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ : রাসূলে করীম ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম। আবু তালিব ছিলেন ছাপোষা মানুষ। চাচাকে একটু সাহায্য সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম ﷺ নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন আলীকে। এভাবে নবী পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তিনি বড় হয়ে ওঠেন। রাসূলে করীম ﷺ যখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, আলীর বয়স তখন নয় থেকে এগারো বছরের মধ্যে। একদিন ঘরের মধ্যে দেখলেন, নবী করীম ﷺ ও উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা) সিজদায় অবনত। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? উত্তর পেলেন, এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করছি। তোমাকেও এর দাওয়াত দিচ্ছি। আলী তাঁর মুরব্বির দাওয়াত বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান। কুফর, শিরক ও জাহিলিয়্যাতের কোন অশ্লীলতা ও অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে সর্বপ্রথম খাদীজাতুল কুবরা (রা) সালাত আদায় করেন। এ বিষয়ে কোন মতনৈক্য নেই। অবশ্য আবু বকর, আলী ও যায়িদ ইবনে হারিসা– এ তিন জনের কে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। (তাবাকাত : ৩/২১) আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস ও সালমান ফারেসীর (রা) বর্ণনা অনুযায়ী, উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা), আলী (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন। তবে এ বিষয়ে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করে যে, নারীদের মধ্যে খাদীজা, বয়স্ক আযাদ পুরুষদের মধ্যে আবু বকর, দাসদের মধ্যে যায়িদ ইবনে হারিসা ও কিশোরদের মধ্যে আলী (রা) সর্বপ্রথম মুসলমান।

রাসূলের নির্দেশ পালন : নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে রাসূলে করীম ﷺ আলীকে নির্দেশ দিলেন, কিছু সংখ্যক মানুষের আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। আবদুল মুত্তালিব খান্দানের সব মানুষ হাজির হল। খাবার পর্ব শেষ হলে নবী করীম ﷺ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : আমি এমন এক জিনিস নিয়ে আগমন করেছি, যা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য কল্যাণময়। আপনাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী

হবেন? সকলেই নীরব। হঠাৎ আলী (রা) বলে উঠলেন : 'যদিও আমি অল্পবয়স্ক, চোখের রোগে আক্রান্ত, দুর্বল দেহ, আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

শত্রুদের ষড়যন্ত্র বানচাল : হিজরাতের সময় হল। বেশিরভাগ মুসলমান মক্কা ছেড়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। রাসূলে কারীম ﷺ আল্লাহর আদেশের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। এ দিকে মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যে, নবী করীম ﷺ-কে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ﷺ এ সংবাদ অবহিত করলেন। তিনি মদীনায় হিজরতের অনুমতির প্রত্যাদেশ লাভ করেন। কাফিরদের সন্দেহ না হয়, এ জন্য আলীকে নবী করীম ﷺ নিজের বিছানায় ঘুমানোর নির্দেশ দেন এবং আবু বকরকে সাথে করে রাতের অন্ধকারে মদীনা বের হয়ে পড়েন।

আলী (রা) নবী করীম ﷺ-এর চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ঘুমালেন। তিনি জানতেন, এ অবস্থায় তার জীবন অবসান হতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রত্যয় ছিল, এভাবে জীবন গেলে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হবে না। সুবহে সাদিকের সময় মক্কার পাষণ্ডরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল, নবী করীম ﷺ-এর স্থলে তাঁরই এক ভক্ত জীবন কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হয়ে শুয়ে আছে। তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলা আলী (রা)-কে প্রাণে রক্ষা করেন।

এ হিজরত সম্পর্কে আলী ﷺ বলেন : নবী করীম ﷺ-এর মদীনা রওয়ানার পূর্বে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি মক্কায় থেকে যাব এবং লোকদের যেসব আমানত তাঁর কাছে রক্ষিত ছিল তা ফেরত দেব। এ জন্যই তো রাসূলে ﷺ-কে 'আল-আমীন' বলা হতো। আমি তিনদিন মক্কায় অবস্থান করলাম। তারপর রাসূলে করীম ﷺ-এর পথ ধরে মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে বনী 'আমর ইবনে আওফ যেখানে রাসূলে করীম ﷺ অবস্থান করছিলেন, আমি হাজির হলাম। কুলসুম ইবনে হিদমের বাড়িতে আমার আশ্রয় হল।' অন্য একটি বর্ণনায়, আলী (রা) রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি কুবায় উপস্থিত হন। রাসূলে করীম ﷺ তখনো কুবায় অবস্থান করেছিলেন। (তাবাকাত : ৩/২২)

দ্বীনিভাই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা : মাদানী জীবনের সূচনাতে রাসূলে করীম ﷺ যখন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে 'মুয়াখাত' বা দ্বীনী ভাই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করছিলেন,

তিনি নিজের একটি হাত আলীর (রা) গর্দানে রেখে বলেছিলেন, 'আলী তুমি আমার ভাই। তুমি হবে আমার এবং আমি হব তোমার উত্তরসূরী। (তাবাকাত : ৩/২২) পরে রাসূলে করীম ﷺ আলী ও সাহল ইবনে হুনাইফের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক হয়। (তাবাকাত : ৩/২৩)

বিবাহ : হিজরী দ্বিতীয় সনে আলী (রা) রাসূলে করীম ﷺ-এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রিয়তমা কন্যা খাতুনে জান্নাত ফাতিমার (রা) সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

হায়দার উপাধি : ইসলামের জন্য আলী (রা)-এর অবদান অবিস্মরণীয়। রাসূলে কারীম ﷺ-এর যুগের সকল যুদ্ধে সর্বাধিক সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। এ কারণে রাসূল ﷺ তাঁকে 'হায়দার' উপাধিসহ 'যুল-ফিকার' নামক একখানি তরবারি দান করেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : একমাত্র তাবুক অভিযান ছাড়া প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। বদরে তাঁর সাদা পশমী রুমালের জন্য তিনি ছিলেন বিশেষভাবে চিহ্নিত। কাতাদা থেকে বর্ণিত, বদরসহ প্রতিটি যুদ্ধে আলী ছিলেন রাসূলে করীম ﷺ-এর পতাকাবাহী। (তাবাকাত : ৩/২৩) উহুদে যখন অন্যসব মুজাহিদ পরাজিত হয়ে পলায়নরত ছিলেন, তখন যে ক'জন মুষ্টিমেয় সৈনিক রাসূলে করীম ﷺ-কে কেন্দ্র করে ব্যূহ রচনা করেছিলেন, তন্মধ্যে আলী (রা) ছিলেন অন্যতম। অবশ্য পলায়নকারীদের প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ঘোষণা করেন।

ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, খন্দকের দিনে 'আমর ইবনে আবদে উদ্দ বর্ম পরে বের হল। সে হুংকার ছেড়ে বলল : কে আমার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মুখোমুখী হবে? আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : হে আল্লাহর নবী! আমি প্রস্তুত। নবী করীম ﷺ বললেন : 'এ হচ্ছে 'তুমি আমার বস্।' 'আমর আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল : আমার সাথে যুদ্ধ করার মতো কেউ নেই? তোমাদের সে জান্নাত এখন কোথায়, যাতে তোমাদের নিহতরা প্রবেশ করবে বলে তোমাদের ধারনা?

তোমাদের কেউই এখন আমার সাথে যুদ্ধ করতে সাহসী নয়? আলী (রা) উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রস্তুত। রাসূলে করীম ﷺ বললেন : বস। তৃতীয় বারের মতো আহ্বান জানিয়ে 'আমর তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। আলী (রা) আবারো উঠে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রস্তুত। নবী করীম ﷺ বললেন : সে তা 'আমর। আলী (রা) বললেন : তা হোক। এবার আলী (রা) অনুমতি পেলেন।

আলী (রা) তাঁর একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আমরের দিকে অগ্রসর হল। 'আমর জিজ্ঞেস করল : তুমি কে? বললেন : আলী (রা)। সে বলল, আবদে মান্নাফের ছেলে? আলী বললেন, আমি আবু তালিবের ছেলে আলী। সে বলল, ভাতিজা, তোমার রক্ত ঝরানো সেটা আমার পছন্দ নয়। আলী বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি কিন্তু তোমার রক্ত ঝরা অপছন্দ করি না। এ কথা শুনে আমর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। নিচে নেমে এসে তরবারি টেনে বের করে ফেলল। আলী পাল্টা এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলে করীম ﷺ তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠেন। তারপর আলী নিজের একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে নবী করীম ﷺ-এর কাছে ফিরে আসেন।

(আল-বিদারা ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর ৪/১০৬)।

সপ্তম হিজরীতে খাইবার অভিযান চালানো হয়। সেখানে ইয়াহুদীদের কতিপয় শক্তিশালী কিল্লা ছিল। প্রথমে আবু বকর, পরে ওমর ফারুক কিল্লাগুলো ধ্বংস স্তূপে পরিণত করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু তারা কেউই সফলকাম হতে পারলেন না। নবী করীম ﷺ ঘোষণা করলেন : 'আগামীকাল আমি এমন এক বীরের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র। তাঁরই হাতে কিল্লাগুলোর ধ্বংস হবে।' পরদিন সকালে সাহাবীদের সকলেই আশা পোষণ করছিলেন এ গৌরবটি লাভ করার। হঠাৎ আলীর ডাক আসল। তাঁরই হাতে খাইবারের সে দুর্জয় কিল্লাগুলোর ধ্বংস স্তূপে পরিণত হলো।

নবীর প্রতিনিধি : তাবুক অভিযানে রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূলে করীম ﷺ আলীকে (রা) মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। আলী (রা) বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যাচ্ছেন, আর আমাকে নারী ও শিশুদের নিকট রেখে যাচ্ছেন? জবাবে রাসূলে করীম ﷺ বললেন : হারুন যেমন ছিলেন মূসার, তেমনি তুমি আমার প্রতিনিধি। তবে আমার পরে কোন নবী নেই। (তাবাকাত : ৩/২৪)

নবম হিজরীতে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে প্রথম ইসলামী হজ্জ্ব পালন হয়। এ আবু বকর (রা) ছিলেন 'আমীরুল হজ্জ্ব। তবে কাফিরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণার জন্য রাসূলে করীম ﷺ আলীকে (রা) বিশেষ দূত হিসেবে পাঠান।

ইয়ামেনে প্রেরণ : দশম হিজরীতে ইয়ামানে ইসলাম প্রচারের জন্য খালিদ সাইফুল্লাহকে প্রেরণ করা হয়। ছ'মাস চেষ্টার পরও তিনি সফলতা অর্জন করতে অপারগ হন। রাসূলে করীম ﷺ আলী (রা)-কে প্রেরণ করার কথা ঘোষণা

করলেন। আলী (রা) নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন : আপনি আমাকে এমন লোকদের কাছে প্রেরণ করছেন যেখানে নতুন নতুন ঘটনা সংঘটিত হবে অথচ বিচার ক্ষেত্রে আমার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন : আল্লাহ তোমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং তোমার অন্তরে অপরিশীম শক্তি দান করবেন। তিনি আলীর ﷺ মুখে হাত রাখলেন।

আলী বলেন : 'অতঃপর আমি কখনো কোন বিচারে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি।' যাওয়ার পূর্বে নবী করীম ﷺ নিজ হাতে আলী (রা)-এর মাথায় পাগড়ী পরিয়ে প্রার্থনা করেন। আলী ইয়ামানে পৌঁছে দাওয়াত দিতে শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে সকল ইয়ামানবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হামাদান গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে যায়। রাসূলে করীম ﷺ আলী (রা)-কে দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তিনি দোয়া করেন : আল্লাহ, আলীকে না দেখে যেন আমার মৃত্যু না হয়। আলী বিদায় হজ্জের সময় ইয়ামান থেকে হাজির হয়ে যান।

রাসূলে করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর নিকট-আত্মীয়রাই কাফন-দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। আলী (রা) গোসল দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন দরজার বাইরে অপেক্ষমান ছিলেন।

বাইআত গ্রহণ : আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর খিলাফত মেনে নিয়ে তাঁদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁদের যুগের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করেন। অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতেও উসমানকে পরামর্শ প্রদান করেছেন। যেভাবে আবু বকরকে 'সিদ্দীক', উমরকে 'ফারুক' এবং উসমানকে 'গণী' বলা হয়, তেমনিভাবে তাঁকেও 'আলী মুরতাজা' বলা হয়। আবু বকর ও উমারের যুগে তিনি মন্ত্রী ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। উসমানও সর্বদা তাঁর সাথে শলা পরামর্শ করতেন। (মরুজুজ জাহাব : ২/২)

দায়িত্ব পালন : বিদ্রোহীদের দ্বারা উসমান ঘেরাও হলে তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে আলী (রা) সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সে ঘেরাও অবস্থায় উসমান (রা)-এর বাড়ির নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন (রা)-এর নিয়োগ করেন। (আল-ফিতনাতুল কুবরা : ড. ত্বাহা হুসাইন)

খলিফা নির্বাচন : উমার (রা) ইন্তিকালের পূর্বে ছ'জন বিশিষ্ট সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের অসীয়াত করে যান। তার মধ্যে আলীও ছিলেন অন্যতম। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি আলী (রা)

সম্পর্কে মন্তব্য করেন : লোকেরা যদি আলীকে খলিফা নির্বাচন করে, তবে সে তাদেরকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে। (আল-ফিতনাতুল কুবরা) উমার তাঁর বাইতুল মাকদাস' ভ্রমণের সময় আলীকে (রা) মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

উসমানের (রা) শাহাদাতের পর বিদ্রোহীরা তালহা, যুবাইর ও আলী (রা)-কে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য জোড় আবেদন করে। প্রত্যেকেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। বিভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, আলী (রা) বার বার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। অবশেষে মদীনাবাসীরা আলী (রা)-এর কাছে গমন করে বলে যে, খিলাফতের এ পদ এভাবে শূন্য থাকতে পারে না। বর্তমানে এ পদের জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হন। তবে শর্ত পেশ করেন যে, আমার বাই'আত গোপনে হতে পারবে না। এর জন্য সর্বশ্রেণীর মুসলমানের সম্মতি প্রয়োজন। মসজিদে নববীতে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো। মাত্র ষোল অথবা সতেরো জন সাহাবা ব্যতীত সকল মুহাজির ও আনসার আলী (রা)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।

খিলাফতের দায়িত্ব পালন : অত্যন্ত কঠিন জটিল এক পরিস্থিতির মধ্যে আলী (রা)-এর খিলাফতের সূচনা উন্মোচিত হয়। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর প্রথম কাজ হলো উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রয়োগ করা। কিন্তু কাজটি ছিল অত্যন্ত দূরুহ। প্রথমত: হত্যাকারীদের দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের কাউকে চিনতে সক্ষম হননি। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর হত্যার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। কিন্তু উসমানের এক ক্রোধ-উক্তির মুখে তিনি পিছু হটেন। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরও কব্জায়। তারা আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে।

আলী ও আয়েশার বাহিনী মুখোমুখি : কিন্তু তাঁর এ অসহায় অবস্থা তৎকালীন অনেক মুসলমানই উপলব্ধি করেননি। তাঁরা আলী (রা)-এর নিকট তক্ষুণি উসমান (রা)-এর 'কিসাস' দাবি করেন। এ দাবি উত্থাপনকারীদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) সহ তালহা ও যুবাইর (রা)-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবীরাও ছিলেন। তাঁরা আয়েশা (রা) নেতৃত্বে সেনাবাহিনীসহ মক্কা থেকে বসরার দিকে রওয়ানা দেন। সেখানে তাঁদের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। আলী (রা) ও তাঁর বাহিনীসহ সেখানে উপস্থিত হন। বসরার উপকণ্ঠে বিরোধী দুই বাহিনী পরস্পরের

মুখোমুখি হয়। আয়েশার (রা) আলী (রা)-এর কাছে তাঁর দাবি উপস্থাপন করেন। আলী (রা) ও তাঁর সমস্যাসমূহ উপস্থাপন করেন। যেহেতু উভয় পক্ষেই ছিল সততা ও নিষ্ঠাবান তাই নিষ্পত্তি হয়ে যায় খুব সহজেই।

তালহা ও যুবাইর ফিরে চললেন। আয়েশাও ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু দাঙ্গা ও অশান্তি সৃষ্টিকারীরা উভয় বাহিনীতেই বিদ্যমান ছিল। তাই আপোষ মীমাংসায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে রাতের আঁধারে এক পক্ষ অন্য পক্ষের আস্তানায় হামলা চালায়। ফলশ্রুতিতে, উভয় পক্ষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হলো আপোষ মীমাংসার নামে প্রতারণা দিয়ে প্রতিপক্ষ তাঁদের ওপর হামলা করে বসেছে। পরিপূর্ণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আলী (রা)- বিজয় লাভ করেন। তিনি বিষয়টি আয়েশা (রা)-কে বুঝাতে সক্ষম হন। আয়েশা (রা) বসরা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

যুদ্ধ অবস্থায় আয়েশা উটের ওপর সাওয়ার ছিলেন। ইতিহাসে তাই এ যুদ্ধ 'উটের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। হিজরী ৩৬ সনের জামাদিউস-সানী মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আশারায়ে মুবাশশারার সদস্য তালহা ও যুবাইরসহ উভয় পক্ষে মোট তের হাজার মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। অবশ্য এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আলী (রা) পনেরো দিন বসরায় অবস্থানের পর কুফা চলে যান। রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হয়।

এ উটের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের প্রথম আত্মঘাতী সংঘর্ষ। অনেক সাহাবী এ যুদ্ধে কোন পক্ষেই অংশগ্রহণ করেননি। এ আত্মঘাতী সংঘর্ষের জন্য তাঁরা ব্যথিত হয়েছিলেন। আলী (রা)-এর বাহিনী মদীনা থেকে যাত্রা অভিযান শুরু করে, মদীনাবাসীরা তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

আয়েশা (রা)-এর সাথে তো একটা আপোষরফায় উপনীত হওয়া গেল। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মুআবিয়া (রা) এর সাথে কোন মীমাংসায় পৌঁছা সম্ভব হল না। আলী (রা) তাঁকে সিরিয়ার গভর্ণর পদ থেকে বহিষ্কৃত করেন। মুআবিয়া (রা) বেঁকে বসলেন। আলী (রা)-এর নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। তাঁর বক্তব্যের মূলকথা ছিল, 'উসমান (র) হত্যার কিসাস না হওয়া পর্যন্ত তিনি আলী (রা)-কে খলিফা হিসেবে মেনে নিবেন না।'

সিফফীনের যুদ্ধ : হিজরী ৩৭ সনের সফর মাসে 'সিফফীন' নামক স্থানে আলী ও মুআবিয়া (রা)-এর বাহিনীর মধ্যে এক তুমুল সংঘর্ষ বাধে। এ সংঘর্ষ ছিল উটের যুদ্ধ থেকেও আরো ভয়াবহ। উভয় পক্ষে মোট ৯০,০০০ (নব্বই হাজার) মুসলমান শহীদ হন। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট সাহাবী 'আম্মার ইবনে ইয়াসীর, খুযাইমা ইবনে সাবিত ও আবু আম্মারা আল-মাযিনীও ছিলেন।

তাঁরা সকলেই আলী (রা)-এর পক্ষে মুআবিয়া (রা)-এর বাহিনীর হাতে শাহাদতবরণ করেন। উল্লেখ্য যে, আম্মার ইবনে ইয়াসির সম্পর্কে নবী করীম (রা) বলেছিলেন : 'আফসুস! একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে শহীদ করবে।' (সহীহুল বুখারী) সাতাশ জন বিশিষ্ট সাহাবী আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুআবিয়াও হাদীসটির একজন রাবী। অবশ্য মুআবিয়া (রা) হাদীসটির ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এতো কিছুর পরেও বিষয়টির মীমাংসা হলো না।

যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা : সিফফীনের সর্বশেষ সংঘর্ষে, যাকে 'লাইলাতুল হার' বলা হয়, আলী (রা)-এর বিজয় লাভ করছিল। মুআবিয়া (রা) পরাজয়ের ভাব অনুভব করতে পেরে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মীমাংসার আহ্বান জানালেন। তাঁর সৈন্যরা বর্শার মাথায় কুরআন ঝুলিয়ে উঁচু করে ধরে বলতে থাকে, এ কুরআন আমাদের এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দিবে। যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলো। আলী (রা)-এর পক্ষে আবু মূসা আশ'আরী (রা) এবং মুআবিয়ার (রা) পক্ষে 'আমর ইবনুল আস হাকাম বা সালিশ নিযুক্ত হলেন। সিদ্ধান্ত হলো, এ দুজনের সম্মিলিত মীমাংসা বিরোধী দু'পক্ষই মেনে নিবে। দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে মুসলমানদের বৃহৎ আকারের এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু সব ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে যে সিদ্ধান্তটি পরিলক্ষিত হলো, আমর ইবনুল আস (রা) আবু মূসা আশ'আরীর (রা) সাথে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, শেষ মূহূর্তে তা থেকে সরে আসায় এ সালিশী রোর্ড শান্তি স্থাপনে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দুমাতুল জান্দাল থেকে হতাশ হয়ে মুসলমানরা ফিরে এলেন। অতঃপর আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা) অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করার মানসে সন্ধি স্থাপন করলেন। এ দিন থেকে মূলত মুসলিম খিলাফত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

খারেজী দলের উন্মেষ : এ সময় 'খারেজী' নামে নতুন একটি দলের উন্মেষ ঘটে। প্রথমে তারা ছিল আলী (রা)-এর সমর্থক। কিন্তু পরে তারা এ বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে যে, ধর্মের বিষয়ে কোন মানুষকে 'হাকাম' বা সালিশ নিযুক্ত করা একটি কুফরী কাজ। আলী (রা) আবু মূসা আশ'আরী (রা)-কে 'হাকাম' মেনে নিয়ে কুরআন বিরোধী কাজ করেছেন। কাজেই আলী তাঁর আনুগত্য দাবি করার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছেন। তারা আলী থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা ছিল চরমপন্থী। তাদের সাথে আলী (রা)-এর একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে প্রচুর লোক হতাহত হয়।

এ খারেজী সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি আবদুর রহমান মুলজিম, আল-বারাক ইবনে আবদুল্লাহ ও 'আমর ইবনে বকর আত-তামীমী, নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর এক গোপন বৈঠকে একত্রিত হয়। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুসলিম উম্মার অন্তর্কলহের জন্য দায়ী মূলত: আলী, মুআবিয়া ও 'আমর ইবনুল আস (রা)। কাজেই এ তিন ব্যক্তিকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইবন মুলজিম দায়িত্ব নিল আলীর (রা) এবং আল-বারাক ও আমর দায়িত্ব নিল যথাক্রমে মুআবিয়া ও আমর ইবনুল আসের (রা)। তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, মারবে নয় তো মরবে।

শাহাদত বরণ : হিজরী ৪০ সনের ১৭ রমজান ফজরের সালাতের সময়টি এ কাজের জন্য তারা নির্ধারিত করে। অতঃপর ইবনে মুলজিম কুফা, আল-বারাক দিমাশক ও আমর মিসরে ফিরে যায়। হিজরী ৪০ সনের ১৬ রমজান শুক্রবার দিবাগত রাতে আততায়ীরা নিজ নিজ স্থানে ওঁৎ পেতে থাকে। ফজরের সময় আলী (রা) অভ্যাসমত আস-সালাত বলে মানুষকে সালাতের জন্য আহ্বান করতে করতে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। পাপিষ্ঠ ইবনে মুলজিম শাণিত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে আহত করে। আহত অবস্থায় আততায়ীকে ধরার আদেশ দিলেন। সন্তানদের ডেকে অসীয়াত করলেন। চার বছর নয় মাস খিলাফতের দায়িত্ব পর ১৭ রমযান ৪০ হিজরী শনিবার কুফায় শাহাদাত বরণ করেন।

একই দিন একই সময় মুআবিয়া যখন মসজিদে গমন করছিলেন, তাঁর ওপরও হামলা হয়। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। সামান্য আহত হন। অন্যদিকে 'আমর ইবনুল আস রোগের কারণে সেদিন মসজিদে যেতে পারেননি। তার পরিবর্তে পুলিশ বাহিনী প্রধান খারেজ ইবনে হুজাফা ইমামতির দায়িত্ব পালনের

জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। তাঁকেই 'আমর ইবনুল আস মনে করে হত্যা করা হয়। এভাবে মুআবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রা) প্রাণে বেঁচে যান।

(তারীখুল উম্মাহ্ আল-ইসলামিয়্যা : খিদরী বেক)

সমাহিত : আলী (রা)-এর সালাতে জানাযার ইমামতি করেন হাসান ইবনে আলী (রা)। কুফা জামে মসজিদের পাশে তাকে দাফন করা হয়। তবে অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী নাজফে আশরাফে তাঁকে দাফন করা হয়। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

ন্যায়পরায়ণ : আততায়ী ইবন মুলজিমকে গ্রেফতার করা হলে আলী (রা) নির্দেশ দেন : 'সে কয়েদী। তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা কর। আমি প্রাণে রক্ষা পেলে তাঁকে হত্যা অথবা মাফ করতে পারি। যদি আমি মৃত্যুবরণ করি, তোমরা তাকে ঠিক ততটুকু আঘাত করবে যতটুকু সে আমাকে করেছে। তোমরা অতিরঞ্জিত করো না। যারা অতিরঞ্জিত করে আল্লাহ্ তাদের পছন্দ করেন না।'

(তাবাকাত : ৩/৩৫)

আলী (রা) পাঁচ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। একমাত্র সিরিয়া ও মিসর ছাড়া মক্কা ও মদীনাসহ্ সব এলাকা তাঁর শাসন অধীনে ছিল। তাঁর সময়টি যেহেতু গৃহযুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে, এ কারণে নতুন কোন অঞ্চল বিজয় লাভ করতে পারেননি।

আলী (রা) তাঁর পরে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। জনগণ যখন তাঁর পুত্র হাসান (রা)-কে খলিফা নির্বাচিত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, এ বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ অথবা নিষেধ কোনটাই করবো না। অন্য এক ব্যক্তি যখন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আপনার প্রতিনিধি নির্বাচিত করে যান না কেন? বললেন : আমি মুসলিম উম্মাহ্কে এমনভাবে ছেড়ে যেতে চাই যেমন গিয়েছিলেন রাসূলে করীম ﷺ।

খিলাফত পরিচালনা : আলী (রা)-এর ইন্তিকালের পর দারুল খিলাফা' রাজধানী কুফার জনগণ হাসান (রা)-কে খলিফা নির্বাচিত করে। তিনি মুসলিম উম্মার অন্তঃকলহ ও রক্তপাত পছন্দ করলেন না। এ কারণে, মুআবিয়া (রা) ইরাক আক্রমণ করলে তিনি যুদ্ধের পরিবর্তে মুআবিয়া (রা)-এর হাতে খিলাফতের ক্ষমতা অর্পণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এভাবে হাসান (রা)-এর নজীরবিহীন আত্মত্যাগ মুসলিম জাতিকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করে।

খিলাফত থেকে তাঁর পদত্যাগের বছরকে ইসলামের ইতিহাসে 'আমুল জামায়াহ'– ঐক্য ও সংহতির বছর নামে নামকরণ করা হয়। পদত্যাগের পর হাসান কুফা ছেড়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং নয় বছর পর হিজরী পঞ্চাশ সনে মদীনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাত্র ছয়টি মাস তিনি খিলাফত পরিচালনার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

ওমর (রা) আলী (রা)-এর সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফায়সালাকারী একমাত্র আলী।' এমন কি রাসূলে করীম ﷺ ও বলেছিলেন, আকদাহুম আলী তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক আলী। তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত সামনে রেখে ওমর (রা) একাধিকবার বলেছেন : لَوْلاَ عَلِىٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ আলী না হলে 'ওমর ধ্বংস হয়ে যেত।'

ন্যায় বিচারক : আলী (রা) নিজেকে একজন সাধারণ মুসলমানের সমতুল্য মনে করতেন এবং যে কোন ভুলের কৈফিয়তের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। একবার এক ইয়াহুদী তাঁর বর্ম চুরি করে। আলী (রা) বাজারে বর্মটি বিক্রি করতে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি ইচ্ছা করলে সেটা জোর করে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। আইন মোতাবিক ইয়াহুদীর বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে মামলা দায়ের করেন। কাজীও ছিলেন একজন কঠোর ন্যায়বিচারক। তিনি আলী (রা)-এর দাবির সমর্থনে প্রমাণ চাইলেন। আলী (রা) প্রমাণ দিতে অপারগ হলেন।

কাজী ইয়াহূদীর পক্ষে মামলার রায় প্রদান করেন। এ মীমাংসার প্রভাব ইয়াহুদীর ওপর এতখানি পড়েছিল যে, সে মুসলমান হয়ে যায়। সে মন্তব্য করেছিল, 'এতো নবীদের মতো ইনসাফ। আলী (রা) আমীরুল মু'মিনীন হয়ে আমাকে কাজীর সামনে হাজির করেছেন এবং তাঁরই নিযুক্ত কাজী তাঁর বিরুদ্ধে রায় করলেন।' তিনি ফাতিমা (রা)-এর সাথে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলে করীম ﷺ-এর পরিবারের সাথেই থাকতেন। বিবাহের পর আলাদা বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। জীবিকার দরকার হল। কিন্তু পুঁজি ও উপকরণ কোথায়? পরিশ্রম করে খেটে এবং গণীমতের হিসসা থেকে কোন রকম জীবিকা নির্বাহ করতেন। ওমর (রা)-এর যুগে বেতন প্রথা চালু হলে তাঁর বেতন নির্ধারিত হয় বছরে পাঁচ হাজার দিরহাম। হাসান (রা) বলেন, ইন্তিকালের সময় একটি গোলাম ক্রয় করার জন্য জমা করা মাত্র সাত শ' দিরহাম রেখে যান। (তাবাকাত : ৩/৩৯)

দরিদ্রতার সাথে সংগ্রাম : জীবিকার অভাব অনটন আলী (রা)-এর ভাগ্য থেকে কোন দিন দূর হয়নি। একবার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, রাসূলে করীম ﷺ-এর সময়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধে রয়েছি। (হায়াতুস সাহাবা : ৩/৩১২)

খলিফা হওয়ার পরেও ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সাথে তাকে আজীবন সংগ্রাম করতে হয়েছে। তবে তাঁর ফল ছিল খুবই প্রশস্ত। কোন অভাবীকে তিনি বিমুখ করতেন না। এজন্য তাঁকে অনেক সময় সপরিবারে ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে। তিনি ছিলেন দারুণ নম্রও বিনয়ী। নিজের হাতেই ঘর-গৃহস্থালীর সব কাজ সমাধা করতেন। সর্বদা মোটা বস্ত্র পরিধান করতেন; তাও ছেঁড়া ও তালি লাগানো। তিনি ছিলেন জ্ঞানের দরজা। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর কাছে এসে দেখতে পেত তিনি উটের রাখালীর দায়িত্ব পালন করছেন, মাটি কেটে জমি তৈরি করছেন।

অনাড়ম্বর জীবন যাপন : তিনি এতই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন যে, সময় সময় শুধু মাটির ওপর শয়ন করতেন। একবার তাঁকে রাসূলে করীম ﷺ এ অবস্থায় দেখে সম্বোধন করেছিলেন, يَا أَبَا تُرَابٍ ওহে মাটির পিতা। তাই তিনি 'আবু তুরাব' উপাধিটি পেয়েছিলেন। খলিফা হওয়ার পরও তাঁর এ সরল জীবন অব্যাহত থাকে। 'উমার (রা)-এর মত সবসময় একটি লাঠি হাতে নিয়ে চলতেন, লোকদের উপদেশ দান করতেন। (আল-ফিতনাতুল কুবরা)

নবী খান্দানের সদস্য : আলী (রা) ছিলেন নবী খান্দানের সদস্য, যিনি নবী ﷺ-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা অর্জন করেন। রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন : أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী সে নগরীর দরজা। (তিরমিযী) তিনি ছিলেন কুরআনের হাফিজ এবং একজন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির। কতিপয় হাদীসও সংগ্রহ করেছিলেন। তবে হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকতেন। কেউ তাঁর নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করলে, বর্ণনাকারীর নিকট থেকে শপথ আদায় করে নিতেন। (তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১/১০)

হাদীস বর্ণনা : তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে বহু বিখ্যাত সাহাবী এবং তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী খলিফাদের যুগে মুহাজিরদের তিনজন ও আনসারদের তিনজন ফতওয়া দিতেন। যথা : 'উমার, উসমান, আলী, উবাই ইবনে কা'ব, মুআজ

ইবনে জাবাল ও যায়েদ ইবনে সাবিত। মাসরূক থেকে অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসূলে করীম-এর সাহাবীদের মধ্যে ফতওয়া দিতেন : আলী, ইবনে মাসউদ, যায়েদ, উবাই ইবনে কা'ব, আবু মূসা আল-আশ'আরী।

(তাবাকাত : ৪/১৬৭, ১৭৫)

মর্যাদা সম্পন্ন কবি : আলী (রা) ছিলেন একজন সুবক্তা ও মর্যাদা সম্পন্ন কবি। (কিতাবুল উমদা : ইবন রশীক : ১/২১ তাঁর কবিতার একটি 'দিওয়ান' আমরা পেয়ে থাকি। তাতে কিছু সংখ্যক কবিতায় মোট ১৪০০ শ্লোক রয়েছে। গবেষকদের ধারণা, তাঁর নামে প্রচলিত বেশকিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তবে তিনি যে তৎকালীন আরবি কাব্য জগতের একজন বিশিষ্ট দিকপাল, তাতে পণ্ডিতদের কোন সন্দেহ নেই। 'নাহজুল বালাগা' নামে তাঁর আলোচনার একটি সংকলন রয়েছে যা তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।

(তারীখুল আদাব আল-আরাবী : ড. ওমর ফারুক, ১/৩০৯)

বিবাহ : খাতুনে জান্নাত নবী কন্যা ফাতিমা (রা)-এর সাথে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়। যতদিন পর্যন্ত ফাতিমা জীবিত ছিলেন, দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। ফাতিমার ইন্তিকালের পর একাধিক বিবাহ করেছেন। তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী, তার চৌদ্দটি ছেলে ও সতেরটি মেয়ে জন্মলাভ করেন। ফাতিমার গর্ভে তিন পুত্র হাসান, হুসাইন, মুহসিন এবং দু'কন্যা যয়নাব ও উম্মু কুলসুম জন্ম লাভ করেন। শৈশবেই মুহসীন মৃত্যুবরণ করেন। ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে, মাত্র পাঁচ ছেলে হাসান, হুসাইন, মুহাম্মদ (ইবনুল হানাফিয়্যা), আব্বাস এবং ওমর থেকে তাঁর বংশক্রম ধারা চলছে।

মর্যাদা : ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী (রা)-এর মর্যাদা ও ফযীলাত সম্পর্কে রাসূলে করীম-এর থেকে যত কথা বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন সাহাবী সম্পর্কে তা হয়নি। (আল-ইসাবা : ২/৫০৮)

ইতিহাসে তাঁর যত গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার কিয়দংশও তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। রাসূলে করীম অসংখ্যবার তাঁর জন্য ও তাঁর সন্তানদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। রাসূলে করীম বলেছেন : একমাত্র মু'মিনগণ ছাড়া তোমাকে কেউ ভালোবাসবে না এবং একমাত্র মুনাফিকরা ব্যতীত কেউ তোমাকে হিংসা করবে না।

চমৎকার গুণাবলী : আলীর এক সাথী দুরার ইবনে দামরা আল কিনানী একদিন মুয়াবিয়ার কাছে আগমন করল। মুআবিয়া তাঁকে আলী (রা)-এর গুণাবলী বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। প্রথমে তিনি তা অস্বীকার করেন। কিন্তু মুআবিয়ার পিড়াপিড়িতে দীর্ঘ এক বর্ণনা দান করেন। তাতে আলী (রা)-এর গুণাবলী চমৎকারভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিকগণ বলছেন এ বর্ণনা শুনে মুআবিয়াসহ তার সাথে বৈঠকে উপবিষ্ট সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। অতঃপর মুআবিয়া মন্তব্য করেন : 'আল্লাহর কসম, আবুল হাসান (হাসানের পিতা) এমনই ছিলেন।' (আল-ইসতিয়াব : ৩/৪৪)

আলী ইবনে আবু তালিব সংশ্লিষ্ট হাদীসের সংখ্যা ১৫৯টি হাদীসের কিতাবে ৬২৪৮ বার তন্মধ্যে মুয়াত্তাতে ৩০, বুখারীতে ৩৫, মুসলিমে ৪৯।

৫. তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রা)

যদি কেউ মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়, সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখে। এ কারণে তাঁকে জীবিত শহীদ বলে অভিহিত করা হতো। সিদ্দীক আকবর (রা) উহুদ যুদ্ধের প্রসংগ উঠলেই বলতেন : 'সে দিনটির সবটুকুই ছিল তালহার।' এ যুদ্ধে তালহার কাজে আল্লাহর নবী ﷺ এত প্রীত হন যে তিনি তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুসংবাদ দান করেন।

তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রা)-কে নবী কারীম ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنِ الزُّبَيْرِ (رضـ) قَالَ كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ دِرْعَانِ نَهَضَ اِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَاَقْعَدَ تَحْتَهُ طَلْحَةَ فَصَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اسْتَوٰى عَلَى الصَّخْرَةِ قَالَ فَسَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَوْجَبَ طَلْحَةُ ـ

যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই জোড়া পোশাক পরিধান করেছিলেন। তিনি একটি পাথরের উপর আরোহণ করতে ছিলেন কিন্তু তিনি তাতে চড়তে পারছিলেন না। তখন তিনি তালহা (রা)-কে তাঁর নিচে বসালেন এবং তার ওপর আরোহণ করে তিনি তাতে চড়লেন। যুবায়ের বলেন এ সময় আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব আবু মুহাম্মদ তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ– ৩/২৯৩৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে আশারা মুবাশ্‌শারা বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ ـ

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ জান্নাতী।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবদুর রহমান ইবনে আওফ– ৩/২৯৪৬)

নামকরণ ও পরিচিতি : তাঁর নাম আবু মুহাম্মাদ তালহা। পিতা উবাইদুল্লাহ এবং মাতা সা'বা। কুরাইশ গোত্রের তাইম শাখার সন্তান। আবু বকর (রা)ও ছিলেন এ তাইম কবীলার লোক। তাঁর মা সা'বা ছিলেন প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী 'আলা ইবনুল হাদরামীর বোন।

ইসলাম গ্রহণ : তালহা ইসলামের সূচনাতেই মাত্র পনেরো বছর বয়সে ইসলাম কবুল করেছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর দাওয়াতেই তিনি ইসলাম কবুল করেন। আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে আবু বকরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের তিনি ছিলেন নিয়মিত সদস্য।

ইসলাম গ্রহণের ঘটনা : তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি অতি আশ্চর্যজনক। তিনি কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলার সাথে সিরিয়া গমন করেন। তাঁরা যখন বসরা শহরে পৌছলেন, দলের অন্য কুরাইশ ব্যবসায়ীরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাজারের বিভিন্ন স্থানে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি বাজারের মধ্যে ঘুরাফেরা করছেন, এমন সময় যে ঘটনাটি ঘটলো তা তালহার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তিনি বলেন : 'আমি তখন বসরার বাজারে অবস্থান করছিলাম। একজন খ্রিস্টান পাদ্রীকে ঘোষণা করতে শুনলাম : ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়!

আপনারা এ বাজারে আগন্তুকদের জিজ্ঞেস করুন, তাদের মধ্যে মক্কাবাসী কোন মানুষ রয়েছে কিনা। আমি নিকটেই ছিলাম। দ্রুত তার নিকট গমন করে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি মক্কার লোক।' জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে আহমদ কি আত্মপ্রকাশ করেছেন?' বললাম, 'কোন আহমদ?' বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। যে মাসে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, এটা সেই মাস।

তিনি হবেন আখেরী নবী। মক্কায় আত্মপ্রকাশ করে কালো পাথর ও খেজুর বাগান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। যুবক, খুব দ্রুত তোমার তাঁর কাছে যাওয়া আবশ্যক।' তালহা বলেন, 'তাঁর এক কথা আমার অন্তরে ভীষণ প্রভাব সৃষ্টি করল। আমি আমার কাফিলা ফেলে রেখে বাহনে রওয়ানা হলাম। বাড়িতে পৌঁছেই পরিবারের লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম : আমরা যাওয়ার পর মক্কায় নতুন কিছু সংঘটিত হয়েছে কি? তারা বলল : হ্যাঁ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নিজেকে নবী বলে দাবি করেছে এবং আবু কুহাফার সন্তান আবু বকর তাঁর অনুসারী হয়েছে।'

তালহা বলেন, আমি আবু বকরের নিকট গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : এ কথাটি সত্যি যে, মুহাম্মদ নবুওয়াতের দাবি করেছেন এবং আপনি তাঁর অনুসারী হয়েছেন? বললেন : হ্যাঁ, তারপর তিনি আমাকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি তখন খ্রিস্টান পাদরীর ঘটনা তাঁর কাছে খুলে বললাম। অতঃপর তিনি আমাকে সাথে করে রাসূল করীম ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং নবী করীম ﷺ-এর কাছে পাদরীর কথা সবিস্তারে ব্যক্ত করলাম। শুনে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। এভাবে আমি হলাম আবু বকরের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্থ ব্যক্তি।

তালহার ইসলাম গ্রহণে তাঁর মা অধিক হৈ চৈ শুরু করলেন। কারণ, তাঁর ইচ্ছা ছিল, ছেলে হবে গোত্রের নেতা। গোত্রীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে দেখল তিনি পাহাড়ের ন্যায় অটল। সোজা কথায় কাজ হবে না ভেবে তারা নির্যাতনের পথ বেছে নিল।

মাসুদ ইবনে খারাশ বলেন : 'একদিন আমি সাফা-মারওয়ার মাঝখানে দৌড়াচ্ছিলাম। এমন সময় দেখলাম, একদল লোক হাত বাঁধা একটি যুবককে ধরে টেনে নিয়ে আসছে। তারপর তাকে উপুড় করে শুইয়ে তার পিঠে ও মাথায় বেদমভাবে প্রহার করতে লাগল। তাদের পেছনে একজন বৃদ্ধ নারী চিৎকার করে

গলা ফাটিয়ে তাকে গালাগালি করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম : ছেলেটির এ পরিণতি কেন? তারা বল : এ হচ্ছে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্। পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করে বনী হাশিমের সে লোকটির অনুসারী হয়েছে। এ নারী কে? তারা বল : সাবা বিনতে আল হাদরামী– যুবকটির মা।'

কুরাইশদের সিংহ বলে পরিচিত নাওফিল ইবনে খুয়াইলিদ তালহার কাছে এলো তাঁকে একটি রশি দিয়ে বাঁধল এবং একই রশি দিয়ে বাঁধল আবু বকরকেও। তারপর তাদের দু'জনকে মক্কার গোঁয়ার ব্যক্তিবর্গের হাতে নির্যাতন চালানোর জন্য তুলে দিল। তাঁদের দু'জনকে একই রশিতে বাঁধা হয়েছে, তাই তাঁদেরকে বলা হয় 'কারীনান'।

ইসলাম গ্রহণের পর এভাবে তিনি আপনজন ও কুরাইশদের জুলম অত্যাচারের নির্মম শিকার হন। দীর্ঘ তোরো বছর অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সবকিছু মোকাবিলা করেন এবং একনিষ্ঠভাবে দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যান। তিনি মক্কার আশে পাশের উপত্যকায় বিদেশী অভ্যাগতদের অনুসন্ধান করতেন, বেদুঈনদের তাঁবু এবং শহরের পরিচিত অংশীবাদীদের ঘরে নীরবে উপস্থিত হয়ে তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতেন। মক্কার 'দারুল আরকামে' অন্যদের মতো তিনিও নিয়মিত পদার্পণ করতেন। ইসলাম ও মুসলমানদের এ দুঃসময়ে আল্লাহর দ্বীনের জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা ও সাধনা করেছেন।

মদীনায় হিজরত : ৬২২ সনের অক্টোবর মাসে আবু বকরকে সাথে করে রাসূলে করীম ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁদের এ দুর্গম সফরের পথ প্রদর্শক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কাত। তিনি তাঁদেরকে মদীনায় পৌঁছে দিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এবং আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহর কাছে তাঁদের সফরের কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করেন। আবু বকরের পরিবার-পরিজন মদীনায় হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় তালহা ও সুহায়েব ইবনে সিনান তাঁদের সাথে অংশ গ্রহণ করেন। তালহা হলেন সেই কাফিলার আমীর। মদীনায় উপস্থিত হয়ে তালহা ও সুহায়েব আসয়াদ ইবনে যারারার বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন। ইবনে হাজার বলেন : হিযরতের পূর্বে মক্কায় তালহা ও যুবাইরের মধ্যে রাসূল করীম ﷺ ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনার প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী আবু আইউব আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলে করীম ﷺ কা'ব ইবনে মালিকের সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন এবং আপন ভায়ের মতো আমরণ তাঁদের এ সম্পর্ক অটুট ছিল।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

বদর যুদ্ধে : বদর যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে করেছিলেন এ কারণে রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে গনীমতের প্রাপ্য অংশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় একদল কাফির মদীনার মুসলিম জনপদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিল। নবী করীম ﷺ তাদের সংবাদাদী নেয়ার জন্য তালহাকে পাঠালেন। তালহা ব্যতীতও সাত ব্যক্তিকে নবী করীম ﷺ বিভিন্ন স্থানে পাঠালেন। এ কারণে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে তাঁদেরকে বদরী হিসেবে গণ্য করা হয়।

উহুদ যুদ্ধে : হিজরী তৃতীয় সনে মক্কার মুশরিকদের সাথে সংঘটিত হয় উহুদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তালহা অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন উহুদ যুদ্ধের স্বার্থক সমরনায়ক। তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে মুসলিম বাহিনী যখন দারুণ বিপর্যয়ের মুখে, তখন যে কিছু সংখ্যক মুষ্টিমেয় সৈনিক আল্লাহর রাসূলকে ঘিরে প্রতিরোধ ব্যূহ সৃষ্টি করেন, তালহা তাদের মধ্যে অন্যতম। এ সময় আম্মার ইবনে ইয়াযিদ শহীদ হন। কাতাদা ইবনে নু'মানের চোখে কাফিরের নিক্ষিপ্ত তীর লাগলে চক্ষু কোটর থেকে মণিটি বের হয়ে তাঁর গলায় ঝুলতে থাকে। 'আবু দুজানা নবী করীম ﷺ-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তাঁর গোটা শরীরটি ঢাল বানিয়ে নেন। এ সময় সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তীর নিক্ষেপ করছিলেন। আর তালহা এক হাতে তলোয়ার ও অন্যহাতে বর্শা নিয়ে কাফিরদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করছেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে আনসারদের বারোজন এবং মুহাজিরদের একজন তালহা ব্যতীত আর সকলে নবী করীম ﷺ-এর কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নবী করীম ﷺ পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন, এমন সময় একদল শত্রু সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলল। নবী করীম ﷺ তাঁর সাথের লোকদের বললেন : 'যে এদের হটিয়ে দিতে পারবে, জান্নাতে সে হবে আমার সাথী।' তালহা বললেন : আমি যাব হে আল্লাহর রাসূল! নবী করীম ﷺ বললেন : না, তুমি থাক। একজন আনসারী বলল : আমি যাব। বললেন : হ্যাঁ, যাও। আনসারী গেলেন এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। এভাবে বার বার নবী করীম ﷺ আহ্বান জানালেন এবং প্রত্যেক বারই তালহা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কিন্তু নবী

করীম ﷺ তাঁকে নিবৃত্ত করে একজন আনসারীকে পাঠালেন। এভাবে এক এক করে যখন আনসারীদের সকলে শাহাদাৎ বরণ করলেন, তখন নবী করীম ﷺ তালহাকে বললেন : এবার তোমার পালা, যাও।

তালহা আক্রমণ চালালেন। রাসূলে করীম ﷺ আহত হলেন, তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হলো এবং তিনি রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় তালহা একাকী একবার মুশরিকদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে একটু দূরে তাড়িয়ে দেন, আবার নবী করীম ﷺ-এর দিকে ছুটে এসে তাকে কাঁধে করে পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতে থাকেন এবং এক স্থানে রাসূলে করীম ﷺ-কে রেখে আবার নতুন করে আক্রমণ চালান। এভাবে সেদিন তিনি মুশরিকদের মুকাবিলা করেন। আবু বকর বলেন : এ সময় আমি ও আবু উবাইদা রাসূলে করীম ﷺ থেকে দূরে সরে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সেবার জন্য এগিয়ে গেলে তিনি বললেন : 'আমাকে ছাড়, তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো'।

আমরা তাকিয়ে দেখি, তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় একটি গর্তে অজ্ঞান হয়ে আছেন। তাঁর একটি হাত দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং গোটা দেহে তরবারী ও তীর বর্শার সত্তরটির বেশি আঘাত রয়েছে। তাই পরবর্তীকালে রাসূলে করীম ﷺ তাঁর বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন : যদি কেউ মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়, সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখ। এ কারণে তাঁকে জীবিত শহীদ বলে অভিহিত করা হতো। সিদ্দীকে আকবর (রা) উহুদ যুদ্ধের প্রসংগ উঠলেই বলতেন : 'সে দিনটির সবটুকুই ছিল তালহার।' এ যুদ্ধে তালহার কাজে আল্লাহর নবী ﷺ এত প্রীত হন যে তিনি তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুসংবাদ দান করেন।

খন্দক যুদ্ধে : পঞ্চম হিজরী সনের যিলকাদ মাসে আরবের বিভিন্ন গোত্র ও ইহুদীদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করে। এদিকে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য রাসূলে করীম ﷺ-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে সালা পর্বতের পাশ দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে পাঁচ হাত গভীর খন্দক খননের সিদ্ধান্ত নেন। এ খন্দক খননের কাজে তালহাকেও অতি ব্যস্ত দেখা যায়। খন্দক খননের কাজ শেষ হতে না হতেই মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অবরোধ করে। এদিকে মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদী

সম্প্রদায়গুলো, বিশেষত : বনু কুরাইজা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ সময় মুসলমানরা ভিতর ও বাইরের শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। এমন এক ভাঙ্গুর পরিস্থিতিতে কিছু সংখ্যক মুসলমান স্ত্রী-পুত্র পরিজনের নিরাপত্তার চিন্তায় স্বাভাবিকভাবেই একটু অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের মনোবল এবং আল্লাহর প্রতি তাঁদের ঈমান মজবুত থাকে। তাঁরা নিজেদের জান-মাল সবকিছু আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। তালহা ছিলেন শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকুতে মুসলমানদের এ সময়কার মানসিক চিত্র সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

খন্দকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে কিছু সংখ্যক মুসলমান আলাপ-আলোচনা করছে। তালহা যাচ্ছেন পাশ দিয়ে। তাঁর কানে ভেসে এলো, একজন বলছে : আমাদের স্ত্রী পরিজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। তালহা একটু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন : اَللّٰهُ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ আল্লাহ্ সর্বোত্তম নিরাপত্তা বিধানকারী। যারা নিজেদের শক্তি ও বাহুবলের ওপর নির্ভর করেছে, ব্যর্থ হয়েছে। মানুষেরা বলল : আপনি সঠিকই বলেছেন। তারা তাদের উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকল।

বিভিন্ন যুদ্ধ : বাইআতে রিদওয়ান, খাইবার ও মূতাসহ সব অভিযানেই তিনি অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। মক্কা বিজয়ের দিন মুহাজিরদের যে ক্ষুদ্র দলটির সাথে নবী করীম ﷺ মক্কায় প্রবেশ করেন, তালহা ছিলেন সে দলের এবং নবী করীম ﷺ-এর সাথেই তিনি পবিত্র কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

বিদায় হজ্জ : দশম হিজরী সনের ২৫ যুলকা'দা নবী করীম ﷺ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হন। এটাই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। নবী করীম ﷺ-এর সফর সঙ্গী হন তালহাও। তিনি নবী করীম ﷺ-এর সাথে যুলহুলায়ফা পৌঁছে ইহরাম বাঁধেন। এ সফরে একমাত্র নবী করীম ﷺ ও তালহা ব্যতীত আর কারও সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল না। (সহীহুল বুখারী : কিতাবুল হজ্জ)।

রাসূলকে হারিয়ে শোকাভূত : প্রিয় নবীর ইন্তিকালে তালহা দারুন আঘাত পান। নবী করীম ﷺ-এর শোকে তিনি শোকাভূত হয়ে কাতর হয়ে পড়েন। মাঝে

মাঝে বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসিবতে ধৈর্য ধরার আদেশ করেছেন, তাই তাঁর বিচ্ছেদে 'সবরে আল্লাহ্' অবলম্বনের চেষ্টা করি এবং সাথে সাথে আল্লাহর কাছে তাওফীকও কামনা করি।'

যাকাত আদায়ে কঠোরতা : আবু বকরের খিলাফতকালে তিনি তাঁর বিশেষ একজন উপদেষ্টা ছিলেন। চিন্তা, পরামর্শ ও কাজের মাধ্যমে সব বিষয়ে তিনি তাঁকে সর্বদা সাহায্য করেন। রিদ্দার যুদ্ধের সময় অনেক বিশিষ্ট সাহাবী যাকাত আদায় করতে অস্বীকারকারী বেদুইনদের সাথে কিছুটা নম্র আচরণ করার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা না করার জন্য প্রথমত: খলিফাকে পরামর্শ দেন। কিন্তু তালহা স্পষ্ট করে বলে দেন : 'যে দ্বীনে যাকাত থাকবে না তা কখনো সত্য ও সঠিক হতে পারে না।'

আবু বকরের সাথে কথোপকথন : হিজরী ১৩ সনের জামাদিউস সানী মাসে আবু বকর (রা) রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে লাগল। একদিন তালহা তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি উপস্থিত হলে কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়–

- উমরকে কি স্থলাভিষিক্ত করব? আবু মুহাম্মদ (তালহা), আপনার অভিমত কি?
- সাহাবীদের মধ্যে উমার সর্বোত্তম গুণের অধিকারী, তিনি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী।
- তাঁকে আমার স্থলাভিষিক্ত করা সম্পর্কে আমি আপনার পরামর্শ চেয়েছি।
- তাঁর স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা রয়েছে এবং তিনি অধিক পরিমাণে কড়াকড়ি আরোপ করে থাকেন।
- তাঁর মধ্যে কি কি দোষ বিদ্যমান রয়েছে?
- আপনার সময়ে তিনি যখন এত কঠোর, আপনার পরে স্বীয় দায়িত্বানুভূতিতে না জানি কত বেশি কঠোর হয়ে পড়েন।
- তাঁর ওপর যখন খিলাফতের গুরু দায়িত্ব এসে যাবে, তিনি কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যাবেন।

সবশেষে তালহা বললেন : তাঁর গুণাবলী ও যোগ্যতা যে সকলের থেকে বেশি, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই। তাঁর স্বভাবের একটি দিক সম্পর্কে আমার যা প্রতিক্রিয়া তা ব্যক্ত করতে আমি এতটুকুও কার্পণ্য করিনি।

হিজরী ১৩ সনে উমার খলিফা হলেন। তিনিও তালহাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করলেন এবং সর্বদা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে উপকৃত হলেন।

ইরাক বিজয়ের পর সেখানকার কৃষি জমি গণীমতের মালের মতো মুজাহিদের মধ্যে বণ্টন করা কি হবে না, এ প্রশ্নে সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। একজন বললেন, বণ্টন করাই যথার্থ হবে। কিন্তু খলিফাসহ অন্য একটি দল ছিলেন বণ্টন বিরোধী। অতঃপর মজলিসে শূরার বৈঠকে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর খলিফার অভিমতই সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়। এ বিষয়ে তালহা শূরার বৈঠকে দ্ব্যর্থহীনভাবে খলিফার মতকে সমর্থন করে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব : আমীরুল মু'মিনীন ওমর (রা)-এর ইন্তিকালের পূর্বে যে ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাঁদের মধ্যে থেকে যে কোন একজনকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে যান, তার মধ্যে তালহা ছিলেন অন্যতম। কিন্তু তিনি আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজে খিলাফাতের দাবি থেকে সরে দাঁড়ান এবং উসমানের সমর্থনে নিজের ভোটটি প্রদান করেন।

উসমান (রা) বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহবন্দী হলেন। একদিন তিনি ঘরের জানালা দিয়ে মাথা বের করে বিদ্রোহী গ্রুপ ও মদীনায় উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য পেশ করেন। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের মধ্যে কি তালহা রয়েছে? কেউ কোন প্রতি উত্তর দিল না। এভাবে যখন তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তখন তালহা উঠে দাঁড়ালেন। উসমান (রা) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : এ জনতার মধ্যে আপনার উপস্থিতি এবং তিনবার জিজ্ঞেস করার পর সাড়া দেবেন, এমন আশা আমি কখনো করিনি। আমি আপনাকে আল্লাহর নামে জিজ্ঞেস করছি, একদিন অমুক স্থানে, যখন নবী করীম ﷺ-এর সাথে আমি ও আপনি ব্যতীত আর কেউ ছিল না, নবী করীম ﷺ আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : তালহা, প্রত্যেক নবীরই তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে জান্নাতে একজন সঙ্গী থাকবে। উসমান ইবনে আফফানই হবে জান্নাতে আমার সঙ্গী। সে কথা আপনার স্মরণ আছে? তালহা জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি জনতার ভেতর থেকে উঠে চলে গেলেন।

আলীর সৈন্যবাহিনীর সাথে সমঝোতা : উসমান শাহাদত বরণ করলেন। মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ উসমানের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে

কিসাস দাবি করলেন। তালহা ও যুবাইর মদীনা থেকে মক্কায় আগমন করে আয়েশা (রা)-এর সাথে একত্রিত হলেন। উসমানের হত্যাকারীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে তারা বসরায় উপনীত হলেন। বসরার উপকণ্ঠেই তারা আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলেন। কা'কা ইবনে 'আমরের মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। আলী, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা, তালহা ও যুবাইর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রসঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছলেন। উভয় পক্ষ তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল।

উষ্ট্রের যুদ্ধ : চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী ইবনে সাবার লোকেরা এতে প্রমাদ গুণলো। মূলত: তারাই ছিল উসমানের একমাত্র হত্যাকারী। আলীর সেনাবাহিনীর মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে তারা একদিকে আয়েশার এবং অন্যদিকে আলীর সেনাবাহিনীর ওপর তীর নিক্ষেপ শুরু করল। উভয় পক্ষের সৈন্যরা শান্তিচুক্তির সিদ্ধান্ত হওয়ার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ছিল। অতর্কিত এ আক্রমণে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তারা ধারণা করল প্রতিপক্ষ আক্রমণ শুরু করেছে। ইহুদী ইবনে সাবার চক্রান্ত সফল করে তুলল। সকাল হতে না হতে তুমুল যুদ্ধের দামামা বেঁজে উঠল এবং ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'উটের যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

ইন্তেকাল : উষ্টের যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় দশ মতান্তরে তের হাজার লোক নিহত হলেন। এ যুদ্ধের শুরুতেই সাবীয়ীদের নিক্ষিপ্ত একটি তীর তালহার পায়ে বিঁধে যায়। ক্ষত স্থান থেকে রক্ত পড়া কোন ক্রমে বন্ধ হচ্ছে না দেখে কা'কা ইবনে আমর তাঁকে অনুরোধ করলেন বসরার 'দারুল ইলাজে' (হাসপাতালে) গমনের জন্য। তাঁরই অনুরোধে তিনি একটি চাকরকে সাথে করে 'দারুল ইলাজে' চলে যান। কিন্তু ইত্যবসরে তাঁর শরীর রক্তশূন্য হয়ে যায়। সেখানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরেই তিনি ইহকাল ত্যাগ্য করেন। বসরাতেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আসাকির উল্লেখ করেছেন যে, উটের যুদ্ধের দিন মারওয়ান ইবনুল হিকামের নিক্ষিপ্ত তীরে তালহা আঘাত প্রাপ্ত হন। হিজরী ৩৬ সনের জামাদিউল আউয়াল মতান্তরে ১০ জামাদিউস সানী ৬৪ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দানশীলতা : তালহা ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। কিন্তু সম্পদ পুঞ্জিভূত করার লোভ-লালসা তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর দানশীলতার বহু কাহিনী ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। ইতিহাসে তাঁকে 'দানশীল তালহা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। একবার হাদরামাউত থেকে সত্তর হাজার দিরহাম তাঁর হাতে এলো। রাতে তিনি বিমর্ষ ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী আবু বকর (রা)-এর কন্যা উম্মু কুলসুম স্বামীর এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন :

- হে আবু মুহাম্মদ! আপনার কী হয়েছে? আপনি কি আমার কোন আচরণে কষ্ট পেয়েছেন?
- না, একজন মুসলমান পুরুষের স্ত্রী হিসেবে তুমি বড় সুন্দরী। কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকে আমি চিন্তা করছি, এত অর্থ ঘরে রেখে নিদ্রা গেলে একজন মানুষের তার পরওয়ারদেগারের প্রতি কিরূপ ধারণা হবে?
- এতে আপনার বিষণ্ন ও চিন্তিত হওয়ার কি আছে? এত রাতে গরীব-দুঃখী ও আপনার আত্মীয়-পরিজনদের কোথায় পাবেন? সকাল হলেই বণ্টন করে দেবেন।
- আল্লাহ তা'আলা তোমার ওপর দয়া করুন! একেই বলে, বাপ কি বেটী।

পরদিন প্রত্যুষে পৃথক পৃথক থলি ও পাত্রে দিরহাম বণ্টন করে মুহাজির ও আনসার গরীব মিসকীনদের মধ্যে তিনি যথার্থভাবে বণ্টন করে দেন। তাঁর দানশীলতা প্রসঙ্গে অপর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি তালহার কাছে এসে তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বর্ণনা করে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। তালহা বললেন : অমুক স্থানে আমার এক টুকরা জমি রয়েছে। উসমান ইবনে আফফান উক্ত জমির বিনিময়ে আমাকে তিন লাখ দিরহাম দিতে চান। তুমি ইচ্ছা করলে সে জমিটুকু নিতে পার বা আমি তা বিক্রি করে তিন লাখ দিরহাম তোমাকে দিতে পারি। লোকটি মূল্যই দিতে চাইল। তিনি তাঁকে বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দান করেন।

১৫৯টি হাদীসের কিতাবের ১১৫৩টি বর্ণনার সাথে তলহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-এর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় তন্মধ্যে মুয়াত্তাতে ৮, বুখারীতে ১১, মুসলিমে ১১, আবু দাউদে ১০, তিরমিজীতে ১১টি রয়েছে।

৬. যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)

উত্তপ্ত পাথরের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে এমনভাবে প্রহার করতেন যে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যেত। তবুও তিনি বলতেন, 'যত আঘাত করুন না কেন আমি পুনরায় কাফির হতে পারি না।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে আশারায়ে মুবাশ্‌শারা বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ ـ

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, উমর জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ জান্নাতী।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবদুর রহমান ইবনে আওফ– ৩/২৯৪৬)

নাম ও পরিচয় : তাঁর নাম যুবাইর, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ এবং উপাধি 'হাওয়ারিয়্যু রাসূলিল্লাহ'। পিতার নাম 'আওয়াম' এবং মাতা 'সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব।' মা সাফিয়্যা ছিলেন রাসূলে করীম ﷺ-এর ফুফু।

রাসূলﷺ-এর সাথে সম্পর্ক : যুবাইর ছিলেন রাসূলে করীমﷺ-এর ফুফাতো ভাই। উম্মুল মু'মিনীন খাদিজাতুল কুবরা ছিলেন তাঁর ফুফু।। অন্যদিকে সিদ্দিকে আকবরের কন্যা আসমাকে বিবাহ করায় নবী করীমﷺ-এর ছিলেন তাঁর আপন ভায়রা। আসমা (রা) ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার (রা) বোন। এভাবে রাসূলে করীমﷺ-এর সঙ্গে ছিল তাঁর একাধিক আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ক।

জন্ম : যুবাইর (রা) হিজরাতের আটাশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবকালীন জীবন প্রসঙ্গে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে এটা নিশ্চিত যে প্রথম থেকেই তাঁর মা তাঁকে এমনভাবে লালন-পালন করেছিলেন, যাতে বড় হয়ে তিনি একজন দুঃসাহসী, দৃঢ়-সংকল্প ও আত্মপ্রত্যয়ী মানুষে পরিণত হন। এ কারণে প্রায়ই মা তাঁকে মারতেন এবং কঠোর অভ্যাসে অভ্যস্ত করতেন।

মায়ের কঠোর শাসন : একদিন তাঁর চাচা নাওফিল ইবনে খুওয়াইলিদ তাঁর মা সাফিয়্যার ওপর ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'এভাবে মারতে মারতে ছেলেটাকে তুমি মেরেই ফেলবে।' তাছাড়া বনু হাশিমের লোকদের আহ্বান করে বলেন, 'তোমরা সাফিয়্যাকে বুঝাও না কেন?' উত্তরে সাফিয়্যা বলেন, 'যারা বলে আমি তাকে দেখতে পারি না, তারা মিথ্যা বলে। আমি তাকে এজন্য আঘাত করি যাতে সে জ্ঞানী হয় এবং পরবর্তী জীবনে শত্রু সৈন্য পরাজিত করে গনিমতের মাল অর্জন করতে পারে।

শক্তিশালী কুস্তিগার : এমন লালন-পালনের প্রভাব অবশ্যই তাঁর ওপর পড়েছিল। অল্পবয়স থেকেই তিনি বড় বড় পাহলোয়ান ও শক্তিশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে কুস্তি লড়তেন। একবার মক্কায় একজন শক্তিশালী জোয়ানের সাথে তাঁর হাতাহাতি হয়ে গেল। তাকে এমনভাবে প্রহার করলেন যে, লোকটির হাত ভেঙ্গে গেল। জনগণ তাঁকে ধরে সাফিয়্যার কাছে নিয়ে এসে অভিযোগ করল। তিনি পুত্রের কাজে অনুতপ্ত হওয়া বা ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে সর্বপ্রথম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা যুবাইরকে কেমন দেখলে ভীরু না সাহসী?'

ইসলাম গ্রহণ : যুবাইর (রা) মাত্র ষোল বছর বয়সেই ইসলাম কবুল করেন। প্রথম পর্বের ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনন্য ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

একজন সাহসী বালক : যদিও তাঁর বয়স ছিল কম তবুও দৃঢ়তা ও জীবনকে বাজি রাখার ক্ষেত্রে ছিলেন অগ্রগামী। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর একবার কেউ রটিয়ে দিয়েছিল, মুশরিকরা রাসূলে করীম ﷺ-কে বন্দী অথবা হত্যা করে ফেলেছে। একথা তিনি আবেগ ও উত্তেজনায় এতই আত্মভোলা হয়ে পড়েছিলেন যে তক্ষুণি একটানে তরবারি কোষমুক্ত করে জনগণের ভিড় ঠেলে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর দরবারে গিয়ে হাজির হন। রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে যুবাইর?' তিনি বললেন, 'শুনেছিলাম, আপনি বন্দী অথবা নিহত হয়েছেন।' রাসূলে করীম ﷺ অত্যন্ত খুশী হয়ে তাঁর জন্যে দোয়া করেন। সীরাত লেখকদের বর্ণনা, এটাই হচ্ছে প্রথম তলোয়ার যা আত্মোৎসর্গের উদ্দেশ্যে একজন বালক উন্মুক্ত করেছিল।

অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার : প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কার অন্যান্য মুসলমানদের মতো তিনিও অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার। তাঁর চাচা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরানোর জন্যে প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু একত্ববাদের ছোঁয়া যার অন্তরে একবার লেগে যায় তা কি আর মুছে ফেলা যায়? ক্রোধ হয়ে চাচা আরো কঠোরতা শুরু করে দেন। উত্তপ্ত পাথরের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে এমনভাবে প্রহার করতেন যে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যেত। তবুও তিনি বলতেন, 'যত আঘাত করুন না কেন আমি পুনরায় কাফির হতে পারি না।' অবশেষে নিরুপায় হয়ে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করেন। হাবশায় কিছু দিন অবস্থানের পর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে রাসূলে করীম ﷺ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন। তিনিও মদীনায় গেলেন।

রাসূলে করীম ﷺ মক্কায় তালহা ও যুবাইরের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মদীনায় গমনের পর নতুন করে সালামা ইবনে সালামা আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। সালামা ছিলেন মদীনার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব এবং আকাবায় বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্যতম।

জিহাদে অংশগ্রহণ : যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি বদর যুদ্ধে অত্যন্ত সাহস ও নিপুণতার পরিচয় বহন করেন। মুশরিকদের প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। একজন মুশরিক সৈনিক একটি টিলার ওপর উঠে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানালে যুবাইর তাকে মুহূর্তের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেন যে, দু'জনেই গড়িয়ে নিচের দিকে আসতে থাকেন। তা দেখে রাসূলে

করীম ﷺ বলেন, 'এদের মধ্যে যে প্রথম ভূমিতে ধরাশায়ী হয়ে পড়বে, সে নিহত হবে।' সত্যি তাই হয়েছিল। মুশরিকটি প্রথম মাটিতে পড়ে এবং যুবাইর (রা) তরবারির এক আঘাতে তাকে হত্যা করেন।

এমনিভাবে তিনি 'উবাইদা ইবনে সাঈদের সম্মুখীন হলেন। সে ছিল আপাদ-মস্তক এমনভাবে বর্মাচ্ছাদিত যে কেবল মাত্র দুটি চোখই তার দেখা যাচ্ছিল। তিনি নিখুঁতভাবে তাক করে তার চোখ লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন। নিশানা নির্ভুল হলো। তীরের ফলা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। অতি কষ্টে তিনি তার লাশের উপর বসে ফলাটি বের করতে হয়েছিল। তবে তা কিছুটা বেঁকে গিয়েছিল। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাসূলে করীম ﷺ এ তীরটি নিজেই নিয়ে নেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর তৃতীয় খলিফা উসমান পর্যন্ত এ তীরটি বিভিন্ন খলিফার নিকট সংরক্ষিত ছিল। উসমানের শাহাদাতের পর আবুদল্লাহ ইবনে যুবাইর তীরটি গ্রহণ করেন এবং তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত এটি তাঁর কাছে ছিল।

উমার (রা) বলেন, যুবাইর (রা) দ্বীনের রুকনসমূহের একটি বিরাট রুকন। বদরের যুদ্ধে তিনি অটল ও অবিচল ছিলেন। মু'মিন জননী আয়েশা (রা) বলেন যা সূরা আলে ইমরান ১৭২ নং আয়াতে আছে–

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ .

যারা আহত হওয়ার পর আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে' এ আয়াতে আবূ বকর (রা) ও যুবাইর (রা)-কে বুঝানো হয়েছে।

বদর প্রান্তরে তিনি এত সাংঘাতিকভাবে লড়াই করেছিলেন যে, তাঁর তরবারি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল এবং আঘাতে আঘাতে তাঁর গোটা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এ দিনের একটি ক্ষত এত গভীরে ছিল যে চিরদিনের জন্যে তা একটি গর্তের মতো চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পুত্র উরওয়া বলেন, 'আমরা সেই গর্তে আংগুল প্রবেশ করিয়ে খেলা করতাম।' এ যুদ্ধে তিনি হলুদ রঙের পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আজ ফিরিশতাগণও এ বেশে উপস্থিত হয়েছেন।'

উহুদের ময়দানে সত্য ও মিথ্যার লড়াই যখন চরম পর্যায়ে, তখন রাসূলে করীম ﷺ স্বীয় তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন, 'আজ কে এর হক আদায় করবে?'

সকল সাহাবীই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নিজ নিজ হাত সম্প্রসারিত করলেন। যুবাইর (রা)ও তিনবার নিজের হাত উত্তোলন করে নিজের আগ্রহের কথা প্রকাশ করলেন। উহুদের যুদ্ধে তীরন্দাজ সৈনিকদের অসতর্কতার ফলে যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং মুসলিমদের সুনিশ্চিত বিজয় পরাজয়ের দিকে মোড় নিল তখন যে চৌদ্দজন সাহাবী নিজেদের জীবন বিনিময়ে রাসূলে করীম ﷺ-কে কেন্দ্র করে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করেন যুবাইর (রা) ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

খন্দকের যুদ্ধে মুসলিম মহিলাগণ যেদিকে অবস্থান নিয়েছিলেন, সে দিকটির প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যুবাইর (রা)। এ যুদ্ধের সময় মদীনার ইয়াহুদী গোত্রে বনু কুরাইজা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি লঙ্ঘন করে। রাসূলে করীম ﷺ তাদের অবস্থা জানার জন্যে কাউকে তাদের কাছে প্রেরণ করতে চাইলেন। তিনবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাদের খবর নিয়ে আসতে সক্ষম?' প্রত্যেকবারই যুবাইর বলেন, 'আমি'। রাসূলে করীম ﷺ তাঁর আগ্রহে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'প্রত্যেক নবীরই থাকে হাওয়ারী। আমার হাওয়ারী যুবাইর।'

খন্দকের পর বনু কুরাইজার যুদ্ধ এবং বাই'আতে রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। খাইবারের যুদ্ধে তিনি অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। খাইবারের ইয়াহুদী নেতা মুরাহহিব মৃত্যুবরণ করলে বিশাল দেহ ও বিপুল শক্তির অধিকারী তার ভাই ইয়াসির ময়দানে এসে গর্জন করে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। যুবাইর (রা) লাফিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মা সাফিয়্যা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় আজ আমার কলিজার টুকরা শহীদ হবে।' রাসূলে করীম ﷺ বললেন, 'না। যুবাইরই তাকে হত্যা করবে।' সত্যি সত্যি সামান্য সময়ের মধ্যে যুবাইর তাকে হত্যা করেন।

খায়বার বিজয়ের পর মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি চলছে। মানবীয় কিছু দুর্বলতার কারণে প্রখ্যাত সাহাবী হাতিব ইবনে আবু বালতা'আ (রা) সব খবর জানিয়ে মক্কায় কুরাইশদের কাছে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিসহ গোপনে একজন মহিলাকে তিনি মক্কায় প্রেরণ করেন। এদিকে ওহীর মাধ্যমে এ সকল খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ অবগত হলেন। তিনি চিঠিসহ মহিলাটিকে বন্দির জন্যে যে দলটি প্রেরণ করেন, যুবাইরও ছিলেন সে দলের একজন। চিঠিসহ মহিলাকে বন্দি করে

মতামত যদি সর্বসাধারণের কাছে গৃহীত না হয় তাহলে আবদুর রহমান যে দলে থাকবেন তাঁদের মতই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।' উমরের এ পরামর্শের মধ্যে আবদুর রহমান প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব : ওমর মৃত্যুবরণ করলেন। আবদুর রহমান খলিফা হতে রাজী ছিলেন না। এদিকে তালহাও তখন মদীনায় অবস্থিত। বাকি চার ব্যক্তি খলিফা নির্বাচনের পূর্ণ দায়িত্ব আবদুর রহমানের ওপর ন্যস্ত করেন।

আবদুর রহমানের ওপর অর্পিত এ দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আমানতদারীর সাথে পালন করেন। ধারাবাহিক তিন দিন তিন রাত বিভিন্ন স্তরের লোকদের সাথে মতো বিনিময় করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ উসমানের পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করেন। ফজরের জামা'আতে অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান। সালাত শেষে তিনি উপস্থিত মুসল্লীদের সামনে খলিফা হিসেবে উসমানের নামটি ঘোষণা করেন। ওমরের ছুরিকাহত হওয়ার পর থেকে তাঁরই নির্দেশে তৃতীয় খলিফা হিসেবে উসমান (রা)-এর নাম ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি জামা'আতের ইমামতির করেন এবং প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব পরিচালনা করেন।

২৪ হিজরী সনের মুহাররম মাসে উসমান খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। সে বছরই তিনি আবদুর রহমানকে আমীরুল হজ্জ্ব নিযুক্ত করেন। মুসলিম উম্মাহ সে বছরের হজ্জ্বটি তাঁরই নেতৃত্বে আদায় করে।

আবদুর রহমান আমরণ খলিফা উসমানের মজলিসে শূরার সদস্য থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দানের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর বিশেষ খিদমত আঞ্জাম দেন। আবু বকর, উমার, উসমান (রা)–এ তিন খলিফার প্রত্যেকের কাছেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও আস্থার পাত্র।

মৃত্যুবরণ : ইবনে সা'দের মতে, আবদুর রহমান হিজরী ৩২ সনে ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তবে ইবনে হাজারের মতে, তিনি ৭২ বছর জীবিত ছিলেন। ইবনে হাজার এ কথাও উল্লেখ করেন, উসমান অথবা যুবাইর ইবনুল আওয়াম তাঁর জানাযার ইমামতি করেন এবং তাঁকে মদীনার বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়। গোরস্থান পর্যন্ত তার লাশ বহনকারীদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসও ছিলেন।

আল্লাহর পথে ব্যয় : পূর্বেই আমরা দেখেছি সম্পূর্ণ রিক্ত হাতে আবদুর রহমান মদীনায় গমন করেছিলেন। সামান্য ঘি ও পনির ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে তিনি

তাঁর ব্যবসা আরম্ভ করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। নবী করীম ﷺ তাঁর সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেছিলেন এবং সে প্রার্থনা আল্লাহর কাছে গৃহীতও হয়েছিল। কিন্তু সে সম্পদের প্রতি তাঁর একটুও লোভ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তিকালের পরেও আমরণ তিনি সে সম্পদ অকৃপণ হাতে আল্লাহর পথে ও মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন।

একবার নবী করীম ﷺ একটি অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বলেন, 'আমি একটি অভিযানে সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা পোষণ করেছি, তোমরা সাহায্য কর।' আবদুর রহমান এক দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে এ চার হাজার দিরহাম। দু'হাজার আমার পালনকর্তাকে করজে হাসানা দিলাম এবং অবশিষ্ট দু'হাজার আমার পরিবার-পরিজনের জন্য রেখে দিলাম।' নবী করীম ﷺ বললেন, 'তুমি যা দান করেছ এবং যা রেখে দিয়েছ, তার সবকিছুতে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করুন।'

একবার মদীনায় হট্টগোল পড়ে গেল, সিরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ে একটি বাণিজ্য কাফেলা উপস্থিত হয়েছে। শুধু উট আর উট। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কার বাণিজ্য কাফেলা?' লোকেরা বলল, 'আবদুর রহমান ইবনে আউফের।' তিনি বললেন, আমি রাসূল ﷺ-কে 'বলতে শুনেছি, আমি যেন আবদুর রহমানকে সিরাতের ওপর একবার হেলে গিয়ে আবার সোজা হয়ে উঠতে দেখলাম।' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা বলেন, 'আল্লাহ দুনিয়াতে তাকে যা কিছু দান করেছেন তাতে বরকত দিন এবং তাঁর পরকালের প্রতিদান এর থেকেও অনেক বড়। আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আবদুর রহমান হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

দানশীলতা : আয়েশার এ কথাগুলো আবদুর রহমানের কর্ণগোচর হল। তিনি বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আমাকে সোজা হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে।' অতঃপর তিনি তাঁর সকল বাণিজ্য সম্ভার সাদকা করে দেন। পাঁচ শত, মতান্তরে সাত শত উটের পিঠে এ মালামাল বোঝাই ছিল। কেউ বলেছেন, বাণিজ্য সম্ভারের সাথে উটগুলোও তিনি সাদকা করে দেন। আবদুর রহমান ছিলেন উম্মাহাতুল মু'মিনীনের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাঁদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি আজীবন অকাতরে খরচ করেছেন। তাঁদের কাছে তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসী ও

আস্থাভাজন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। একবার তিনি কিছু ভূমি চল্লিশ হাজার দীনারে বিক্রি করেন এবং বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ বনু যুহরা নবী করীম ﷺ-এর মা আমিনার পিতৃ-গোত্র, মুসলমান, ফকীর মিসকীন, মুহাজির ও আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাতের মধ্যে বন্টন করে দেন। আয়েশার নিকট তাঁর অংশ পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে প্রেরণ করেছেন?' বলা হলো, 'আবদুর রহমান ইবনে আওফ।' তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন : 'আমার পরে ধৈর্যশীলরাই তোমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল দেখাবে।'

ইবনে হাজার 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে জা'ফর ইবনে বারকানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আবদুর রহমান মোট তিরিশ হাজার দাস আযাদ করেছেন। জাহিলী যুগেও মদ পানকে তিনি হারাম মনে করতেন।

আল্লাহভীতি : আবদুর রহমান ছিলেন তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির এক বাস্তব উদাহরণ। মক্কায় গেলে তিনি তাঁর পূর্বের বাড়ি–ঘরের দিকে দৃষ্টিও দিতেন না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বাড়ি–ঘরের প্রতি আপনি এত নাখোশ কেন?' তিনি বললেন, ওগুলো তো আমি আমার আল্লাহর জন্য রেখে এসেছি।'

একবার তিনি তাঁর বন্ধুদের আমন্ত্রণে গেলেন। ভালো ভালো খাবার এলো। খাবার দেখে তিনি কান্না শুরু করে দিলেন। জনগণ জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? তিনি বলেন, 'নবী করীম ﷺ বিদায় নিয়েছেন। তিনি নিজের ঘরে যবের রুটিও পেট ভরে খেতে পাননি।'

একদিন তিনি সিয়াম সাধনায় রতছিলেন। ইফতারের পর তাঁর সামনে আনীত খাবারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুস'আব ইবনে উমায়ের ছিলেন আমার থেকেও শ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি শাহাদতবরণ করলে তাঁর জন্য মাত্র ছোট্ট একখানা কাফনের বস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল। তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যেত। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য দুনিয়ার এ প্রাচুর্য দান করলেন। আমার ভয় হয়, আমাদের বিনিময় না জানি দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়।' অতঃপর তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন।

ওমর তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আবদুর রহমান মুসলিম নেতৃবৃন্দের একজন।' আলী একটি ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, 'আবদুর রহমান ছিলেন আসমান ও যমীনের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি।'

হাদীস বর্ণনা : আবদুর রহমান নবী করীম ﷺ থেকে সরাসরি ও ওমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্রগণ, যেমন ইবরাহীম, হুমায়েদ, উমার, মুস'আব, আবু সালামা, তাঁর পৌত্র মিসওয়ার, ভাগ্নে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার, জুবাইর, জাবির, আনাস, মালিক ইবনে আওস (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বড় পরিচয়, তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারাদের মতো অন্যতম।

কাবীসাহ ইবনে জাবির (রা) বলেন, আমি উমারের নিকট গিয়ে দেখি তার ডান পার্শ্বে একজন ফুট ফুটে সুন্দর লোক বসে আছেন, তিনি হলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)। তাঁর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও তাবিয়ী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন রাসূল ﷺ হতে—

اِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِىْ اَلاَّ اُبَشِّرُكَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُّ اللّٰهَ شُكْرًا .

রাসূল ﷺ বলেন, আমাকে জিবরাঈল আমীন বলেন, আপনার জন্য শুভ সংবাদ, আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আপনার ওপর দরূদ পাঠ করবে তার জন্য আমি করুণা বর্ষণ করি। আর যে আপনাকে সালাম জানাবে আমিও তাকে সালাম জানাব। এ শুভ সংবাদে আমি সিজদায়ে শুকুর দিলাম।

সব চেয়ে বুদ্ধিমান : রাসূল ﷺ বলেন—

اَكْثَرُهُمْ ذَكَرَ الْمَوْتَ وَاَحْسَنُهُمْ اسْتِعْدَادًا لَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّنَزِّلَ بِهٖ اُولٰئِكَ الْاَكْيَاسُ .

যে মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু আগমণের পূর্বেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে সেই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী। রাসূল ﷺ আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন—

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ خَمْسٌ خِصَالٍ اِذَا نَزَلْنَ بِكُمْ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ اَنَّهٗ لَمْ تَظْهَرِالْفَاحِشَةَ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهٖ حَتّٰى اِلاَّ ظَهَرَ فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالْاَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ

تَكُنْ فِىْ اَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مُضَرًا وَلَمْ تَنْقَصُوْا الْمِيْزَانَ اِلاَّ اُخِذُوْا بِا لسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرُ السُّلْطَانِ وَلَمْ يَمْنَعُوْا الزَّكٰوةَ مِنْ اَمْوَالِهِمْ اِلاَّ مُنِعُوا الْمَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَلَوْ لاَ الْبَهَائِمُ مَا مُطِرُوْا وَمَا نَقَضُوْ عَهْدَ اللّٰهِ وَعَهْدَ رَسُوْلٍ اِلاَّ سُلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَاَخَذَ مَا كَانَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَمَا لَمْ يَحْكُمْ اَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَتُجْبَرُوْا فِيْهَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ بَئْسَهُمْ بَيْنَهُمْ -

হে মুহাজিরগণ! পাঁচটি জিনিস তোমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়া থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি–

১. কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচারের ছড়াছড়ি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের অপকর্ম প্রকাশ্যে না করবে। যখনই এ রকম হবে তখন প্লেগ এবং অন্যান্য রোগ দেখা দিবে যা তাদের পূর্ববর্তীগণের সময় হয় নাই।

২. যখন লোকেরা ওজনে কম দিবে তখন দুর্ভিক্ষ, বিপদাপদ এবং দেশের শাসনকর্তার জুলমের শিকার হবে।

৩. যখন মালের যাকাত প্রদান বন্ধ করে দিবে তখন আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করা হবে, যেটুকু হবে তা গবাদি পশুর জন্য।

৪. কেউ যখন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর তাদের শত্রুকে নেতৃত্ব করতে দিবেন। জালিম শাসকরা প্রজাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে নিজের মালে পরিণত করবে।

৫. যখন তাদের নেতারা আল্লাহর বাণী কুরআনের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে না, তখন তাদের অন্তরে একে অপরের ভয় ঢুকে যাবে। অতঃপর রাসূল ﷺ আবদুর রহমান ইবনে আওফকে সৈনিক বেশে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি পরদিন সকালে কালো পাগড়ী মাথায় বেঁধে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলেন। রাসূল ﷺ পাগড়ী উঠিয়ে নিজ হাতে বাঁধলেন। রাসূল ﷺ বিলাল (রা)-কে ইসলামী ঝাণ্ডা নিয়ে আসতে বললেন। হামদ ও ছানার পর

রাসূল ﷺ বললেন– 'আবদুর রহমান, তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। স্মরণ রাখ খিয়ানত, গাদ্দারী এবং অঙ্গ কর্তন করবে না। তোমরা শিশুদের হত্যা করবে না এটাই হল আল্লাহর অঙ্গীকার এবং তোমার রাসূলের সীরাত।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত আছে–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لِنِسَائِهِ اِنَّ اَمْرَكُنَّ يُهَمِّنِىْ مِنْ بَعْدِىْ وَلَنْ يَصْبِرُ عَلَيْكُنَّ اِلاَّ اَلاَ نْصَارُوْنَ الصِّدِّيْقُوْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ لاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَلَقَى اللّٰهُ اَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيْلِ الْجَنَّةِ وَكَانَ ابْنُ عَوْفٍ قَدْ تَصَدَّقَ عَلٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِحَدِيْقَةٍ بِيْعَتْ بِاَرْبَعِيْنَ اَلْفًا ـ

রাসূল ﷺ বলেন, আমার অবর্তমানে তোমাদেরে অবস্থা কী হবে এ বিষয়ে আমার চিন্তা হয়। তোমাদের দেখাশুনা আবূ বকর (রা) করবে। একদা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা), আবদুর রহমান (রা)-এর পুত্র আবূ সালামাহকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার আব্বাকে সালসাবিল ঝর্ণা হতে পরিতৃপ্ত করেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর সহধর্মিণীদের বাগিচার জন্য চল্লিশ হাজার দিরহাম পরিশোধ করেছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের বলে যান, যে কেউ আমার অবর্তমানে তোমাদের খিদমত করবে, সে হলো প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদী ও দানবীর। তিনি ﷺ আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন, হে প্রভু! তুমি আবদুর রহমান ইবনে আওফকে সালসাবিল ঝর্না দ্বারা পরিতৃপ্ত কর।

যুবাইর ইবনে বাকর বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাসূলের স্ত্রীদের দেখাশুনা করতেন। এক সফরে রাসূল ﷺ তাঁকে মাদীনার দায়িত্বভার দিয়ে যান।

হাদীসের গ্রন্থসমূহে অন্তত ৩৫৫৬টি বর্ণনার সাথে আবদুর রহমান ইবনে আওফের নাম দেখা যায় তন্মধ্যে মুয়াত্তাতে ৩৭, বুখারীতে ৫৩, মুসলিমে ৪৭।

৮. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)

অবশেষে তিনি মায়ের মুখের ওপর বলে দিতে বাধ্য হলেন : 'মা, আপনার মতো হাজারটি মাও যদি আমার ইসলাম ত্যাগ করার বিষয়ে জিদ ধরে পানাহার ছেড়ে দেয় এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবুও সত্য দ্বীন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে আশারায়ে মুবাশ্‌শারা বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ .

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ জান্নাতী।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবদুর রহমান বিন আওফ– ৩/২৯৪৬)

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আবু ইসহাক সা'দ, পিতার নাম– আবু ওয়াক্কাস মালিক। ইতিহাসে তিনি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস নামে পরিচিত। কুরাইশ বংশের বনু যুহরা শাখার সন্তান। মাতার নাম 'হামনা' বিনতে আবু সুফিয়ান।

পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন কুরাইশ বংশের। সা'দের পিতা আবু ওয়াক্কাস ইসলাম কবুল করে রাসূলে করীম ﷺ-এর সাহাবী হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। তাঁর অন্তিম রোগশয্যায় নবী করীম ﷺ তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। মাতা হামনাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর মাতার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী : তাঁর পুত্র সা'দের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে ক্রোধ ও বিলাপ শুরু করে লোকজন একত্রিত করে ফেললেন। মায়ের কীর্তিকর্ম দেখে রাগে দুঃখে হতভম্ব হয়ে সা'দ ঘরের এক কোণে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন। কিছুক্ষণ বিলাপ ও হৈ চৈ করার পর মা পরিষ্কার বলে দিলেন : 'সা'দ যতক্ষণ মুহাম্মদের রিসালাতের অস্বীকৃতির ঘোষণা না দেবে ততক্ষণ আমি কিছু ভক্ষণ করব না, কিছু পান করবও না, রৌদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছায়াতেও আসব না। মায়ের আনুগত্যের আদেশ তো আল্লাহও দিয়েছেন। আমার কথা না শুনলে অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে এবং মায়ের সাথে তার কোন প্রকার সম্পর্কও থাকবে না।'

এতে সা'দ বড় পেরেশান হয়ে পড়লেন। নবী করীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সব স্ববিস্তারে বর্ণনা করলেন। নবী করীম ﷺ-এর কাছ থেকে জবাব পাওয়ার পূর্বেই সূরা আল আনকাবুতের অষ্টম আয়াতটি অবতীর্ণ হল–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

'আমি মানুষকে আদেশ করেছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর শক্তি প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক স্থাপন করতে বলে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না।'

পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি সা'দের মানসিক অস্থিরতা বিদূরিভূত করে দিল। তাঁর মা তিনদিন পর্যন্ত কিছু মুখে দিলেন না, কারো সাথে কথা বললেন না এবং রোদ থেকে ছায়াতেও এলেন না। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ল। বার বার তিনি মায়ের কাছে এসে তাঁকে বুঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন; কিন্তু

তাঁর একই কথা, তাঁকে ইসলাম পরিত্যাগ করতে হবে। অবশেষে তিনি মায়ের মুখের ওপর বলে দিতে বাধ্য হলেন : 'মা, আপনার মতো হাজারটি মাও যদি আমার ইসলাম ত্যাগ করার বিষয়ে জিদ ধরে পানাহার ছেড়ে দেয় এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবুও সত্য দ্বীন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।' সা'দের এ চরম সত্য কথাটি তাঁর মায়ের অন্তরে দাগ কাটে। অবশেষে তিনিও ইসলাম কবুল করেন। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'আল-ফাদায়িল' অধ্যায়ে এ বিষয়ক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সা'দের ভাই উমাইর (রা) নবী করীম ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির কিছুদিন পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। ইবনে খালদুন তাঁর 'তারীখে' উমাইরের পর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন।

ইসলাম গ্রহণ : আবু বকর ছিলেন সা'দের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আবু বকরের দাওয়াতেই তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। ইমাম বুখারী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে 'আল-মানাকিব' অধ্যায়ে সা'দের ইসলাম গ্রহণ বিষয়ক হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। সা'দ বলেন : ইসলাম গ্রহণের পর আমি নিজেকে তৃতীয় মুসলমান হিসেবে দেখতে পেলাম। আসলে তিনি নবী করীম ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সাথে সাথে ইসলাম কবুল করেন; কিন্তু অনেকের মতোই তখন তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেননি। আর এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর মায়ের ঘটনা এবং সূরা আনকাবুতের আয়াতটি নাযিলের মাধ্যমে। কারণ, আলোচ্য আয়াতটি নবুওয়াতের চতুর্থ বছর নাযিল হয়। সম্ভবত: এ সময়ই তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি মায়ের কাছে প্রকাশ করেন।

নবুওয়াতের তৃতীয় বছরে সুলাইম গোত্রের 'আমর ইবনে' আবাসা গোপনে নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করেন। তখনও প্রকাশ্য দাওয়াতের অনুমতি আল্লাহর তরফ থেকে আসেনি। ইসলাম গ্রহণের পর 'আমর শিয়াবে আবু তালিবের এক কোণে সালাত আদায় করছিলেন। কুরাইশরা প্রস্তর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তা দেখে দু'একজন মুসলমানের সাথে সা'দও এগিয়ে এলেন এবং উক্ত কুরাইশ কাফিরদের সাথে তাদের ঝগড়া ও হাতাহাতি শুরু হয়। সা'দ তাঁর চাবুকটি দিয়ে এক কাফিরকে বেদম আঘাত করলেন। লোকটির দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। কোন মুসলমানের হাতে কোন মুশরিকের রক্ত ঝরানোর এ ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম।

মদীনায় হিজরত : মুস'আব ইবনে 'উমাইর ও ইবনে উম্মে মাকতুমের মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর যে চার জন ব্যক্তি মদীনায় হিজরত করেন তাঁদের একজন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্‌কাস অন্যতম। সহীহ্ বুখারীতে বারা ইবনে আযিব থেকে একটি হাদীস রেওয়ায়েত হয়েছে। তিনি বলেন : 'সর্বপ্রথম আমাদের কাছে এসে মুস'আব ইবনে 'উমাইর ও ইবনে উম্মে মাকতুম। এ দু'ব্যক্তি মদীনাবাসীদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। অতঃপর বিলাল, সা'দ ও আম্মার ইবনে ইয়াসির আসেন। ইবনে সা'দ 'তাবাকাতুল কুবরা' গ্রন্থে ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, সা'দ ও তাঁর ভাই উমাইর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গমন করে সাদের এক ভাই 'উতবা ইবনে আবু ওয়াক্‌কাসের কাছে অবস্থান করেন। তার কয়েক বছর পূর্বেই 'উতবা এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় নেয়।

জিহাদে অংশগ্রহণ : আল্লাহর পথে জিহাদে সা'দের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতা ইসলাম-শত্রুদের খুব ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তিনিই প্রথম মুসলিম যিনি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেন। তিনি নিজেও বলতেন।

–'আমি প্রথম আরব যে আল্লাহর জন্য তীর চালনা করেছিল।'

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর বেশ কিছুদিন যাবত মুহাজির মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের না ছিল খাদ্য, না ছিল পরিধেয় পোশাক এবং না ছিল সুনির্দিষ্ট জীবিকার উপায় উপকরণ। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের চাপে মদীনায় সীমিত পরিসরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতটি দুর্বল হয়ে উঠেছিল। মদীনার আনসার মুহাজির নির্বিশেষে সব মুসলিম সমাজ চরম আর্থিক দুর্গতির মধ্যে পতিত হয়। এমন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁরা ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজ চালিয়ে যান এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকে। তাঁদের এ চরম দারিদ্র্য সম্পর্কে সা'দ বলেন : 'আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম; আমরা জীবন ধারণ করতাম, আর আমাদের বিষ্ঠা হতো উট ছাগলের বিষ্ঠার মতো।' (বুখারী ও মুসলিম : মানাকিবু সা'দ (রা))

হিজরাতের এক বছর পর সফর মাসে নবী করীম ﷺ ষাটজন উষ্ট্রারোহীর একটি দলকে কুরাইশদের গতিবিধি অবলোকন করার উদ্দেশ্যে পাহারা দিতে প্রেরণ করলেন। এ দলে সা'দও ছিলেন। এক পর্যায়ে ইকরিমা ইবনে আবু

জাহলের নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি বিরাট দল তাঁরা দেখতে পেলেন। কিন্তু উভয় পক্ষ সংঘর্ষে এগিয়ে গেল। তবে কুরাইশ পক্ষের কেউ একজন হঠাৎ জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলে সা'দ সাথে সাথে তীর নিক্ষেপ করলেন। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে কাফিরদের প্রতি নিক্ষিপ্ত প্রথম তীর।

হিজরী দ্বিতীয় সনের রবিউস সানী মাসে নবী করীম ﷺ দু'শো সাহাবীকে সাথে নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা দেন। উদ্দেশ্য মদীনার আশে পাশে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং শত্রুদের জানিয়ে দেয়া যে মুসলমানরা ঘুমিয়ে নেই। এ বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন সা'দ (রা)। বাওয়াত নামক স্থানে কুরাইশদের সাথে এবার ছোট খাট একটি সংঘর্ষও সংঘটিত হয়। এর ছয়মাস পর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বদর যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পূর্বে নবী করীম ﷺ কুরাইশ কাফিলার সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিন জনের যে দলটি প্রেরণ করেন তাদের একজন ছিলেন সা'দ (রা)। তাঁরা বদরের কূপের কাছে ওঁৎ পেতে থেকে প্রতিপক্ষের দু'জনকে বন্দি করে নবী করীম ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসেন। নবী করীম ﷺ তাঁদের কাছে থেকে শত্রু পক্ষের অনেক গোপনীয় তথ্য উদ্ধার করেন।

বদরে সা'দ ও তাঁর ভাই 'উমাইর (রা) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যান। প্রত্যেকেই একাধিক কাফিরকে হত্যা করে চিরতরে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। এ যুদ্ধে 'উমাইর (রা) শহীদ হন এবং সা'দ (রা) সাঈদ ইবনে আ'সকে হত্যা করে তার তলোয়ারখানি নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর কাছে সমর্পণ করেন। তিনি নবী করীম (রা)-এর কাছে তলোয়ারখানি পাওয়ার একান্ত আশা প্রকাশ করেন। জবাবে তিনি বললেন : এ তলোয়ার না তোমার না আমার। সা'দ নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে উঠে কিছুদূর যেতে না যেতেই সূরা আনফাল নাযিল হয়। অতঃপর নবী করীম ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন : 'তোমার তলোয়ার নিয়ে যাও।'

উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদরের এক বছর পর। সা'দ এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। কতিপয় মুসলিম সৈনিকের ভুলের কারণে নিশ্চিত বিজয় যখন পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন মুষ্টিমেয় যে ক'জন সৈনিক নিজেদের জীবনে ঝুঁকি নিয়ে নবী করীম ﷺ-কে ঘিরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন, সা'দ (রা) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইমাম বুখারী এ ঘটনা সা'দের (রা) জবানেই বর্ণনা করেছেন :

'উহুদের দিনে নবী করীম ﷺ তাঁর তূনীর আমার সামনে ছড়িয়ে দিলেন এবং বললেন : তীর মার! আমার মা-বাবা তোমার প্রতি উৎসর্গ হোক।' ইবনে সা'দ আরও বলেছেন : 'ঘটনাক্রমে একটি তূনীর ফলা ছিল না। সা'দ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটাতো খালি। বললেন : ওটাও ছুঁড়ে দাও।'

সা'দের এক ভাই 'উমাইর বদর যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। উহুদের যুদ্ধে সা'দ (রা) যখন কাফিরদের প্রবল হামলা থেকে নবী করীম ﷺ-কে রক্ষার জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছেন, ঠিক তখনই তাঁর অন্য ভাই নরাধম 'উতবার নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে প্রিয় নবীর মুখ আহত হয় এবং একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। সা'দ (রা) প্রায়ই বলতেন : কাফিরদের অন্য কাউকে হত্যার এত প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না যেমন ছিল 'উতবার প্রতি। কিন্তু যখন আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনলাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের চেহারা মোবারক রক্ত-রঞ্জিত করেছে, তার ওপর আল্লাহর গজব পতিত হবে, তখন তার হত্যার আকাঙ্ক্ষা আমার নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং আমার অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসে।

উহুদের যুদ্ধে তিনি এক অস্বাভাবিক দৃশ্য অবলোকন করলেন। তিনি বলেন : 'উহুদের দিন আমি নবী করীম ﷺ-এর ডানে ও বামে ধবধবে সাদা দু'ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। কাফিরদের সাথে তারা প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এর পূর্বে বা পরে আর কখনও আমি তাদেরকে দেখিনি।'

উহুদের দু'বছর পর খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং একজন দুরাম্বর কাফির ঘোরসওয়ারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তার চোখ এমনভাবে এফোঁড় ওফোঁড় করেন যে, তা দেখে নবী করীম ﷺ হঠাৎ হেসে ওঠেন। খন্দকের যুদ্ধে সালা পর্বতের এক উপত্যকায় নবী করীম ﷺ একাকী শুয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁবুর মধ্য অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন :কে? জবাব পেলেন : সা'দ– আবু ওয়াক্‌কাসের পুত্র। কি জন্য এসেছ? বললেন :সা'দের হাজার জীবন অপেক্ষা আল্লাহর রাসূল হচ্ছেন তার প্রিয়তম। এ অন্ধকার ঠাণ্ডা রাতে আপনার বিষয়ে আমার ভীষণ জাগে। তাই পাহারার জন্য নিয়োজিত হয়েছি। আল্লাহর নবী বললেন : সা'দ! আমার চোখ খোলা ছিল। আমি আশা করছিলাম আজ যদি কোন নেককার বান্দা আমার হিফাজত করত!

মহানবীর দোয়া : হিজরী দশম সনে নবী করীম ﷺ-এর বিদায় হজ্জের সঙ্গী ছিলেন সা'দও। কিন্তু হজ্জের পূর্বেই মক্কায় তিনি দারুণভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে

পড়েন। জীবনের আশা এক প্রকার ছেড়ে দিলেন। এ সময় নবী করীম ﷺ মাঝে মাঝে এসে তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন। সা'দ বললেন : একদিন তিনি আমার সাথে কথা বলার পর আমার কপালে হাত রাখলেন। তারপর চেহারার ওপর হাতের স্পর্শ বুলিয়ে পেট পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! আপনি সা'দকে আরোগ্য দান করুন, তার হিজরতকে পূর্ণতা দান করুন। অর্থাৎ হিজরতের স্থান মদীনাতেই তার মৃত্যুদান করুন। সা'দ বলতেন, 'নবী করীম ﷺ-এর হাতের সে শীতল স্পর্শ ও প্রশান্তি আজও আমার অন্তরে অনুভব হতে থাকে।' তিনি সুস্থ হয়ে আরও পঁয়তাল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন।

সেনাপতি নিয়োগ : আবু 'উবাইদা ও মুসান্নার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পারস্যের কিসরা বাহিনীকে পরাজিত করে ইরাক জয় করেন। ইরাক এখন মুসলিম বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে কিসরার আত্মীয়-স্বজন নিজেদের সব ধরনের মতবিরোধ ভুলে গিয়ে ইয়াজদিগিরদকে সিংহাসনে বসিয়ে সেনাপতি রুস্তমের নেতৃত্বে নতুন করে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের জন্য বিরাট বাহিনী সংঘটিত করেছে। ওমর এ প্রস্তুতির খবর পেলেন। তিনি নিজেই মুসান্নার সাহায্যে একটি বাহিনী নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু মজলিসে শূরার অনুমতি না পেয়ে শূরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সা'দকে পাঠালেন এবং তাঁকেই নির্বাচিত করলেন ইরানী ফ্রন্টের সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সা'দ (রা) মদীনা থেকে তাঁর বাহিনী নিয়ে কাদেসিয়া গমন করলেন। তাঁর গমনের পূর্বেই মুসান্না মারা যায়। এ কাদেসিয়া প্রান্তরে সেনাপতি সা'দের নেতৃত্বে মুসলিম ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে এক চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বিশাল পারস্য বাহিনীর প্রতিরোধ ব্যূহ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এবং একের পর এক তারা যুদ্ধে পরাজয়ের স্বাদ বরণ করে।

সাসানী সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনের পথে মুসলিম বাহিনী 'বাহ্‌রাসীর' দখল করে রয়েছে। এ বাহ্‌রাসীর ও মাদায়েনের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ দিজলা নদী প্রবাহিত। সা'দ সংবাদ পেলেন, শাহানশাহ ইয়াজদিগিরদ রাজধানী মাদায়েন থেকে সব মূল্যবান সম্পদ সরিয়ে নিচ্ছে। সা'দ সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুত মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হলেন। দিজলা তীরে এসে দেখলেন, ইরানীরা নদীরা পুলটি পূর্বেই বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। এ দিজলার তীরে তিনি মুসলিম মুজাহিদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণটির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

'ওহে আল্লাহর বান্দারা! দ্বীনের সিপাহীরা! সাসানী শাসকরা আল্লাহর বান্দাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে মিথ্যা ও বানোয়াট কথার মাধ্যমে প্রতারিত করে

অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা করতে বাধ্য করেছে। তাদের ঘামঝরা কষ্টোপার্জিত সম্পদ নিজেদের মধ্যে পুঞ্জিভূত করে রেখেছে। তোমরা যখন তাদের পরিত্রাণদাতা হিসেবে উপস্থিত হয়েছ তখন তারা পালাবার পথ খুঁজছে এবং দরিদ্র জনসাধারণের ধন সম্পদ ঘোড়া ও গাধার পিঠে বোঝাই করেছে। আমরা কখনো তাদের এমন সুযোগ দেব না।

তাদের বাহনের ওপর বোঝাইকৃত ধন-ভাণ্ডার যাতে আমরা ছিনিয়ে নিতে না পারি এজন্য তারা পুল ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু ইরানীরা আমাদের বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তারা জানে না আল্লাহর ওপর ভরসাকারীরা, মানবতার সেবকরা, পুল বা নৌকার ওপর ভরসা করে না। আমি পরম দয়ালু-দাতা আল্লাহর নামে আমার ঘোড়াটি নদীতে নামিয়ে দিলাম। তোমরা আমার অনুসরণ কর। একজনের পেছনে অন্যজন, একজনের পাশে অন্যজন সারিবদ্ধভাবে তোমরা দিজলা নদী পার হও। আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য ও রক্ষা করুন।'

বক্তৃতা শেষ করে সা'দ বিসমিল্লাহ্ বলে নিজের ঘোড়াটি নদীতে নামিয়ে দিলেন। অন্য মুজাহিদরাও তাঁদের সেনাপতিকে অনুসরণ করতে লাগলেন। নদী ছিল অশান্ত। কিন্তু আল্লাহর সিপাহীদের সারিতে একটুও বিশৃঙ্খলা রূপ দেখা দিল না। তাঁরা সারিবদ্ধভাবে নদী পার হয়ে অপর তীরে পৌঁছলেন। ইরানী সৈন্যরা একটু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতেছিল। তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। অবলীলাক্রমে তারা চিৎকার দিয়ে উঠল, 'দৈত্য আসছে, দানব আসছে। পালাও পালাও।'

মুসলিম মুজাহিদদের এ আকস্মিক হামলা বাদশাহ্ ইয়াজদিগিরদ বহু ধনরত্ন ফেলে মাদায়েন ছেড়ে হালওয়ানের দিকে পলায়ন শুরু করে। সা'দ নির্জন শ্বেত দালানে প্রবেশ করলেন। পরিবেশ ছিল ভয়াবহ। দালানের প্রতিটি কক্ষ ছিল যেন শিক্ষা ও উপদেশের স্মারক। সা'দের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সূরা দুখানের আয়াতগুলো যার অর্থ–

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ۙ وَّنَعْمَةٍ
كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۙ كَذٰلِكَ قف وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ـ

তারা পেছনে ছেড়ে গিয়েছিল কত বাগান ও প্রস্রবণ, কত শস্য ক্ষেত্র ও সুরম্য দালান এবং কত বিলাস-উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত! এমনটিই ঘটেছিল এবং আমি এ সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য সম্প্রদায়কে।

(সূরা দুখান : আয়াত-২৫-২৮)

সা'দ শ্বেত দালানে প্রবেশ করে আট রাকা'আত 'সালাতুল ফাতহ' আদায় করেন। তারপর তিনি ঘোষণা দেন, এ শাজী নির্মাণ আজ জুমু'আর জামা'আত অনুষ্ঠিত হবে। অতপর মিম্বর তৈরি করে জুমু'আর সালাত আদায় করেন। এটাই ছিল পারস্যে প্রথম জুমু'আর সালাত।

মাদায়েন বিজয়ের পর খলিফা ওমর (রা) সেনাপতি সা'দকে আদেশ করেন, তিনি নিজে যেন ইরানীদের পেছনে ধাওয়া না করেন, বরং এ কাজের জন্য অন্য কাউকে নিয়োগ করে দায়িত্ব দেন। অতপর খলিফার আদেশে তিনি আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, প্রশাসনের পুনর্গঠন, ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং নও মুসলিমদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে আত্মনিয়োগ করেন। যে মাদায়েন ছিল শত শত বছর ধরে অগ্নি উপাসকদের লীলাভূমি এবং যে মাদায়েন কখনও শোনেনি এক আল্লাহর নাম, সেখানে প্রথম বারের মতো সা'দ নির্মাণ করেন এক জামে মসজিদ। ইরানের অন্যান্য শহরেও তিনি মসজিদ তৈরি করেন। আরব মুসলমানদের বসবাসের জন্য কুফা শহরের সম্প্রসারণ করেন। ইরাকের বসরা শহরের স্থপতিও ছিলেন তিনি।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : খলিফা উমার সা'দকে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। কিছু দিন পর তাঁর বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক কুফাবাসীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেন। কুফায় সা'দ নিজের জন্য যে অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন, 'ওমরের (রা) নির্দেশে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা মদীনা থেকে কুফা প্রত্যাবর্তন করে তাতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেন।

(মাজমূ' ফাতাওয়া-ইবনে তাইমিয়া, খণ্ড ৩৫ পৃঃ ৪০)

সা'দের বিরুদ্ধে উসামা ইবনে কাতাদা নামক কুফার যে লোকটি খলিফা ওমরের কাছে কসম করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল, সা'দ তার ওপর বদদোয়া করে তিনটি জিনিস তার জন্য মহান আল্লাহর কাছে কামনা করেন : আল্লাহ যেন তাকে দীর্ঘজীবী করেন, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত করেন এবং তার সত্তাকে ফিতনার শিকারে পরিণত করেন। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, তাঁর এ দু'আ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ তিনি তো ছিলেন 'মুজতাজাবুদ দাওয়াহ'। স্বয়ং নবী করীম ﷺ তাঁর জন্য দু'আ করেছেন। : 'হে আল্লাহ,! আপনি সা'দের দোয়া কবুল করুন, যখন সে দোয়া করবে।

'উমার (রা) সা'দের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ যে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন তা কিন্তু সঠিক নয়। তাই তিনি বলেছেন : 'আমি সাদকে রাষ্ট্র

প্রশাসনে অযোগ্য বা তার প্রতি আস্থাহীনতার কারণে বহিষ্কার করিনি।' (বুখারী : কিতাবুল মানাকিব) সা'দ যে খলিফা ওমরের মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট যে বোর্ডটি গঠন করে দিয়ে যান তাতে সা'দের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। সা'দ সম্পর্কে তাঁর শেষ বাণী ছিল : 'যদি খিলাফতের দায়িত্ব সাদ পেয়ে যান, তাহলে তিনি তার উপযুক্ত। আর তা যদি না হয়, তবে যিনি খলিফা হবেন তিনি যেন তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেন।' (বুখারী : কিতাবুল মানাকিব ও আল-ইসাবা)। উসমান (রা) তাঁর খিলাফতের প্রথম বছরেই পুনরায় সা'দকে কুফার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দান করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে কুফার কোষাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও তাঁর মধ্যে কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে খলিফা সাদকে প্রত্যাহার করেন।

ইবনে সাবার আনসারী হাঙ্গামাবাজরা খলিফা উসমানকে বেষ্টন করার উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করেছে। খলিফা মসজিদে নববীতে জুমু'আর সালাতের খুতবার মধ্যে হাঙ্গামাবাজদের কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করলেন। তারাও পাথর নিক্ষেপ করে খলিফাকে আহত করে। এ সময় তাদের প্রতিরোধে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে সাদ। তারপর অন্যান্য সাহাবীরা একযোগে উঠে তাদের পিছু হঠাতে বাধ্য করে।

বিদ্রোহীদের হাতে উসমান শাহাদাত বরণ করেন। সাদ তখন মদীনায়। মদীনাবাসীরা আলীকে খলিফা নির্বাচিত করে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলেন। আলী (রা)-এর হাতে বাই'আতের জন্য জনগণ যখন সাদের বাড়িতে গেল, তিনি তাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন : 'যতক্ষণ না সব মানুষ বাই'আত গ্রহণ করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বাইআত গ্রহণ করব না। তবে আমার পক্ষ থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।'

উসমানের হত্যাকাণ্ডের পর ইসলামের ইতিহাসে যে বেদনাদায়ক অধ্যায়ের সূচনা হয় তার আলোচনা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে অসম্ভব। তবে এ সময় সা'দের ভূমিকা বুঝার জন্য এতটুকু ইঙ্গিত প্রয়োজন যে, সে সময় ইসলামী উম্মাহ তিনটি দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল আলীর পক্ষে, একদল তাঁর বিপক্ষে এবং একদল নিরপেক্ষ। আলীর পক্ষে, বিপক্ষের উভয় দলেই যেমন বিশিষ্ট সাহাবীরা ছিলেন, তেমনিভাবে ছিলেন নিরপেক্ষ দলেও। তাঁরা কোন মুসলমানের পক্ষে-বিপক্ষে

তরবারি উত্তোলনে সঠিক মনে করেননি। এ কারণে আমরা সা'দকে দেখতে পেয়েছি তিনি উট বা সিফফিনের যুদ্ধে কোন পক্ষেই যোগ দেননি, তখন তিনি মদীনায় নিজ ঘরে অবস্থান করছেন।

মোটকথা, উসমানের শাহাদাতের পর তিনি নির্জনতা অবলম্বন করেন। একবার তিনি তাঁর উটের আস্থাবলে তাঁর পুত্র ওমরকে আসতে দেখে বললেন : 'আল্লাহ এ অশ্বারোহীর অনিষ্ট থেকে আমাকে হেফাজত করুন।' অতঃপর ওমর এসে পিতাকে বললেন : 'আপনি উট ও ছাগলের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন, আর এদিকে জনগণ রাষ্ট্রীয় ফাসাদে লিপ্ত।' সা'দ পুত্রের বুকের উপর হাত দিয়ে আঘাত করে বললেন : 'চুপ কর!' আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ্ ভালোবাসেন নির্জনবাসী, পরহেজগার এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যে মানুষের রাগ বিরাগের তোয়াক্কা করে না, তাকে।

সা'দ আলীর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে পুনরায় তাঁর দলত্যাগী খারেজীদের ফাসিক বলে ধারণা করতেন। উসমানের শাহাদাতের পর তাঁর পুত্র ওমর তাঁর কাছে এসে বললেন : খিলাফাত পরিচালনার জন্য এখন উম্মাতে মুসলিমার একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। আমাদের ধারণায় আপনিই এর উপযুক্ত ব্যক্তি। এতটুকু বলতেই তিনি বলে ওঠেন : 'থাক, হয়েছে। আমাকে আর উৎসাহ দিতে হবে না।'

মৃত্যুবরণ : সাদ মদীনা থেকে দশ মাইল দূরে আকীক পাহাড়ে কিছুদিন রোগাক্রান্ত থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন। জীবনীকারদের মধ্যে তাঁর মৃত্যুক্ষণ তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে হিজরী ৫৫ সনে ৮৫ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয় বলে সর্বাধিক অভিমত রয়েছে। ইবনে হাজার তাঁর 'তাহজীব' গ্রন্থে এ মতই সমর্থন করেছেন। গোসল ও কাফনের পর লাশ মদীনায় নিয়ে আসা হয়। মদীনার তৎকালীন গভর্নর মারওয়ান জানাযার ইমামতি করেন। সহীহ্ মুসলিমের একাধিক বর্ণনার সূত্রে তাঁর জানাযার বিষয়টি বিস্তারিত জানা যায়।

সা'দের ইন্তিকালের পর উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ও অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহ্হারাহগণ বলে পাঠালেন, তাঁর লাশ মসজিদে নিয়ে আসা হোক, যাতে আমরা জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারি। কিন্তু লোকেরা লাশ মসজিদে নেয়া যেতে পারে কিনা এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল। আয়েশা (রা) একথা জানতে

পেরে বললেন : 'তোমরা এত শ্রীঘ্রই ভুলে যাও? নবী করীম ﷺ তো সুহাইল ইবনে বায়গদার জানাযা এ মসজিদেই আদায় করেছেন।' অতঃপর লাশ উম্মুহাতুল মু'মিনীনের কক্ষের কাছে আনা হল এবং তাঁরা জানাযার সালাত আদায় করলেন।

অসিয়ত : ইন্তিকালের সময় সা'দ (রা) বহু অর্থ-সম্পদের মালিক ছিলেন। তা সত্বেও তিনি একটি অতি পুরাতন পশমী জুববা চেয়ে নিয়ে বললেন : 'এ দিয়েই তোমরা আমাকে কাফন দেবে। এ জুব্বা পরেই আমি বদর যুদ্ধে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আমার একান্ত ইচ্ছা, এটা নিয়েই আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত।'

সা'দের সন্তান মুস'আব বললেন : আমার পিতার শেষ সময়ে তাঁর মাথাটি আমার কোলের ওপর ছিল। তাঁর মুমূর্ষু অবস্থা অবলোকন করে আমার চোখে পানি আসল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : বৎস! কাঁদছ কেন? বললাম : আপনার এ অবস্থা দেখে। বললেন : 'আমার জন্য কান্না করো না। আল্লাহ কখনো আমাকে শাস্তি প্রদান করবেন না, আমি জান্নাতবাসী। আল্লাহ ঈমানদেরকে তাদের নেক আমলের পুরষ্কার প্রদান করবেন এবং কাফিরদের নেক আমলের বিনিময়ে তাদের শাস্তি লাঘব করবেন।' (হায়াতুস সাহাবা–৩/৫৪)

মর্যাদা : রাসূলে করীম ﷺ খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীদের নিকট সা'দের মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল অতি উচ্চে। তাঁরা তাঁর অভিমতকে যে অত্যন্ত গুরুত্ব সাথে গ্রহণ করতেন, অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এটি জানা যায়। একবার সা'দ মোজার ওপর মাসেহ বিষয়ক একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর তাঁর পিতা ওমর ফারুক (রা) থেকে হাদীসটির সত্যতা যাচাই করতে চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হাদীসটি কি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে শুনছো? ওমর বললেন : হ্যাঁ । সা'দ যখন তোমাদের কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করে, তখন সে বিষয়ে অন্য কারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।'

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন : নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে চার জন ছিলেন সর্বাধিক কঠোর : ওমর, আলী, যুবাইর, ও সা'দ রাদিআল্লাহু আনহুম।

নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় বিলালের অনুপস্থিতিতে সা'দ তিনবার আযান দিয়েছেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'আমার সংগে বিলালকে না দেখলে তুমি আযান দেবে।' (হায়াতুস সাহাবা ৩/১১৬)

হাদীস বর্ণনা : নবী করীম ﷺ থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর কাছ থেকে তাঁর সন্তানেরা যেমন, ইবরাহীম, আমের, মুস'আব, মুহাম্মদ, আয়েশা এবং বিশিষ্ট সাহাবীরা, যেমন, আয়েশা, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, জাবির (রা) এবং বিশিষ্ট তাবেয়ীরা, যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আবু উসমান আন-নাহদী, কায়িস ইবনে আবু হাযিম, আলকামা, আহনাফ ও অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আল-ইসাবা ৩/৩৩)

কাব্যপ্রতিভা : সা'দের মধ্যে প্রচুর কাব্য প্রতিভাও ছিল। প্রাচীন সূত্রগুলোতে তাঁর কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে। ইবনে হাজার 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে কয়েকটি পঙক্তি উল্লেখ করেছেন।

সা'দের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' অর্থাৎ দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্যতম এবং তিনি এ দলের সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি দুনিয়া থেকে আখিরাতে পাড়ি দেন।

হাদীসের কিতাবসমূহে সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাসের নাম কমপক্ষে ২৫৯৭ বার দৃশ্য হয়। তন্মধ্যে মুয়াত্তাতে ২০, বুখারীতে ৩০, মুসলিমে ৪২, আবু দাউদে ১৭ বার।

৯. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)

সাঈদ (রা) বলেন, তখন মুসলিম বাহিনীর ভেতর থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আবু 'উবাইদাকে বলল, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ মুহূর্তে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব। নবী করীম ﷺ-এর কাছে পৌঁছে দিতে হবে এমন কোন বাণী কি আপনার নিকট রয়েছে? আবু উবাইদা বললেন : 'হ্যাঁ, আছে। তাঁকে আমার ও মুসলিমদের সালাম পৌঁছে দিয়ে বলবেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতিপালক আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা আমরা সত্যই পেয়েছি।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে আশারায় মুবাশ্‌শারা বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ ـ

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ জান্নাতী।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবদুর রহমান বিন আওফ– ৩/২৯৪৬)

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম সাঈদ, উপনাম আবুল আ'ওয়ার। পিতা– যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল বিন আব্দুল উজ্জা বিন রিবাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন জারবাহ্ বিন আদী কাব বিন লুই কুরাশী আদরি। মাতা– ফাতিমা বিনতু হাজাবাহ্ বিন মালীহ্ খোযায়ী।

নসব নামা : উর্ধ্ব পুরুষ কা'ব ইবনে লুই-এর মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে।

পিতৃ পরিচয় : সাঈদের পিতা যায়েদ ছিলেন জাহিলী যুগের মক্কার মুষ্টিমেয় সে কল্যাণকামী ব্যক্তিদের একজন যাঁরা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই শিরক ও পৌত্তলিকতা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখেন, যাবতীয় পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকেন। এমন কি মুশরিকদের হাতে যবেহ করা জন্তুর গোশতও পরিহার করতেন। একবার নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে 'বালদাহ' উপত্যকায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে খাবার নিয়ে এলে তিনি খেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। যায়েদকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদেরকে বলেন : 'তোমাদের দেব-দেবীর নামে যবেহকৃত পশুর গোশত আমি খাই না।'

তৎপরতা : আসমা (রা) বলেন : একবার আমি যায়েদকে দেখলাম, তিনি কা'বার দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে বলছেন, ওহে কুরাইশ বংশের লোকেরা! আল্লাহ্‌র শপথ, আমি ছাড়া দ্বীনে হানীফের ওপর তোমাদের মধ্যে আর দ্বিতীয়টি কেউ নেই।

জাহিলী যুগে সাধারণত: কন্যা সন্তান জীবন্ত কবর দিত। কোথাও কোন কন্যা সন্তান হত্যা বা সমাহিত করা হচ্ছে শুনলে যায়েদ তার অভিভাবকের কাছে চলে যেতেন এবং সন্তানটিকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করতেন। তারপর সে বড় হলে তার পিতার নিকট নিয়ে গিয়ে বলতেন, ইচ্ছে করলে এখন তুমি নিজ দায়িত্বে নিতে পার অথবা আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিতে পার।

কুরাইশরা তাদের কোন একটি উৎসব পালন করছে। মানুষের ভিড় থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়িল তা গভীরভাবে অবলোকন করেছেন। তিনি দেখছেন, পুরুষেরা তাদের মাথায় বেঁধেছে মূল্যবান রেশমী পাগড়ী, গায়ে দিয়েছেন মূল্যবান ইয়ামানী চাদর। আর নারী ও শিশুরা পরেছে মূল্যবান কাপড় ও অলঙ্কারাদী। তিনি আরও দেখছেন, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা গৃহপালিত পশুকে মূল্যবান সাজে সুসজ্জিত করে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে তাদের দেব-দেবীর সামনে বলি দেয়ার জন্য।

তিনি কা'বার দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন : 'হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! এ ছাগলগুলো সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা। তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে তাদের পান করান, যমীনে ঘাস উৎপাদন করে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেন। আর তোমরা অন্যের নামে সেগুলো যবেহ কর? আমি তোমাদেরকে একটি মূর্খ সম্প্রদায়রূপে দেখতে পাচ্ছি।

এ কথা শ্রবণ করে তাঁর চাচা ও উমার ইবনুল খাত্তাবের পিতা আল খাত্তাব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দেহে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বলল–

তোর ধ্বংস হোক! সর্বদা আমরা তোর মুখ থেকে এ জাতীয় অবান্তর কথা শুনে এতদিন সহ্য করে আসছি। এখন আমাদের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তারপর তার গোত্রের বখাটে যুবকদেরকে উত্তেজিত করে তুলল তাঁকে নির্যাতনও কষ্ট দেয়ার জন্য '। অবশেষে তিনি বাধ্য হলেন মক্কা ত্যাগ করে হিজরা পর্বতে আশ্রয় নিতে। তাতেও সে ক্ষান্ত হয়নি। যাতে গোপনেও তিনি মক্কায় প্রবেশ করতে না পারেন, সেদিকে সদাসর্বদা দৃষ্টি রাখর জন্য একদল কুরাইশ যুবককে সে দায়িত্ব অর্পণ করেন।

অতঃপর যায়েদ ইবনে আমর কুরাইশদের দৃষ্টি এড়িয়ে ওয়ারাকা ইবনে নাওফিল, আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ, উসমান ইবনুল হারিস এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্র ফুফু উমাইমা বিনতু 'আব্দুল মুত্তালিবের সাথে গোপনে মিলিত হলেন। আরববাসী যেসব পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত সে বিষয়ে তিনি তাদের সাথে মত বিনিময় করলেন। যায়েদ তাঁদেরকে বললেন :

'আল্লাহ্র শপথ আপনারা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, আপনাদের এ জাতি কোন ভিত্তির ওপর নেই। তারা দ্বীনে ইবরাহীমকে বিকৃত করে ফেলেছে, তার বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে। আপনারা যদি এর থেকে মুক্তি চান, নিজেদের জন্য একটি দ্বীন সন্ধান করুন।'

অতপর এ চার ব্যক্তি ইয়াহুদী, নাসারা ও অন্যান্য ধর্মের ধর্মগুরুদের কাছে আগমন করলেন দ্বীনে ইবরাহীম তথা দ্বীনে হানীফ সম্পর্কে জানার জন্য। ওয়ারাকা ইবনে নাওফিল খ্রিস্ট ধর্ম কবুল করলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ উসমান ইবনুল হারিস কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। আর যায়েদ ইবনে 'আমর ইবনে নুফায়িলের জীবনে ঘটে গেল এক চরমপ্রদ ঘটনা প্রবাহ। আমরা সে ঘটনার আলোকপাত তাঁর মুখ দিয়েই উপস্থাপন করছি।

'আমি ইয়াহুদী ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জানলাম; কিন্তু সে ধর্মে মানসিক শান্তি পাওয়ার মতো তেমন কিছু না পেয়ে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম। এক পর্যায়ে আমি শামে (সিরিয়া) এসে উপস্থিত হলাম। আমি পূর্বেই শুনেছিলাম সেখানে একজন রাহিব' 'সংসারত্যাগী ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি আসমানী কিতাবে অভিজ্ঞ। আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আমার কাহিনী তুলে ধরলাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন– 'ওহে মক্কাবাসী ভাই! আমার মনে হচ্ছে আপনি দ্বীনে ইবরাহীম অনুসন্ধান করছেন।'

বললাম, 'হ্যাঁ। আমি তাই সন্ধান করছি।'

তিনি বললেন : 'আপনি যে দ্বীনের খোঁজ করছেন, বর্তমানে তা পাওয়া দুষ্কর। তবে সত্য তো আপনার শহরে রয়েছে। আল্লাহ্ আপনার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি দ্বীনে ইবরাহীম পুনরুজ্জীবিত করবেন। আপনি যদি তাকে পান তবে তাঁর অনুসরণ করবেন।'

যায়েদ আবার মক্কার দিকে রওয়ানা করলেন। প্রতিশ্রুত নবীকে সন্ধান করে বের করার জন্য দ্রুত কদমে এগিয়ে চললেন।

তিনি যখন মক্কা থেকে বেশ কিছু দূরে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা নবী মুহাম্মদকে ﷺ হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে দুনিয়াতে প্রেরণ করলেন। কিন্তু যায়েদ তাঁর সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হলেন। কারণ, মক্কায় পৌঁছার পূর্বে একদল বেদুঈন ডাকাত তাঁর ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে। এভাবে তিনি নবী করীম ﷺ-এর দর্শন লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ كُنْتَ حَرَّمْتَنِىْ مِنْ هٰذَا الْخَيْرِ فَلاَ تَحْرِمْ مِنْهُ اِبْنِى سَعِيْدًا -

'হে আল্লাহ! যদিও এ কল্যাণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন, আমার পুত্র সাঈদকে এ থেকে আপনি বঞ্চিত করবেন না।

আল্লাহ তা'আলা যায়েদের এ প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। নবী করীম ﷺ লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। প্রথম ভাগেই যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ ওপর ঈমান গ্রহণ করলেন তাঁদের মধ্যে সাঈদও একজন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, সাঈদ প্রতিপালিত হয়েছিলেন

এমন এক ঘরে, যে ঘর ঘৃণাভরে প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যাত করেছিল কুরাইশদের সকল কুসংস্কার ও পথভ্রষ্টতাকে পদদলিত করে। তাঁর পিতা ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর সারা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন সত্যের অনুসন্ধানে। সাঈদ একাই ইসলাম গ্রহণ করেননি, সাথে তাঁর স্ত্রী ওমর ইবনে খাত্তাবের বোন ফাতিমা বিনতুল খাত্তাবও ইসলাম কবুল করেন।

নির্যাতনের শিকার : ইসলাম গ্রহণের কারণে কুরাইশ বংশের এ যুবকও অন্যদের মতো জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হন। কুরাইশরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফেরানো দূরে থাক, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে বরং কুরাইশদের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন ইসলামের দিকে। তিনি হলেন তাঁর শ্যালক 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা উমারকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসেন।

ইসলামের খিদমত : সাঈদ তার যৌবনের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেন ইসলামের খিদমতে। তিনি যখন ইসলাম কবুল করেন, তখন তাঁর বয়স বিশ বছরও অতিক্রম করেনি। একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া নবী করীম ﷺ-এর সাথে অন্য সব যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিরিয়ায় অবস্থান করার কারণে তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান করতে সক্ষম হননি। তবে বদর যুদ্ধের গণিমতের অংশ তিনি লাভ করেছিলেন। এ হিসেবে তিনি প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে বদর বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন।

বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা : পারস্যের কিসরা ও রোমের কাইসারের সিংহাসনে পদানত করার বিষয়ে তিনি মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিমদের সাথে তাদের যতগুলো লড়াই সংঘটিত হয় তার প্রত্যেকটিতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ইয়ারমুক যুদ্ধেই তিনি তাঁর বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি নিজেই বলেন, "ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমরা ছিলাম ছাব্বিশ হাজার বা তার কাছাকাছি। অন্যদিকে রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার। তারা অতি দৃঢ় পদক্ষেপে পর্বতের মতো অটল ভঙ্গিতে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। তাদের অগ্রভাগে ছিল বিশপ ও পাদ্রী-পুরোহিতদের বিরাট বাহিনী। হাতে তাদের ক্রুশ খচিত পতাকা, মুখে প্রার্থনা গাই। পেছন থেকে তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাচ্ছিল বিশাল সেনাবাহিনী। তাদের সে সম্মিলিত কণ্ঠস্বর তখন মেঘের গর্জনের মতো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল চারদিকে।

মুসলিম বাহিনীর এ ভয়াবহ দৃশ্য তাদের বিপুল সংখ্যা দেখে আচর্যান্বিত হয়ে গেল। ভয়ে তাদের অন্তরও কিছুটা কেঁটে উঠল, সেনাপতি আবু উবাইদা তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং মুসলিম সৈন্যদের জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে এক কালজয়ী বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদেরকে শক্তিশালী করে তুলবেন।

আল্লাহর বান্দারা! ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য হল কুফরী থেকে মুক্তির একমাত্র পথ, প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের পথ এবং অপমান ও লজ্জার প্রতিরোধক। তোমরা তীর বর্শা শাণিত করে ঢাল হাতে তৈরি হয়ে যাও। অন্তরে আল্লাহর যিকর ছাড়া অন্য সব চিন্তা থেকে মুছে ফেল। সময় হলে আমি তোমাদের আদেশ করব ইনশাআল্লাহ।"

সাঈদ (রা) বলেন, তখন মুসলিম বাহিনীর ভেতর থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আবু 'উবাইদাকে বলল, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ মুহূর্তে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব। নবী করীম ﷺ-এর কাছে পৌঁছে দিতে হবে এমন কোন বাণী কি আপনার নিকট রয়েছে? আবু উবাইদা বললেন : 'হ্যাঁ, আছে। তাঁকে আমার ও মুসলিমদের সালাম পৌঁছে দিয়ে বলবেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রতিপালক আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা আমরা সত্যই পেয়েছি।'

সাঈদ (রা) বলেন, "আমি তাঁর কথা শুনামাত্রই দেখতে পেলাম সে তার তরবারি কোষমুক্ত করে আল্লাহর দুশমনের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল। এ অবস্থায় আমি তাড়াতাড়ি মাটিতে লাফিয়ে পড়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে অগ্রসর হলাম এবং বর্শা হাতে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। শত্রুপক্ষের প্রথম যে ঘোড় সওয়ার আমাদের দিকে এগিয়ে এলো আমি তাকে আঘাত করলাম। তারপর অসীম সাহসিকতার সাথে শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তর থেকে সব ধরনের ভয়ভীতি একেবারেই দূরিভূত করে দিলেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালাল এবং তাদেরকে চিরতরে পরাজিত করল।"

দিমাশক অভিযান : দিমাশক অভিযানে সাঈদ ইবনে যায়েদ অংশগ্রহণ করেন। দিমশাক জয়ের পর আবু 'উবাইদা তাকে সেখানকার ওয়ালী নিয়োগ করেন। এভাবে তিনি হলেন দিমাশকের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম ওয়ালী। কিন্তু জিহাদের প্রতি প্রবল আগ্রহের দরুণ এ পদ অর্জন করে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। আবু

উবাইদাহ লিখলেন : 'আপনারা জিহাদ করবেন, আর আমি বঞ্চিত হবো, এমন আত্মত্যাগ ও উৎসর্গ আমি করতে পারি না।' চিঠি পৌঁছার সাথে সাথে কাউকে আমার স্থলে প্রেরণ করুন। আমি অচিরেই আপনার কাছে পৌঁছে যাচ্ছি। আবু উবাইদা বাধ্য হয়ে ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে দিমাশকের ওয়ালী নিযুক্ত করলেন এবং সাঈদ জিহাদের ময়দানে প্রত্যাবর্তন করলেন।

আশ্চর্যময় ঘটনা : উমাইয়া যুগে সাঈদ ইবনে যায়েদকে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্যময় ঘটনা ঘটে দীর্ঘদিন ধরে মদীনাবাসীদের মুখে ঘটনাটি শোনা যেত। ঘটনাটি হল, আরওয়া বিনতে উওয়াইস নীচের এক নারী দুর্নাম রটাতে থাকে যে, সাঈদ ইবনে যায়েদ তার ভূমির একাংশ জবরদস্তি করে নিজ ভূমির সাথে দখল করে নিয়েছেন যেখানে সেখানে সে একথা বলে বেড়াতে লাগল। এক পর্যায়ে সে মদীনার ওয়ালী মারওয়ান ইবনুল হিকামের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করল। বিষয়টি যাচাই করে দেখার জন্য মারওয়ান কতিপয় লোককে সাঈদের কাছে প্রেরণ করলেন। নবী করীম ﷺ-এর সাহাবী সাঈদের জন্য বিষয়টি ছিল খুবই বেদনাদায়ক। তিনি বললেন : "তারা মনে করে আমি তার ওপর জুলুম করেছি। কীভাবে আমি জুলুম করতে পারি? আমি তো নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি–

مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জুলুম করে নেবে, কিয়ামতে সাত তবকা যমীন তার গলায় লটকায়ে দেয়া হবে।'

হে আল্লাহ! সে ধারণা করেছে আমি তার ওপর জুলুম করেছি। যদি সে মিথ্যুক হয়, তার চোখ অন্ধ করে দাও, যে কূপ নিয়ে সে আমার সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত, তার মধ্যেই তাকে নিক্ষেপ কর এবং আমার পক্ষে এমন আলোক প্রকাশ করে দাও যাতে মুসলিমদের মাঝে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমি তার ওপর কোন অত্যাচার জুলুম করিনি।"

এ ঘটনার পর কিছু দিন অতিক্রম না করতেই আকীক উপত্যকা এমনভাবে প্লাবিত হল যে অতীতে আর কখনো তেমনটি হয়নি। ফলে দু' যমীনের মধ্যখানের বিতর্কিত অদৃশ্য চিহ্নটি এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, মুসলিমরা

তা অবলোকন করে বুঝতে সক্ষম হল সাঈদ সত্যবাদী। তারপর একমাস পার না হতেই মহিলাটি অন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় একদিন সে তার ভূমিতে পায়চারী করতে করতে বিতর্কিত কূপটির মধ্যে পড়ে গিয়ে মারা যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, 'আমরা শুনতাম লোকেরা কাউকে অভিশাপ করতে গেলে বলত: আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুন যেমন অন্ধ করেছেন আরওয়াকে। এ ঘটনায় আশ্চর্য হওয়ার তেমন কিছু নেই, কারণ নবী করীম ﷺ তো বলেছেন : 'তোমরা মাযলুমের দোয়া থেকে দূরে থাক। কারণ, সেই দোয়া আর আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।' এ যদি হয় সব মাযলুমের অবস্থা, তাহলে 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জনের একজন সাঈদ ইবনে যায়েদের মতো মাযলুমের দোয়া কবুল হওয়া তেমন আর আশ্চর্য কি?

আবু নু'আঈম, রিবাহ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণনা করেছন : মুগীরা ইবনে শু'বা একটি বড় মসজিদে বসেছিলেন। তখন তাঁর ডানে বামে বসা ছিল কুফার কতিপয় লোক। এমন সময় সাঈদ ইবনে যায়েদ নামের এক ব্যক্তি আগমন করলেন। মুগীরা তাকে সালাম দিয়ে খাটের ওপর পায়ের দিকে বসতে দিলেন। অতঃপর কুফাবাসী এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে মুগীরার দিকে মুখ করে গালি বর্ষণ করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : মুগীরা, এ লোকটি কার প্রতি গালি বর্ষণ করছে? বললেন : আলী ইবনে আবু তালিবের প্রতি। তিনি বললেন : ওহে মুগীরা! এভাবে তিনবার আহ্বান করলেন। তারপর বললেন : নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীদের আপনার সামনে গালি দেয়া হবে, আর আপনি তার প্রতিবাদ করবেন না, এ আমি দেখতে চাই না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, 'উমার জান্নাতী, 'উসমান জান্নাতী, 'আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রাহমান জান্নাতী, সা'দ ইবনে মালিক জান্নাতী এবং নবম এক ব্যক্তিও জান্নাতী, তোমরা চাইলে আমি তার নামটিও বলতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন : জনগণ সমস্বরে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল : হে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবী, নবম ব্যক্তিটি কে? বললেন : নবম ব্যক্তিটি হচ্ছি আমি। তারপর তিনি কসম করে বললেন : যে ব্যক্তি একটি মাত্র যুদ্ধে নবী করীম ﷺ-এর সাথে

অংশগ্রহণ করেছেন, নবী করীম ﷺ-এর সাথে তার চেহারা ধূলি ধূসরিত হয়েছে, তার এ একটি কাজ যে কোন ব্যক্তির জীবনের সকল সৎকর্ম অপেক্ষা উত্তম– যদিও সে নূহের সমান বয়সই লাভ করুক না কেন।

(হায়াতুস সাহাবা/২য়-৪০ পৃঃ)

মর্যাদা : তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের অন্যতম। সাঈদ ইবনে হাবীব বলেন : নবী করীম ﷺ-এর কাছে আবু বকর, 'উমার, উসমান, আলী, সাদ, সাঈদ, তালহা, যুবাইর ও আবদুর রহমান ইবনে আওফের স্থান ও গুরুত্ব ছিল একই। যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা থাকতেন নবী করীম ﷺ-এর সামনে এবং সালাতের জামা'আতে থাকতেন তাঁর পেছনে।

হাদীস বর্ণনা : সাঈদ ইবনে যায়েদের কাছ থেকে সাহাবীদের মধ্যে ইবনে 'উমার 'আমর ইবনে হুরাইস, আবু আত তুফাইল এবং আবু উসমান আন-নাহদী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, কায়েস ইবনে আবু হাযেম প্রমুখ প্রখ্যাত তাবেয়ীগণও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যুবরণ : ওয়াকিদী বলেন : তিনি আকীক উপত্যকায় মৃত্যুবরণ করেন এবং মদীনায় তাকে দাফন করা হয়। মৃত্যু সন হিজরী ৫০। মতান্তরে হিজরী ৫১ অথবা ৫২। সত্তর বছরের ওপর তিনি জীবিত ছিলেন। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্‌কাস তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরান এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমার সালাতে জানাযার ইমামতি করেন। তবে হাইসাম ইবনে 'আদীর মতে তিনি কুফায় মৃত্যুবরণ করেন এবং বিশিষ্ট সাহাবী মুগীরা ইবনে শু'বা তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।

হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্টতা : সাঈদ ইবনে যায়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসের ১০৯৫টি দেখা যায় তন্মধ্যে মুয়াত্তাতে ১, বুখারীতে ১২, মুসলিমে ১১, আবু দাউদে ১০, তিরমিযিতে ১৬।

১০. আবু উবাইদা ইবনুল জার্রাহ (রা)

যখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, তিনি তাঁর তরবারির এক আঘাতে লোকটির মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। লোকটি কে? সে আর কেউ নয়। সে আবু উবাইদার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশজনকে দুনিয়াতেই তাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে আশারায়ে মুবাশ্শারা বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ ـ

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আবু বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস জান্নাতী, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতী, আবু ওবাইদা ইবনুল জার্রাহ জান্নাতী। (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবদুর রহমান বিন আওফ– ৩/২৯৪৬)

তাঁর প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنٌ وَاَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ – 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি রয়েছে। আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী ভাজন ব্যক্তি হলো আবু উবাইদা।

নাম ও পরিচিতি : আবু উবায়দার পুরো নাম আমীর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল জাররাহ্ আল-ফিহ্‌রী আল কুরাইশী। তবে শুধু আবু উবাইদা নামে তিনি সকলের কাছে পরিচিত। তাঁর পঞ্চম ঊর্ধ্বে পুরুষ 'ফিহ্‌রের' মাধ্যমে নবী করীম ﷺ-এর নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। তাঁর মা ও ফিহ্‌রী খান্দানের মেয়ে। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন।

দৈহিক কাঠামো : তিনি ছিলেন উজ্জ্বল চেহারা, গৌরকান্তি, হালকা পাতলা গড়ন ও লম্বা দেহের অধিকারী। তাঁকে দেখলে যে কোন ব্যক্তির চোখ জুড়িয়ে যেত, সাক্ষাতে অন্তরে উদায় হতো ভক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হতো এবং অন্তরে একটা নির্ভরতার ভাব সৃষ্টি হতো। তিনি ছিলেন অতি তীক্ষ্ণ মেধাবী, অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক স্বভাবের। তবে যে কোন সংকট মুহূর্তে সিংহের মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত। তাঁর চারিত্রিক দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা ছিল তরবারীর ধারের মতো ধারালো। নবী করীম ﷺ-এর ভাষায় তিনি ছিলেন উম্মাতে মুহাম্মদীর 'আমীন'– বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি।

উমারের মন্তব্য : আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) মন্তব্য হল : 'কুরাইশদের তিন ব্যক্তি অন্যান্যদের তুলনায় সুন্দর চেহারা, উত্তম চরিত্র ও লজ্জাশীলতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা তোমাকে কোন কথা বললে মিথ্যা বলবেন না, আর তুমি তাদেরকে কিছু বললে তোমাকে মিথ্যুক মনে করবেন না। তাঁরা হচ্ছেন– আবু বকর সিদ্দীক, উসমান ইবনে আফফান ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ্।'

ইসলাম গ্রহণ : ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন আবু উবাইদা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আবু বকরের মুসলমান হওয়ার পরের দিনই তিনি ইসলাম কবুল করেন। আবু বকরের হাতেই তিনি তাঁর ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর তিনি আবদুর রহমান ইবনে আউফ, উসমান ইবনে মাজউন, আল-আরকাম ইবনে আবিল আরকাম ও তাঁকে সাথে করে নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁরা সকলেই একত্রে ইসলামের ঘোষণা দেন। এভাবে তাঁরাই হলেন মহান ইসলামী ইমারতের প্রথম ভিত্তি।

হিজরত : মক্কায় মুসলিমদের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবু উবাইদা অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অটল থেকে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দু'বার হাবশায় হিজরত করেন। অতপর নবী করীম ﷺ-এর

হিজরতের পর তিনিও মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় সা'দ ইবনে মু'আজের সাথে তাঁর 'দ্বীনী মুয়াখাত' বা দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন আবু উবাইদার পরীক্ষার কঠোরতা ছিল সকল ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার উর্ধ্বে।

যুদ্ধের মাঠে এমন বেপরোয়াভাবে কাফিরদের ওপর আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে থাকেন যেন তিনি মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। মুশরিকরা তাঁর আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অশ্বারোহী সৈনিকরা প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে দিকবিদিক পালাতে শুরু করে। কিন্তু শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি বার বার ঘুরে ফিরে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াতে লাগল। আর তিনিও তার সামনে থেকে সরে যেতে লাগলেন যেন তিনি সাক্ষাত থেকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। লোকটি ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আবু উবাইদা সেখানেও তাকে এড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে সে শত্রুপক্ষ ও আবু উবাইদার মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। যখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, তিনি তাঁর তরবারির এক আঘাতে লোকটির মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

লোকটি কে? সে আর কেউ নয়। সে আবু উবাইদার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ। মূলত: আবু উবাইদা তাঁর পিতাকে হত্যা করেননি, তিনি তাঁর পিতার আকৃতিতে শিরক বা পৌত্তলিকতা হত্যা করেছেন। এ ঘটনার পর আল্লাহর তা'আলা আবু উবাইদা ও তাঁর পিতার শানে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন।

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِيُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْكَانُوْٓا اٰبَاۤءَهُمْ اَوْاَبْنَاۤءَهُمْ اَوْاِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ط اُولٰۤئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط اُولٰۤئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

'তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ কখনো তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে অবস্থান করে– তারা তাদের পিতা-ই হোক কিংবা তাদের পুত্র-ই হোক বা ভাই হোক অথবা তাদের বংশ– পরিবারের লোক। তারা সেই লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে একটা রূপ প্রদান করে তাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহিত হবে। তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে তাঁর প্রতি। এরা আল্লাহ্র দলের লোক। জেনে রাখ, আল্লাহর দলের লোকেরাই যথার্থ সফলকাম হবে। (সূরা আল মুজাদিলা : আয়াত-২২)

মর্যাদা : আবু উবাইদার এরূপ আচরণে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহ্র প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান চেতনা, দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠা তো এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রতি তাঁর আমানতদারী। তাঁর মধ্যে এমন চূড়ান্ত রূপলাভ করেছিল যে, তা দেখে অনেক মহান ব্যক্তিবর্গও ঈর্ষাপরায়ণ হতেন। মুহাম্মদ ইবনে জাফর বলেন : 'খ্রিস্টানদের একটা প্রতিনিধি দল নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল– হে আবুল কাসিম! আপনার সাথীদের মাঝ থেকে আপনার নির্বাচিত কোন একজনকে আমাদের সাথে পাঠান। তিনি আমাদের কিছু বিতর্কিত সম্পদের মীমাংসা করে দেবেন। আপনাদের মুসলিম সমাজ আমাদের সকলের কাছে মনোপূত ও গ্রহণযোগ্য। একথা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন : 'সন্ধ্যায় তোমরা আমার নিকট আবার এসো। আমি তোমাদের সাথে একজন দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করব।' উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন : আমি সেদিন সকাল সকাল যোহরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হলাম। আর আমি এ দিনের মতো আর কোন দিন নেতৃত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হইনি। এর একমাত্র কারণ, আমিই যেন হতে পারি নবী করীম ﷺ-এর এ প্রশংসার পাত্রটি।

নবী করীম ﷺ আমাদের সাথে যোহরের সালাত শেষ করে ডানে-বামে তাকাতে লাগলেন। আর আমিও তাঁর দৃষ্টিতে আসার জন্য আমার গর্দানটি একটু উঁচুতে তুলে ধরতে লাগলাম। কিন্তু তিনি তাঁর চোখ ঘোরাতে এক সময় আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে দেখতে পেলেন। তাঁকে আহ্বান করে তিনি বললেন : 'তুমি তাদের সাথে যাও এবং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তাদের বিতর্কিত

বিষয়টির মীমাংসা করে দাও।' আমি তখন মনে মনে বললাম : আবু উবাইদা এ মর্যাদাটি কেড়ে নিয়ে গেল।

আবু উবাইদা শুধু একজন আমানতদারই ছিলেন না, আমানতদারীর জন্য সর্বদা সকল শক্তি পুঞ্জিভূতও করতেন। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে।

আমির নিয়োগ : বদর যুদ্ধের সময় কুরাইশ কাফিলার গতিবিধি অনুসরণের জন্য নবী করীম ﷺ একদল সাহাবীকে প্রেরণ করেন। তাঁদের আমীর নিয়োগ করেন আবু উবাইদাকে। পাথেয় হিসেবে তাঁদেরকে কিছু খোরমা দিতেন। তাঁরা বাচ্চাদের মায়ের স্তন চোষার মতো সারাদিন সে খোরমাটি চুষে চুষে এবং পানি পান করে কাটিয়ে দিত। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র একটি খোরমাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিল। কোন কোন বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : অষ্টম হিজরীর রজব মাসে নবী করীম ﷺ আবু উবাইদার নেতৃত্বে উপকূলীয় এলাকায় কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য পর্যবেক্ষণমূলক একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিছু খেজুর ব্যতীত তাঁদের সাথে আর কোন পাথেয় ছিল না। সৈনিকদের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল মাত্র একটি করে খেজুর। এ একটি খেজুর খেয়েই তাঁরা বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের এ বিপদ দূর করেন। সাগর তীরে তাঁরা বিশাল আকৃতির এক মাছ লাভ করেন এবং তার ওপর নির্ভর করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হয়তো এ দুটি পৃথক পৃথক ঘটনা ছিল।

উহুদ যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা : উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাজয়ে গ্লানী বহন করে এবং মুশরিকরা জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'মুহাম্মদ কোথায়, মুহাম্মদ কোথায় ....'। তখন আবু উবাইদা ছিলেন সে দশ ব্যক্তির অন্যতম যারা বুক পেতে নবী করীম ﷺ-কে মুশরিকদের তীর থেকে রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল নবী করীম ﷺ-এর দাঁত শহীদ হয়েছে, তাঁর কপাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে এবং গণ্ডদেশে বর্মের দুটি বেড়ী বিঁধে গেছে। আবু বকর সিদ্দিক বেড়ী দু'টিকে উঠিয়ে ফেলার জন্য দ্রুত এগিয়ে এলেন। আবু উবাইদা ভয় করলেন হাত দিয়ে বেড়ী দু'টি তুললে নবী করীম ﷺ হয়ত কষ্ট পেতে পারেন। তিনি শক্তভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে প্রথমে একটি তুলে ফেললেন। কিন্তু তাঁরও অন্য একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। তখন আবু বকর (রা)

মন্তব্য করলেন : 'আবু উবাইদা সর্বোত্তম দাঁতভাঙ্গা ব্যক্তি।' খন্দক ও বনী কুরাইজা অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক চুক্তিতে তিনি একজন সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন। খাইবার যুদ্ধে অসীম সাহস ও বীরত্বে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। 'জাতুস সালাসিল' অভিযানে আমর ইবনুল আসের বাহিনীর সাহায্যের জন্য দু'শ' সিপাহীসহ নবী করীম ﷺ আবু উবাইদাকে পিছনে প্রেরণ করেন। তাঁরা বিজয়ী হন। মক্কা বিজয়, তায়িফ অভিযানসহ সর্বক্ষেত্রে আবু উবাইদা অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিদায় হজ্জেও তিনি নবী করীম ﷺ-এর সফরসঙ্গী ছিলেন।

নবীর সাহচর্য : ইসলাম গ্রহণের পর নবী করীম ﷺ-এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবু উবাইদা সর্বক্ষেত্রে ছায়ার মতো সব সময় তাঁকে অনুসরণ করেন।

সাকীফায়ে বনী সায়েদাতে খলিফা নিযুক্ত প্রসঙ্গে তুমুল বাক-বিতণ্ডা শুরু হলো। আবু উবাইদা আনসারদের লক্ষ্য করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করলেন। তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন : 'ওহে আনসার সম্প্রদায়! তোমরাই প্রথম সাহায্যকারী। আজ তোমরাই প্রথম পার্থক্য সৃষ্টিকারী হয়ো না।' এক পর্যায়ে আবু বকর আবু উবাইদাকে বলেন, আপনি হাত সম্প্রসারিত করুন, আমি আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করি।

বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি : আমি নবী করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্তভাজন লোক রয়েছে, তুমি এ জাতির সে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। এর জবাবে আবু উবাইদা বললেন : 'আমি এমন ব্যক্তির সামনে হাত বাড়াতে পারি না যাকে নবী করীম ﷺ আমাদের সালাতের ইমামতির নির্দেশ করেছেন এবং যিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইমামতি দায়িত্ব পালন করেছেন।' এ কথার পর আবু বকরের হাতে বাই'আত গ্রহণ করা হল। আবু বকরের খলিফা হবার পর সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সর্বোত্তম উপদেষ্টা ও সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন। আবু বকরের পর উমার খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আবু উবাইদা তাঁরও আনুগত্য মেনে নেন।

সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিযুক্তি : আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হিজরী ১৩ সনে সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা নিলেন। আবু উবাইদাকে হিমস, ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে দিমাশক, শুরাহ্বীলকে জর্দান এবং 'আমর ইবনুল আসকে ফিলিস্তিনে গমনের নির্দেশ প্রদান করলেন। সম্মিলিত

বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলেন আবু উবাইদাকে। দিমাশক, হিমস, লাজেকিয়া প্রভৃতি শহরে বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করেন আবু উবাইদা। ইয়ারমুকের সে ভয়াবহ যুদ্ধ তিনিই পরিচালনা করেন। 'আমর ইবনুল 'আসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বায়তুল মাকদাস বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।

বায়তুল মাকদাসবাসীরা স্বয়ং খলিফা 'উমরের সাথে সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে আবু উবাইদা সে কথা জানিয়ে খলিফাকে চিঠি লেখেন। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য খলিফা 'জাবিয়া' পৌঁছলে আবু উবাইদাই তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। হিজরী ১৭ সনে খালিদ সাইফুল্লাহকে দিমাশকের আমীর ও ওয়ালীর পদ থেকে বহিষ্কার করে খলিফা উমার আবু উবাইদাকে তাঁর স্থলে নিযুক্ত করেন। খালিদ সাইফুল্লাহ্ জনগণকে বলেন, 'তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, আমীনুল উম্মাহ্ তোমাদের ওয়ালী।'

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ـ

প্রত্যেক উম্মাতের একজন করে আমীন ছিল, আর আমার উম্মাতের আমীন (আমানাতদার) হচ্ছে আবূ উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রা)।

রাসূল ﷺ আবূ তালহার সাথে আবূ উবাইদাহ (রা)-এর ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দেন। মু'মিন জননী আয়েশা (রা) রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে? রাসূল ﷺ জবাব দিলেন, আবূ বকর তারপর উমার তারপর আবূ উবাইদাহ (রা)। সর্বদা আবূ উবাইদার ওপর আল্লাহ্ভীরুতা বিজয়ী ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহ্ভীরু। ঘটনাক্রমে ইসলাম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা সিরিয়া গমন করেন সে সময় আবূ উবাইদাহ (রা) সিরিয়াও ফিলিস্তীন বিজয়ী সৈন্যদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। উমার (রা) তাঁর ছাউনিতে গিয়ে দেখেন ঢাল ও তরবারি ছাড়া অন্য কোন আসবাবপত্র নাই। তখন খলীফা বললেন, আপনি যদি কিছু আসবাবপত্র রেখে দিতেন ভাল হত। জবাবে বলেছিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট। আমরা শীঘ্রই গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাব।

সিরিয়া বিজয় লাভ : আবু উবাইদার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ায় একের পর এক বিজয় লাভ করে সিরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে চলেছে। এ সময়

সিরিয়ায় মহামারী আকারে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং দৈনন্দিন হাজার হাজার মানুষ তার শিকারে পরিণত হয়ে অকালে জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। খলিফা ওমর (রা) নিজেই খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য রাজধানী মদীনা থেকে 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছলেন। অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আবু উবাইদা সেখানে খলিফাকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রবীন মুহাজির ও আনসারদের সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলেন। সকলেই একবাক্যে সেনাবাহিনীর সদস্যদের স্থান ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিলেন। উমার সকলকে আহ্বান করে বললেন তাঁর সাথে আগামীকাল মদীনায় ফিরে যাওয়ার জন্য।

তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস : তাকদীরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী আবু উবাইদা বেঁকে বসলেন। খলিফাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : اَفِرَارٌ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ এটি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন নয়?' খলিফা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন : 'আফসোস! আপনি ব্যতীত কথাটি অন্য কেউ যদি বলত! হ্যাঁ, আল্লাহর তাকদীর থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। তবে অন্য এক তাকদীরের দিকে। আবু উবাইদা তাঁর বাহিনীসহ সেখানে থেকে গেলেন। খলিফাতুল মুসলিমীন উমার মদীনা পৌঁছে দূত মারফত আবু উবাইদাকে একখানা চিঠি লিখে প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি লেখেন : "আপনাকে আমার খুবই দরকার। অত্যন্ত জরুরিভাবে আপনাকে আমি তলব করছি।

উমারের পত্র পেয়ে উত্তর : আমার এ পত্রখানি যদি রাতের বেলা আপনার নিকট পৌঁছে তাহলে সকাল হওয়ার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন। আর যদি দিনের বেলা পৌঁছে তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই যাত্রা শুরু করবেন।" খলিফা উমারের এ পত্রখানি হাতে পেয়ে তিনি মন্তব্য করেন :'আমার নিকট আমীরুল মু'মিনীনের প্রয়োজনটা কি তা আমি বুঝেছি। যে বেঁচে নেই তাকে তিনি বাঁচাতে চান।' তারপর তিনি লিখলেন : "আমীরুল মু'মিনীন, আমি আপনার প্রয়োজনটা বুঝতে পারছি। আমি তো মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে অবস্থান করছি। তাদের ওপর যে বিপদ পতিত হয়েছে তা থেকে আমি নিজেকে রক্ষা করার প্রত্যাশী নই। আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাই না। যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমার ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত কোন ফায়সালা করে দেন। আমার এ চিঠিটি আপনার হাতে পৌঁছার পর আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিবেন এবং আমাকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দানে বাধিত করবেন।"

উমার এ চিঠিটি পড়ে এত ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন যে, তাঁর দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ল। তাঁর এ কান্না দেখে তার আশেপাশের মানুষ তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল : 'আমীরুল মু'মিনীন, আবু উবাইদা কি মৃত্যুবরণ করেছেন? তিনি বলেছিলেন : 'না। তবে তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে।'

ভাষণ : উমরের ধারণা মিথ্যা হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্লেগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে উপলক্ষ্য করে উপদেশমূলক একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন : "তোমাদেরকে যে উপদেশটি আমি দিচ্ছি তোমরা যদি তা মান্য করে চলো তাহলে সর্বদা কল্যাণের পথেই থাকবে। তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, রমযান মাসে সিয়াম সাধনা পালন করবে, যাকাত দান করবে, হজ্জ্ব ও উমরা আদায় করবে, একে অপরকে উপদেশ দান করবে, তোমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দকে সত্য ও ন্যায়ের কথা অবহিত করবে, তাদের কাছে কিছু গোপন রাখবে না এবং দুনিয়ার সুখ সম্পদে গা ভাসিয়ে দেবে না। কোন ব্যক্তি যদি হাজার বছরও হায়াত পেয়ে থাকে আজ আমার পরিণতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারও এ একই পরিণতি হবে।"

তিনি মাঝে মাঝে ওয়াজ নসীহত করতেন। তিনি যখন সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন তখন বলেছিলেন–

اَلاَرُبَّ مُبَيِّضٍ ثِيَابَهٗ وَمُدَنِّسٍ لِدِيْنِهٖ اَلاَ رُبَّ مُكَرِّمٍ لِنَفْسِهٖ وَهُوَ عَدُوٌّ مُهِيْنٌ اِذَا رَاوْالسَّيِّئَاتِ الْقَدِيْمَاتِ بِالْحَسَنَاتِ الْحَدِيْثَاتِ فَلَوْا اَنَّ اَحَدَكُمْ عَمِلَ مِنْ سَيِّئَاتِ مَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ السَّمَاءِ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَتْ فَوْقَ سَيِّئَةٍ حَتّٰى اتْقَهَرْهُنَّ -

হুশিয়ার! লোকেরা পরিধেয় বস্ত্রকে চাকচিক্যময় রাখছে কিন্তু নিজের দ্বীনকে করছে কালিমা পূর্ণ। অনেক লোক নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়, মূলতঃ সেই অপমানিত শত্রু। তোমরা তোমাদের নতুন নেকী দিয়ে পুরাতন গুনাহগুলোকে মুছে ফেল। কেউ যদি আসমান যমীন পরিমাণ গুনাহের সাগরে ডুবে থাকে, তারপর যদি নেক আমল করতে থাকে তাহলে নেক আমল সমস্ত গোনাহের ওপর বিজয়ী হবে।

আবূ উবাইদাহ (রা) হতে এরবাজ ইবনে সারিয়া, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবূ উমামাহ বাহিলী, আবূ সালাবাহ প্রমুখ সাহাবা হাদীস বর্ণনা করেন।

মৃত্যুবরণ : সকলকে সালাম জানিয়ে তিনি তার ভাষণ সমাপ্ত ঘোষণা করেন। অতপর মু'আজ ইবনে জাবালের দিকে তাকিয়ে বলেন : মু'আজ! তুমি সালাতের ইমামতি কর।' এর পরপরই ১৮ হিজরীতে তাঁর রূহটি পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরম সত্তার দিকে অগ্রসর হলো। মু'আজ দণ্ডায়মান হয়ে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন : লোক সকল! তোমরা এ ব্যক্তির তিরোধানে ব্যথা ভারাক্রান্ত। আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যক্তির থেকে অধিক কল্যাণদৃপ্ত বক্ষ, পরিচ্ছন্ন অন্তর, আখিরাতের প্রেমিক এবং জনগণের উপদেশ দানকারী আর কোন ব্যক্তিকে জানি না। তোমরা তাঁর প্রতি দয়া কর, আল্লাহও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান । ৫৮ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।

জানাযা ও সমাহিত : এরপর জনগণ একত্রিত হয়ে আবু উবাইদার লাশ বের করে নিয়ে এল। মু'আজ ইবনে জাবালের ইমামতিতে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হল। মু'আজ ইবনে জাবাল, আমর ইবনে আস ও দাহহাক ইবনে কায়েস কবরে নেমে তাঁর লাশ মাটিতে শায়িত করেন। কবরে মাটিচাপা দেয়ার পর মু'আজ এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তাঁর প্রশংসা করে বলেন : "আবু উবাইদা, আল্লাহ্ আপনার ওপর দয়া করুন! আল্লাহর শপথ! আমি আপনার সম্পর্কে যতটুকু জানি কেবল ততটুকুই বলব, অসত্য ও অতিরঞ্জিত কোন কিছু বলব না। কারণ, আমি আল্লাহর শাস্তির ভয় করি। আমার জানা মতে আপনি ছিলেন আল্লাহকে অধিক স্মরণকারীও বিনম্রভাবে যমীনের ওপর বিচরণকারী ব্যক্তিদের অন্যতম। আর আপনি ছিলেন সেসব ব্যক্তিদের একজন যারা তাদের 'প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদা অবনত ও দাঁড়ানোর অবস্থায় রাত্রি যাপন এবং যারা খরচের সময় অপচয়ও করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে থাকে। আল্লাহর শপথ; আমার জানা মতে আপনি ছিলেন বিনয়ী এবং ইয়াতিম-মিসকীনদের প্রতি অতি সদয় ও দয়াশীল। আপনি ছিলেন অত্যাচারী অহংকারীদের দুশমনেরই একজন।'

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : ইত্তেবায়ে সুন্নাত, তাকওয়া, বিনয়, সাম্যের মনোভাব, স্নেহ ও দয়া ছিল তাঁর চরিত্রের একমাত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একদা এক ব্যক্তি আবু উবাইদার বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেল, তিনি হাউমাউ করে কাঁদছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করল : ব্যাপার কি আবু উবাইদা, এত কান্নাকাটি করছে কেন? তিনি বলতে লাগলেন : "একদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বিজয় ও ধন-ঐশ্বর্যের আলোচনা সম্পর্কে সিরিয়ার প্রসঙ্গ উঠালেন। বললেন : 'আবু উবাইদা তখন যদি তুমি জীবিত থাক, তাহলে তিনটি খাদেমই তোমার জন্য

যথেষ্ট হবে। একটি তোমার নিজের, একটি পরিবার-পরিজনের এবং অন্যটি তোমার সফরে সংগী হওয়ার জন্য।

অনুরূপভাবে তিনটি বাহনও যথেষ্ট মনে করবে। একটি তোমার, একটি তোমার সেবকের এবং একটি তোমার জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য।' কিন্তু এখন দেখছি, আমার বাড়ি সেবকে এবং আস্তাবল ঘোড়ায় পরিপূর্ণ। হায়, আমি কিভাবে নবী করীম ﷺ-কে মুখ দেখাব? নবী করীম ﷺ বলেছিলেন : সেই ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয় হবে, যে ঠিক সেই অবস্থায় আমার সাথে একত্রিত হবে যে অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যাচ্ছি।"

খলিফা উমার সিরিয়া সফরের সময় দেখতে পেলেন, অফিসারদের গায়ে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছেদ। তিনি এতই রাগান্বিত হয়ে গেলেন যে, ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং তাদের দিকে পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করতে করতে বললেন : তোমরা এত দ্রুত অনারব অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ? কিন্তু আবু উবাইদা একজন সাদাসিধে আরব হিসেবে খলিফার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করলেন। গায়ে অতি সাধারণ আরবীয় বস্ত্র, উটের লাগামটিও একটি সাধারণ রশি। খলিফা উমার (রা) তাঁর বাসস্থানে গিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে আরো অধিক সরল-সাদাসিধে জীবনধারার চিহ্ন। অর্থাৎ একটি তলোয়ার একটি ঢাল ও উটের একটি হাওদা ব্যতীত তাঁর ঘরে আর কিছু নেই। খলিফা বললেন : আবু উবাইদা, আপনি তো আপনার জরুরি জিনিস পত্রের ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন।' জবাবে আবু উবাইদা বললেন : আমীরুল মু'মিনীন, আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

একবার উমার (রা) উপহার হিসেবে চার শ' দীনার ও চার হাজার দিরহাম আবু উবাইদার কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি সব অর্থই সৈনিকদের মধ্যে ভাগ-ভাটোয়ারা করে দিলেন। নিজের জন্য একটি পয়সাও রাখেননি। 'উমার একথা শুনে মন্তব্য করেন আলহামদুলিল্লাহ্! ইসলামে এমন লোকও রয়েছে!

তিনি এতই বিনয়ী ছিলেন যে, সিপাহ্সালার হওয়া সত্ত্বেও অতি সাধারণ সৈনিকদের থেকে তাঁকে পৃথক ভাবা যেত না। অপরিচিত কেউ তাকে সিপাহসালার হিসেবে চিনতে পারত না। একবার তো এক রোমান দূত এসে জিজ্ঞেস করেই বসে, 'আপনাদের সেনাপতি কে? সৈনিকরা যখন আঙ্গুল উঁচিয়ে তাঁকে দেখিয়ে দিল, তখন তো সে সেনাপতির অতি সাধারণ বস্ত্র ও অবস্থান দেখে অবাক হয়ে গেল।

১১. বিলাল ইবনে রাবাহ (রা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালেও বিলাল (রা) মু'আযযিন হিসেবে বহাল থাকেন। কিন্তু উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাঁকে উক্ত পদে বহাল থাকতে অনুরোধ করলে তিনি রাযী হননি, বরং সিরিয়ার অভিযানসমূহে গমন করেন এবং জীবনের শেষাংশ সেখানেই অতিবাহিত করেন।

বেলাল (রা)-কে নবী কারীম ﷺ জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَرَاَيْتُ امْرَاَةَ اَبِىْ طَلْحَةَ ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً اَمَامِىْ فَاِذَا بِلَالٌ۔

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমাকে জান্নাত দেখানো হল, আমি আবু তালহা (রা)-এর স্ত্রী উম্মে সুলাইমকে সেখানে দেখতে পেলাম, অতঃপর আমি সামনে অগ্রসর হয়ে কোন মানুষের চলার আওয়াজ পেলাম, হঠাৎ দেখলাম বেলাল (রা)-কে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব মিন ফাযায়েল উম্মে সুলাইম)

নাম ও পরিচিতি : বিলাল ইবনে রাবাহ (রা) : তাঁকে কখনও কখনও তার মাতার সাথে সম্পৃক্ত করে ইবনে হা'মামাও বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন খ্যাতনামা সাহাবী। তিনি মহানবী ﷺ-এর মু'আয্যিন হিসেবেই সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। বিলাল (রা) হাবশী বংশোদ্ভূত ছিলেন। মক্কা মুকাররামায় সারাহ নামক স্থানে বানু জুমাহ গোত্রের মধ্যে দাস হিসেবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্ণনামতে উমাইয়্যাহ ইবনে খালাফ ছিল তাঁর প্রভু। কিন্তু কোনও বর্ণনায় এ গোত্রের অজ্ঞাতনামা কোন এক পুরুষ বা মহিলাকে তাঁর প্রভু বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলাম গ্রহণ : তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদিগের অন্যতম। এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবু বাকর (রা)-এর পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

নির্মম নির্যাতনের শিকার : দাসত্বের কারণে তাঁর উপর কঠোর ও নির্মম অত্যাচার চালানো হয়, বিশেষত উমায়্যাহ ইবনে খালাফ (ওয়াহ্‌ব?) তাঁরে উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। দ্বিপ্রহরে মরুভূমির তপ্ত বালুকায় তাঁকে চিৎ করে শয়ন করে বুকের উপর বিরাট ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখত এবং বলত, মুহাম্মদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর এবং লাত ও উয্‌যার 'ইবাদাত কর নতুবা এই অবস্থায় রেখে তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু এহেন মর্মন্তুদ শাস্তিতে নিমজ্জিত থেকেও তিনি বলতে থাকেন: আহাদ, আহাদ তিনিই এক আল্লাহ, তিনিই এক আল্লাহ (ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন-নুবুবি'য়্যা মিসর তা. বি., ১খ., ৩৪৪)। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সকল নির্যাতন সহ্য করেন কিন্তু ইসলাম পরিত্যাগ করেন নি। অবশেষে আবু বকর (রা) তাঁকে মুক্ত করে দেন। অতঃপর বিলাল (রা) সর্বদাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে থাকেন।

মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর বিলাল (রা), আবু বকর (রা) এবং মক্কা হতে আগত আরও সাহাবী জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলালকে আবু রুওয়ায়হা আল-খাছ 'আমীর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এই আবু রুওয়ায়হাকেই বিলাল (রা) সিরিয়া অভিযানের প্রাক্কালে তাঁর ওয়াজীফা (ভাতা) গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করেন। এই ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ভিত্তিতেই উমর (রা) আফ্রিকার ওয়াজীফা গ্রহণকারীদের তালিকা খাছ আম গোত্রের সাথে করে দেন। ইবনে ইসহাক এর বর্ণনামতে তাঁর সময়ে সিরিয়াতেও এ একই অবস্থা ছিল।

প্রথম মুয়াযযিন : হিজরতের প্রথম বছর যখন সালাতের পূর্বে আযান দেয়ার নিয়ম প্রচলিত হয় তখন বিলাল (রা) মু'আয্‌যিন নিযুক্ত হন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে তিনি উমায়্যা ইবনে খালাফ ও তার পুত্রকে হত্যা করেন।

যদিও বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'আযযিন হিসেবেই সমধিক প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করেন, তথাপি তিনি রাসূল ﷺ-এর অস্ত্র বহনকারী, খাজাঞ্চি এবং ব্যক্তিগত খাদিমও ছিলেন। কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহযোগী

এবং সাহায্যকারীও হতেন। মু'আয্যিন হিসেবে তিনি তখন উচ্চমর্যাদা লাভ করেন। মুসলিমানগণ যখন মক্কা জয় করেন বিলাল (রা)-ই সর্বপ্রথম কা'বা শরীফের ছাদের উপর উঠে আযানের মাধ্যমে মুমিনগণকে সালাতের দিকে আহ্বান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালেও বিলাল (রা) মু'আযযিন হিসেবে বহাল থাকেন। কিন্তু উমার (রা) তাঁর খিলাফতকালে তাঁকে উক্ত পদে বহাল থাকতে অনুরোধ করলে তিনি রাযী হননি, বরং সিরিয়ার অভিযানসমূহে গমন করেন এবং জীবনের শেষাংশ সেখানেই অতিবাহিত করেন। কোনও কোনও সূত্রে জানা যায় যে, তিনি নবী আকরাম ﷺ-এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরই মু'আযযিনের পদ পরিত্যাগ করেন এবং অতঃপর মাত্র দুবার আযান দেন। প্রথমবার ছিল যখন উমর (রা) জাবিয়াহ্ গমন করেন। আর দ্বিতীয়বার যখন বিলাল (রা) মদীনায় আগমন করলেন হাসান (রা) ও হুসাইন (রা) তাঁকে আযান দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্যত ছিলেন।

মর্যাদা : বিলাল (রা) তাঁর জীবদ্দশাতেই অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হন। উমর (রা) যখন খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-এর সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করবার জন্য শ্যাম-এ তাঁর একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তখন বিলাল (রা) খলিফার প্রতিনিধি এবং বিচক্ষণ সেনাপতি আবু উবায়দাহ্ উভয়কেই সাহায্য-সহযোগিতা করেন। (আত-তাবারী. ১খ, ২৫২৭)

দৈহিক বর্ণনা : তাঁর দেহাবয়ব এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, দৈহিক আকৃতি লম্বা এবং কিছুটা বক্র রং কালো, চেহারা পাতলা, ঘন চুল যাতে বহু সাদা চুল মিশ্রিত ছিল।

মৃত্যুবরণ : তিনি ষাট বছরেরও অধিক বয়স পেয়েছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনায় তাঁর মৃত্যু সন এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। ১৭/৬৩৯, ১৮/৬৪১, ২০/৬৪২ এবং ২১/৬৪৩ সন। তাঁর কবর হালাব অথবা অধিকাংশ ধারণামতে দিমাশক অথবা দারিয়ায় অবস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্তত ৬৯টি হাদীসের সাথে বিলাল ইবনে রবাহের সংশ্লিষ্টতা বিভিন্ন হাদীসে দেখা যায়।

১২. হারিছা ইবনে নু'মান (রা)

মদীনায় নবী করীম ﷺ-এর গৃহের কাছে তাঁর একটি বাড়ি ছিল। নবী করীম ﷺ যখনই তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গমন করতেন তখনই হারিছা (রা) তাঁর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতেন। এমনকি নবী করীম ﷺ একদিন বললেন, হারিছা যে আমাদের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তাতে আমার লজ্জা হয়।

হারেছা ইবনে নো'মান (রা) জান্নাতী।

عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيْهَا قِرَاءَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا حَارِثَةُ بْنُ نُعْمَانَ كَذَالِكُمُ الْبِرُّ كَذَالِكُمُ الْبِرُّ۔

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করে ক্বেরাতের আওয়াজ শুনতে পেলাম, আমি জিজ্ঞেস করলাম এ কে? ফেরেশতা উত্তরে বলল : হারেসা ইবনে নো'মান। একথা শুনে তিনি বললেন : এটিই নেকীর প্রতিদান এটিই নেকীর প্রতিদান। (হাকিম)

নাম ও পরিচিতি : হারিছা ইবনে নু'মান ছিলেন একজন আনসার সাহাবী। কুনিয়ত আবূ আবদুল্লাহ। মদীনার সুপ্রাচীন গোত্র খাযরাজ-এর বানু নাজ্জার শাখায় তাঁর জন্ম। তাঁর বংশ তালিকা হল, হারিছা ইবনে নু'মান ইবনে নাক (মতান্তরে নুফায়) ইবনে যায়েদ ইবনে উবায়েদ ইবনে ছালাবা ইবনে গানম ইবনে মালিক ইবনে নাজ্জার আল আনসারী। তাঁর মাতার নাম ছিল জাদা বিনত উবায়েদ ইবনে ছালাবা।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : হারিছা ইবনে নু'মান (রা) বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই নবী করীম ﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাতার প্রতি তিনি ছিলেন অতি সদয় ও অনুগতশীল। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ

বলেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে কিরাআত শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তি? জবাবে আমাকে বলা হল, সে হারিছা ইবনুন নু'মান। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, মাতা-পিতার প্রতি আনুগত্য ও সদাচারণের ফল এরূপই হয়ে থাকে।

জিবরাঈল (আ)-কে দর্শন : তিনি ছিলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের সম্মানিত একজন সাহাবী। তিনি দু'বার জিবরীল (আ)-কে স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। একবার নবী করীম ﷺ যখন বানু কুরায়জার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। সে দিন জিবরীল (আ) দিহয়া ইবনে খালিফা আল কালবীর আকৃতিতে গমন করেন, অতঃপর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ দান করেন। আর একদিন হল, যেদিন নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে নিয়ে হুনায়ন থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) এসে নবী করীম ﷺ-এর সাথে আলোচনা করছিলেন।

হারিছা ইবনুন নুমান (রা) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁদের আলাপের ব্যাঘাত ঘটবে বিধায় তিনি সালাম বিনিময় না করেই তাদেরকে অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হন। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন, মুহাম্মাদ! এ লোকটি কে? নবী করীম ﷺ বললেন, সে হারিছা ইবনুন নু'মান। জিবরাঈল (আ) বললেন, হুনায়ন যুদ্ধের বিপর্যয়কালে যে ১০০ (মতান্তরে ৮০) জন লোক ধৈর্য ধারণ করে জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তার সাথে সে তাদের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাদের জিবিকার জামিন হয়ে গিয়েছেন। সে যদি সালাম দিত তবে অবশ্যই আমি তার জবাব প্রদান করতাম।

অবশ্য অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি জিবরাঈল (আ)-কে সালাম দিয়েছিলেন এবং জিবরাঈল (আ) তার সালামের জবাবও দিয়েছিলেন। আহমদ ও আত তাবারী ইমাম যুহরী সূত্রে হারিছা ইবনে নু'মান (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম ﷺ-এর কাছে দিয়ে কাছে। জিবরাঈল (আ) তখন তাঁর কাছে বসেছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম।

অতঃপর আমি যখন ফিরে এলাম তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমার সাথে যিনি বসেছিলেন তাঁকে তুমি দেখেছিলে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তিনি হলেন জিবরাঈল (আ)। তিনি তোমার সালামের জবাব দিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি তাকে চিনেন কি? জিবরাঈল (আ) বললেন, হ্যাঁ, এ সেই

৮০ জনের অন্যতম, যারা হুনায়নের দিন ধৈর্য অবলম্বন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের এবং তাদের সন্তানদের জন্য জান্নাতে রিযিকের ব্যবস্থা রেখেছেন।

গুণাবলী : হারিছা ইবনে নু'মান (রা) বিশিষ্ট সাহাবীগণকে মনেপ্রাণে ভালবাসতেন। বিদ্রোহী দল তৃতীয় খলিফা উসমান (রা)-এর সাথে বিভিন্ন অন্যায় আচরণ করতে শুরু করলে তিনি উসমান (রা)-কে বললেন, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার পক্ষে যুদ্ধ শুরু করে দেই। কিন্তু তিনি তার অনুমতি দেন নি।

মদীনায় নবী করীম ﷺ-এর গৃহের কাছে তাঁর একটি বাড়ি ছিল। নবী করীম ﷺ যখনই তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গমন করতেন তখনই হারিছা (রা) তাঁর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতেন। এমনকি নবী করীম ﷺ একদিন বললেন, হারিছা যে আমাদের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তাতে আমার লজ্জা হয়।

শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছিল। তথাপি নবী করীম ﷺ-এর কথার ওপর পরিপূর্ণ আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং নেক কাজে নিজেকে নিয়োজিত। তিনি তাঁর সালাত আদায়ের স্থান থেকে ঘরের দরজা পর্যন্ত একটি রশি টানিয়ে রেখেছিলেন এবং নিজের কাছে একটি থলেতে কিছু খেজুর রেখে দিয়েছিলেন। যখন কোনও মিসকীন এসে সালাম দিত তখন তিনি তা থেকে কিছু খেজুর নিয়ে রশি ধরে দরজার কাছে গিয়ে নিজেই মিসকীনের হাতে দিতেন। তাঁর পরিবারের লোকজন বলল, আমরাই তো আপনার তরফ থেকে দিতে পারি।

মৃত্যুবরণ : হারিছা ইবনে নু'মান (রা) আমীর মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে মৃত্যুবরণ করেন। 'আবদুল্লাহ ও আবদুর রাহমান নামে তাঁর দুই পুত্র সন্তান এবং সাওদা, উমরা ও উম্মু হিশাম নামে তিন কন্যা সন্তান ছিল। তাঁর এ কন্যাত্রয়ের সকলেই নবী করীম ﷺ-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মাতা ছিলেন উম্মু খালিদ বিনতে খালিদ ইবনে যাঈশ। উম্মু কুলছুম নামে তাঁর অপর এক কন্যা ছিল যার মাতা ছিলেন বানূ আবদুল্লাহ ইবনে গাতফান গোত্রের। আমাতুল্লাহ নামে তাঁর আরও একটি কন্যা ছিল যার মাতা ছিলেন জুতদু গোত্রের মহিলা। তিনি নবী করীম ﷺ থেকে কিছু সংখ্যক হাদীসও রেওয়ায়েত করেছেন। ১৭৯টি বর্ণনার সাথে হারিছাহ ইবনে নু'মানের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

১৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা)

৪৬ বছর পর লাশটি আবার কবর থেকে তোলা হয়। জাবির বর্ণনা করেছেন, কবরটি ছিল একটি পানির নালার ধারে। একবার প্লাবনের সময় ততে পানি প্রবেশ করে। কবরটি পুনরায় খোড়া হয়। দেখা গেল, আবদুল্লাহর মুখে, যেখানে আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর একটি হাত সেই ক্ষতের ওপর। হাতটি সরিয়ে দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। হাতটি আবার সেখানে রেখে দিলে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেল।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা) জান্নাতী

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) يَقُوْلُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاجَابِرُ اَلاَ اُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِاَبِيْكَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ مَاكَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا اِلاَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِىْ تَمَنَّ عَلَىَّ اُعْطِيَكَ قَالَ يَارَبِّ تُحْيِيْنِىْ فَاُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً قَالَ اِنَّهٗ سَبَقَ مِنِّيْ اِنَّهُمْ اِلَيْهَا لاَ يَرْجِعُوْنَ قَالَ يَارَبِّ فَابْلِغْ مِنْ وَّرَائِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ـ

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : উহুদ যুদ্ধের দিন যখন আবদুল্লাহ্ ইবনে হারাম (রা) শহীদ হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে জাবের! আমি কি তোমাকে ঐ কথা বলব না, যা আল্লাহ্ তোমার পিতা সম্পর্কে বলেছেন? আমি বললাম : কেন নয়? তিনি বললেন : আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির সাথে পর্দার আড়াল ব্যতীত কথা বলেন নি। কিন্তু তোমার পিতার সাথে কোন পর্দা

ব্যতীত কথা বলেছেন এবং ইরশাদ করেছেন হে আমার বান্দা! তুমি যা চাওয়ার তা চাও, আমি তোমাকে দিব। তোমার পিতা বলছে হে আমর রব! আমাকে দ্বিতীয়বার জীবিত কর, যাতে আমি তোমার রাস্তায় শহীদ হতে পারি।

আল্লাহ্ বললেন : আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, মৃত্যুর পর দুনিয়াতে ফেরত আসা যাবে না। তোমার পিতা বলল : হে আমার রব! তাহলে তুমি আমার পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীকে আমার এ পয়গাম শুনিয়ে দাও যে, (আমি দ্বিতীয়বার শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করার আকাঙ্ক্ষা করছিলাম) তখন আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত। তারা তাদের পালনকর্তার নিকট রিযিক প্রাপ্ত হয়। [(সূরা আলে ইমরান- ১৬৯) ইবনে মাজাহ, সহীহ্ সুনানে ইবনে মাজা লি আলবানী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ২২৫৮]

নাম ও বংশ পরিচিতি

নাম করণ : নাম আবু জাবির 'আবদুল্লাহ্। পিতা ছিলেন 'আমর ইবনে হারাম এবং মাতা আর-রাবার বিনতে কায়স। মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু সুলামা শাখার সন্তান। নবী করীম ﷺ-এর বহু হাদীস বর্ণনাকারী বিশিষ্ট সাহাবী জাবিরের (রা) গর্বিত পিতা। বনু সুলামার একজন সম্মানিত নেতা ও সম্ভ্রান্ত বংশের ব্যক্তি। তিনি একজন 'আকাবী, বদরী ও উহুদের শহীদ। বালাজুরী বলেন : তিনি একজন আকাবী, বদরী ও নাকীব।

ইসলাম গ্রহণ : ইসলাম-পূর্ব সময়ের আরবের জনগণ মক্কার কা'বায় গমন করে হজ্জ ও 'উমরা পালন করত। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হজ্জ মওসুমে ইয়াসরিববাসীদের পাঁচ শো সদস্যের একটি বিরাট কাফিলা হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করে। তখন পর্যন্ত ইয়াসরিবে মুস'য়াব ইবনে 'উমাইরের (রা) হাতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণকারীরা ছাড়াও অনেক পৌত্তলিক এ কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আবদুল্লাহ্ও ছিলেন এ কাফিলার একজন সদস্য। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি। এ সফরে তাঁর সন্তান জাবিরও মুসলমান অবস্থায় অংশগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে আনসারী সাহাবী কা'ব ইবনে মালিক বলেন, "আমরা ইয়াসরিব থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। মক্কায় পৌঁছে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি কোন এক রাতে নবী করীম ﷺ-এর সাথে আকাবা উপত্যকায় একত্রিত হওয়ার

সিদ্ধান্ত। হজ্জ্ব সমাপ্ত করলাম এবং সাক্ষাতের নির্ধারিত রাতটিও এসে হাজির। আমাদের সাথে ছিলেন আবু জাবির আবদুল্লাহ ইবনে আমর। তিনি একজন নেতা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁকেও আমরা সফরসঙ্গী করেছিলাম।

পৌত্তলিক সফরসঙ্গীদের কাছে আমরা আমাদের পরিকল্পনা গোপন রাখতাম। নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কিছু পূর্বে আমরা তাঁকে বললাম : 'আবু জাবির! আপনি আমাদের একজন নেতা। আপনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। যে বিশ্বাস নিয়ে আপনি রয়েছেন, তার ওপর মৃত্যুবরণ করলে কালই জাহান্নামের আগুনে জ্বলবেন। এভাবে এক পর্যায়ে আমরা তাঁকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম এবং নবী করীম ﷺ-এর সাথে আকাবায়ে নির্ধারিত সাক্ষাতের সময়ের কথাও জ্ঞাত করলাম। তিনি তখনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমাদের সাথে 'আকাবায় বা'ইয়াতে অংশগ্রহণ করেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে বনু সুলামার নাকীব বা দায়িত্বশীল নির্বাচিত করেন।"

বালাজুরী বলেন : তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজের পরনের অপবিত্র বস্ত্র খুলে ফেলে আল-বারা' ইবনে মা'রূরের দেয়া দু'খানি পোশাক পরিধান করেন। আকাবার এ শেষ শপথে তাঁরা পিতা-পুত্র অংশগ্রহণের গৌরব লাভ করেন। 'আবদুল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হিজরী তৃতীয় সনের উহুদ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদাতের অনন্ত গৌরবের অধিকারী লাভ করেন। এটা হিজরাতের বত্রিশ মাসের মাথায় শাওয়াল মাসের ঘটনা।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : উহুদ যুদ্ধে মুনাফিকের (কপট মুসলমান) নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদীনার বাইরে গিয়ে কুরাইশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করা প্রসঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। নবী করীম ﷺ উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে সে তার সমর্থকদের কাছে এসে বলে : 'তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ না করে তাঁর ছোকরাদের কথা শুনলেন। আমরা জানি না, কিসের জন্য আমাদের জীবন বিপন্ন করব।"– এ বলে সে তার তিন শত সাথীসহ ফিরে চলল।

এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর কিছু সংখ্যক মুসলমান সঙ্গীকে নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন : 'তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমাদের লজ্জা করে না? তোমাদের মহিলাদের এবং তোমাদের আবাসভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধ কর।' বিশেষত মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ভীষণ তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে বললেন : 'আল্লাহর নামে আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের কওম ও

নবীকে এভাবে শত্রুদের সামনে ছেড়ে দিয়ে অপমান করো না।' জবাবে তারা বলে : 'আমরা যদি যুদ্ধে পারদর্শী হতাম, তোমাদের সাথে গমন করতাম। এভাবে তোমাদেরকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করতাম না।' যখন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যেতে কোনভাবেই রাজী হলো না তখন তিনি বললেন : 'আল্লাহ্ তার শত্রুদের দূর করে দিন। তোমাদের হাত থেকে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে রক্ষার জন্য একাই যথেষ্ট।' এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে ইমরানের ১৬৭ নং আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ج وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ط قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ط هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ج يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ .

উহুদ যুদ্ধের পূর্বের দিন রাতে তিনি পুত্র জাবিরকে ডেকে বললেন : বাবা, আগামীকালের প্রথম শহীদ আমি হতে চাই। নবী করীম ﷺ-এর পরে তুমিই আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আমি তোমাকে বাড়িতে রেখে গেলাম। তোমার বোনদের সাথে ভালো আচরণ করবে এবং আমার যে ঋণ রয়েছে তা পরিশোধ করবে।

শাহাদাত বরণ : দিনের বেলা তুমুলবেগে যুদ্ধ এগিয়ে চলল। আবদুল্লাহ্ দারুণ সাহসের সাথে সংগ্রাম করে শাহাদাত বরণ করলেন। তিনিই হলেন দিনের প্রথম শহীদ। উসামা ইবনে 'উনাইদ তাঁকে হত্যা করে। বালাজুরী হত্যাকারী হিসেবে সুফইয়ান ইবনে 'আবদি শামস আস সুলামীর নাম উল্লেখ করেছেন। পৌত্তলিকরা তাঁর লাশ কেটে-ছিড়ে করে একেবারে বিকৃত করে ফেলে।

ছেলে জাবির বলেন : আমার পিতার শাহাদাতের সংবাদ শুনে ছুটে এসে দেখলাম, লাশ একটি চাদর দিয়ে আবৃত। আমি মুখ থেকে চাদর সরিয়ে মুখে চুমু দিতে লাগলাম। নবী করীম ﷺ দেখলেন, কিন্তু বারণ করলেন না। আমি কাঁদতে লাগলাম। নবী করীম ﷺ-এর সাহাবীরা নিষেধ করতে লাগলেন; কিন্তু নবী করীম ﷺ নিষেধ করলেন না। আমার ফুফু লাশটি তোমার উঠিয়ে না নেয়া

পর্যন্ত ফিরিশতারা ডানা দিয়ে তাঁকে ছায়া দিতে থাকবে। ফাতিমা এক চিৎকার দিয়ে ওঠেন। 'এটা কার চিৎকার'– নবী করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন। সমবেত ব্যক্তিবর্গ বলল : আবদুল্লাহর বোনের।

দাফন : তাঁকে উহুদে দাফন করা হয়। উহুদের শহীদদেরকে দু'জন অথবা তিনজন করে এক কবরে দাফন করা হয়। জাবির (রা) বলেন : উহুদের শহীদ আমার পিতা ও মামার লাশ মদীনায় নিয়ে আসা হচ্ছিল। পথিমধ্যে নবী করীম ﷺ-এর ঘোষণা– শহীদদেরকে শাহাদাতের স্থলেই দাফন করা হবে– শুনে তাঁদেরকে আবার উহুদে ফিরিয়ে নেয়া হয় এবং সেখানেই দাফন করা হয়। মালিক ইবনে আনাস (রা) বলেন : 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ও 'আমর ইবনে আল-জামূহকে একই কাফনে ও একই কবরে দাফন করা হয়। বুখারীর বর্ণনায় মামার স্থলে চাচা বর্ণিত হয়েছে। আসলে 'আমর ইবনে আল-জামূহ আবদুল্লাহর ভাই নন; বরং ভগ্নিপতি। বনু সুলামার এক বৃদ্ধ ব্যক্তির সূত্রে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন : উহুদের লাশ দাফনের সময় নবী করীম ﷺ বলেন : তোমরা 'আমর ইবনে আল জামূহ ও আবদুল্লাহ ইবনে হারামের দিকে একটু দৃষ্টি রেখ। তারা দু'জন পৃথিবীতে ছিল একে অপরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁদেরকে একই কবরে দাফন করবে।

দাফনের ছয় মাস পর জাবির পিতার লাশটি কবর থেকে তুলে অন্য একটি কবরে দাফন করেন। তখন কেবল কান ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর এমন অক্ষত ছিল যে, মনে হলো কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে। এর ৪৬ বছর পর লাশটি আবার কবর থেকে তোলা হয়। জাবির বর্ণনা করেছেন, কবরটি ছিল একটি পানির নালার ধারে। একবার প্লাবনের সময় ততে পানি প্রবেশ করে। কবরটি পুনরায় খোড়া হয়। দেখা গেল, আবদুল্লাহর মুখে, যেখানে আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর একটি হাত সেই ক্ষতের ওপর। হাতটি সরিয়ে দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। হাতটি আবার সেখানে রেখে দিলে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেল। জাবির বলেন : 'আমি দেখলাম আমার পিতা যেন কবরে স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়ে রয়েছেন। তাঁর শরীরে কম-বেশি কোন রকম পরিবর্তন হয়নি। জাবিরকে প্রশ্ন করা হলো : তাঁর কাফনটি কেমন ছিল? বললেন : কাফনেরও কোন রূপ পরিবর্তন হয়নি। একই অবস্থায় ছিল। অথচ এর মধ্যে ৪৬টি (ছেচল্লিশ) বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

জাবির (রা) পিতার লাশে কিছু সুগন্ধি লাগানোর অনুমতি চাইলে সাহাবীরা অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন : তাঁদের বিষয়ে নতুন করে আর কিছুই করার দরকার নেই। তারপর অন্য এক স্থানে দাফন করা হয়।

'আবদুল্লাহ (রা) ইন্তিকালের সময় সন্তান জাবির (রা) ছাড়া আরো নয়জন কন্যা রেখে যান। তাদের মধ্যে ছয়জন ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক। তিনি অনেক ঋণের বোঝা রেখে যান। সহীহ্ বুখারীতে এর বর্ণনা এসেছে। এসব ঋণ জাবির (রা) পরিশোধ করেন। জাবিরের (রা) জীবনীতে আমি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। জাবির বলেন : আমার পিতা অনেক ঋণের বোঝা রেখে যান। তার ইন্তেকালের পর আমি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বললাম : আমার বাবা অনেক ঋণ রেখে গেছেন। কিছু খেজুর আছে। আপনি চলুন যাতে পাওয়ানাদাররা সব নিয়ে না যায়। নবী করীম ﷺ গেলেন এবং খেজুরের স্তূপের ওপর বসে পাওনাদারদেরক ডেকে ডেকে তাদের পাওনা একেক করে পরিশোধ করে দিলেন। তারপরেও সমপরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রয়ে যায়।

মর্যাদা : আবদুল্লাহ ছিলেন অতি সম্মানিত ও অতি উঁচু মর্যাদার অধিকারী সাহাবীদের একজন। বনু সুলামা গোত্রে ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি যে চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর পথে যেভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেন, স্বয়ং নবী কারীম ﷺ তাঁর স্বীকৃতি দিয়েছেন। সুনানে নাসাঈ শরীফে এসেছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ সব আনসার সম্প্রদায়কে আমাদের তরফ থেকে ভালো প্রতিদান দিন, বিশেষ করে 'আমর ইবনে হারামের বংশধর (আবদুল্লাহ ও তাঁর সন্তান) ও সা'দ ইবনে 'উবাদাকে।

জাবির জবাব দিলেন : আমার বাবা শহীদ হয়েছেন এবং কতিপয় সন্তান রেখে গেছেন। তাদেরই চিন্তা আমাকে সর্বদা অস্থির করে রেখেছেন। নবী করীম ﷺ বললেন : একটি সুসংবাদ শুন, আল্লাহ্ পর্দা ছাড়া কারো সাথে সামনা-সামনি কথা বলেন না। কিন্তু তিনি তোমার বাবার সাথে সামনা-সামনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর! তুমি কি পছন্দ কর? জবাবে তোমার বাবা বলেছেন, আমার পছন্দ এই যে, আমি আবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করি এবং আপনার পথে লড়াই করে আবার শাহাদত বরণ করি। আল্লাহ্ বলেছেন, এ হয় না। পৃথিবী থেকে যে একবার আসে সে আর প্রত্যাবর্তন করতে পারে না।

তখন তিনি বলেছেন, তাহলে আমার প্রসঙ্গে কিছু ওহী প্রেরণ করুন। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

যারা আল্লাহর পথে জীবন দান করে তাদেরকে মৃত ভেবো না। বরং তারা আল্লাহর নিকট জীবিত। যাদেরকে আহার দেয়া হয়।

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৬৯)

আবদুল্লাহ (রা)-এর চেয়ে বড় গৌরব অহঙ্কারের আর কি আছে যে, আজ চৌদ্দ শো বছর পরেও আমরা তাঁকে স্মরণ করছি। হয়তো আরো হাজার হাজার বছর পরেও এভাবে মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে।

১৪. ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা)

একদিন নবী করীম ﷺ মিম্বরে বসে সাহাবাদেরকে হেদায়েতের বাণী শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় হাসানও হুসাইন দুই ভাই লালে লাল রঙের পোশাক পরে একবার পড়ে যায় আবার উঠে– এভাবে নবী করীম ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এলেন। এ অবস্থা দেখে নবী করীম ﷺ দ্রুত মিম্বর থেকে নেমে এগিয়ে এলেন এবং বললেন। আমি বাচ্চা দুটিকে একবার পড়ে যায় আবার উঠে– এ অবস্থা অবলোকন করে ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না। আমার কথা বন্ধ করতে হলো এবং তাদেরকে কোলে উঠাতে হলো।

হাসান ও হুসাইন (রা) জান্নাতে ঐ সমস্ত লোকদের সরদার হবেন যারা যৌবনকালে মৃত্যুবরণ করেছে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হাসান ও হুসাইন (রা) জান্নাতী যুবকদের সরদার হবে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবু মুহাম্মদ আল হাসান ওয়াল হুসাইন)

হাসান (রা) প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেন 'আমার এ সন্তান সাইয়্যেদ (নেতা)। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বিবাদমান দলের মধ্যে ফয়সালা দান করবেন।' (সহীহ বুখারী)

ঈমান তিরমিযীর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

اَحَبُّ اَهْلِ بَيْتِىْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ـ

আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে হাসান-হুসাইন আমার সর্বাধিক প্রিয়।

মুসলিম শরীফের হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, "হে আল্লাহ! আমি হাসানকে ভালোবাসি, কাজেই আপনি তাকে ভালোবাসুন এবং যারা তাকে ভালোবাসে তাদেরকেও ভালোবাসুন।"

নবী করীম ﷺ-এর গুণাবলীর প্রতিফলন : মানবতার পরিপূরক সকল বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী আল্লাহ্ তা'আলা কেবলমাত্র বিশ্বনবী ﷺ-এর মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন, এতসব গুণাবলী তাঁর উম্মতের আর কারো মধ্যে একত্রিত করেননি। সিদ্দীক, শহীদ, ওলী এবং সমস্ত বুযুর্গানে দ্বীন তাঁর গুণাবলী থেকে অংশ বিশেষের কিঞ্চিৎ অধিকারী হয়েছে। সমষ্টিগত গুণাবলীর অধিকারী কেউ হতে পারেনি এবং তা অদৌ কখনও সম্ভবও নয়। তাদের মধ্যে যার যতটুকু নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা, আন্তরিকতা, অনুরাগ এবং আনুগত্য ছিল, সে সেই পরিমাণ গুণাবলীর অধিকারী হয়েছেন– এর বেশি নয়।

নবী করীম ﷺ-এর গুণাবলীর অংশীদারিত্ব সূত্রে পরবর্তীকালে বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবেই অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। তবে কেউ তাঁর সম্পূর্ণ গুণাবলীর এককভাবে অধিকারী হতে পারবে না। আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বিশ্বনবীর গুণাবলীর সর্বাধিক গুণের অংশের অধিকারী বলা হয়। তিনি নবী করীম ﷺ-এর পর উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বনবীর সমকক্ষ নন। তবে, তিনি সিদ্দীকে আকবর।

আবার কেউ ফারুক, কেউ আমীন, কেউ হাওয়ারী, কেউ সাদিক, কেউ বীরযোদ্ধা এবং কেউ রোম সাম্রাজ্য বিজয়ী ইত্যাদি। তাঁরা সবাই নবী করীম ﷺ-এর গুণাবলীর উত্তরাধিকারী। এ উত্তরাধিকারীত্বের ভিত্তি হচ্ছে অনুকরণ, অনুসরণ এবং অশেষ ভালোবাসা। এর সাথে বংশ এবং নসবের সম্পর্ক যুক্ত হলে তারা যেমনিভাবে বংশ বিচারে বিশ্বনবীর সর্বাধিক নিকটের, তেমনি গুণাবলীর প্রশ্ন এবং স্বভাব চরিত্রের দিক থেকেও বিশ্বনবীর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী তারাই। এ কারণেই আহলে বাইতের সদস্যগণ সর্বতোভাবে বিশ্বনবীর সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের মধ্যে থেকে নবী করীম ﷺ-এর নাতী-নাতনী, ফাতেমা এবং আলীর সন্তান হাসান ও হোসাইন আরো অধিক নিকটবর্তী।

তাই আমরা যখন আহলে বাইতের দুই নক্ষত্র হাসান এবং হুসাইনের জীবনী আলোচনা পর্যালোচনা করি, তখন তাদের জীবনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের অংশ বিশেষ সর্বাধিক প্রস্ফুটিত দেখতে

পাই। যারা তাদেরকে চাক্ষুস দেখেছেন এবং যারা তাদের উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচার প্রসঙ্গে অবহিত তারা একথা নির্দ্বিধায় বলতে বাধ্য যে–

اَللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ .

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত যে, কাকে স্বীয় রিসালাত দান করতে হবে। (সূরা আন'আম : আয়াত-১২৪)

হাসান এবং হুসাইন (রা)-এর মধ্যে নবী করীমﷺ-এর গুণাবলী অধিক মাত্রায় সন্নিবেশিত ছিল, যা অত্যন্ত বাস্তব ও অনস্বীকার্য। কেবল যার চক্ষু অন্ধ কিংবা যার কলব রোগাক্রান্ত সে-ই এ ধ্রুব সত্যকে অস্বীকার করতে পারে।

ইমাম হাসান (রা)-এর নসবনামা : আবু মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব। তার মাতা হচ্ছেন অতুলনীয় পুত:পবিত্রা নির্মল ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী নবী কন্যা ফাতেমাতুয যোহরা (রা)। তাই হাসান (রা) একদিকে রাসূলে করীমﷺ-এর নাতী, নারী জগতের নেত্রী ফাতেমা (রা)-এর আদরের সন্তান। অপরদিকে উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা)-এর কন্যার সন্তান। হাসান (রা) নবী বাগানের এক সুগন্ধিযুক্ত ফল, জ্ঞানেগুণে সর্বদিক দিয়ে নবী সদৃশ। হাসান (রা) জান্নাতী যুবকদের সর্দার এবং নবীর চাদরে পরিবেষ্টিত আহলে বাইতের পাঁচজনের অন্যতম।

জন্ম : হিজরী ৩য় ১৫ রমযান ১ এপ্রিল ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। আলী (রা) প্রথমে তাঁর নাম রেখেছিলেন হারব। রাসূলﷺ তার নাম পরিবর্তন করে হাসান রাখেন। আনাস (রা) বলেন, 'হাসান ব্যতীত রাসূলﷺ-এর আকৃতিতে এতো অধিক সাদৃশ্য আর কারো ছিল না।'

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই স্বপ্নযোগে তাঁর জন্মের সু-সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা (রা)-এর বোন উম্মুল ফযল লুবাবা বিনতে হারিছ হেলালিয়া-যিনি আব্বাস (রা)-এর স্ত্রী এবং খাদীজা (রা)-এর পর দ্বিতীয় ইসলাম গ্রহণকারিণী নারী। তিনি নবী করীমﷺ-এর দরবারে স্বীয় স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেন যে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার ঘরে আপনার শরীরের একটি টুকরো স্বপ্নযোগে দেখতে পাই।" নবী করীমﷺ বললেন, 'উত্তমই দেখেছ। ফাতেমার গর্ভে ছেলে সন্তান জন্মলাভ করবে, তুমি তাঁকে দুগ্ধ পান করাবে।'

বস্তুত: রাসূলে মাকবুলﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ফাতেমা (রা)-এর গর্ভে হাসান (রা) জন্ম লাভ করেন এবং উম্মুল ফযল তাঁর সন্তান কুলছুমের সাথে হাসান (রা)-কে দুগ্ধ পান করান। এ সূত্রেই কুলছুম বিনতে ইবনে আব্বাস নবী করীমﷺ-এর নাতনী হিসেবে পরিগণিত এবং কুলছুম বিনতে ইবনে আব্বাস হাসান (রা)-এর দুধ বোন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

আলী (রা) ছিলেন বীরযোদ্ধা। তাই হাসান ভূমিষ্ঠ হলে আলী (রা) তাঁর নাম হারব অর্থাৎ যুদ্ধ রাখতে ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু নবী করীমﷺ ইরশাদ করেন, 'আমার সন্তানকে আমার সামনে উপস্থিত কর।' যখন আসা হল তখন নবী করীমﷺ ইরশাদ করলেন যে, তোমরা তার কি নাম রাখতে মনস্থির করেছ? আলী (রা) বললেন, তার নাম 'হারব' রেখেছি। নবী করীমﷺ ইরশাদ করলেন, তার নাম হারব নয় বরং হাসান।

আলী (রা)-এর পরবর্তী দুই সন্তানের নামও এ শব্দের অনুকরণে হুসাইন এবং মুহসিন নাম রাখা হয়। ইতোপূর্বে কারো এ নাম ছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। হাসান (রা)-এর জন্মকালে নবী করীমﷺ স্বয়ং তাঁর কানে আযান দেন এবং মাথার চুল মুণ্ডিয়ে চুলের পরিমাণ রূপা সদকা দেয়ার নির্দেশ দেন।

হাসান (রা)-এর উপনাম "আবু মুহাম্মদ" নবী করীমﷺ-এর নিজের নির্ধারণ করা। তার নাম নির্ধারণের পর দুটি মেষ যবাই করে আকীকা করেন এবং আকীকার গোশত সাহাবাদের মধ্যে বণ্টন করেন।

নামের আকীকা : হাসান (রা)-এর রং ছিল লাল মিশ্রত সাদা। চোখের মান ছিল অতি কালো বর্ণের। মুখমণ্ডল সামঞ্জস্যপূর্ণ গোল। দাড়ি ঘন। হাসান (রা)-কে রাসূলে করীমﷺ-এর অনুরূপ দেখা যেত। এ কারণেই ফাতেমা (রা) কৌতুক করে বলতেন, "এতো আলীর মতো নয় বরং নবীর মতো।

ইবনুল আরাবীর বর্ণনায় মুফাজ্জল বলেন, হাসান হুসাইন নাম দুটি আল্লাহ তা'আলা গোপন করে রেখেছিলেন, নবী করীমﷺ তাঁর দুই সন্তানের এ নাম রাখেন।

মহানবীﷺ-এর আচরণ : নাতীর জন্মগ্রহণের পর নবী করীমﷺ যে কত আনন্দিত হয়েছিলেন তা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। তাঁকে নিয়ে রাসূলে করীমﷺ-কে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ পরিলক্ষিত হতো। কখনো কাঁধে উঠাতেন, কৌতুক করতেন, আবার ডেকে ডেকে বুকে জড়িয়ে বলতেন, "হে ফাতেমার চোখের শান্তি! উঠ, আমার বুকে ধীরে ধীরে ছোট ছোট পা রাখ।" এভাবে শিশু

হাসান নবী করীম ﷺ-এর বুকে চড়ে উপরের দিকে উঠতে থাকতেন এবং স্বীয় পা নবী করীম ﷺ-এর বুকে ধারণ করতেন। ফাতেমা (রা)-এর সকল সন্তানদের সাথেই নবী করীম ﷺ-এর এমনি আচরণ ছিল খুবই সুখকর ও মধুর।

উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, একদিন কোন প্রয়োজনে আমি নবী করীম ﷺ এর কাছে হাজির হই। নবী করীম ﷺ চাদর পরা অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। চাদরের নিচে পেচানো কিছু আছে বলে মনে হলো। নবী করীম ﷺ এর সাথে আমার যা প্রয়োজন ছিল তা নিমিষেই মিটে গেলে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চাদরের নিচে কি? নবী করীম ﷺ তখন চাদর খুলে দিলেন। আমি দেখলাম নবী করীম ﷺ-এর উরুতে হাসান আর হুসাইন! তখন নবী করীম ﷺ বললেন, "এরা দু'জন আমার এবং আমার কন্যা ফাতেমার সন্তান।' অতঃপর মুনাজাত করলেন, "হে আল্লাহ! আমি এদের দু'জনকে খুব ভালোবাসি।" আপনি তাদেরকে ভালোবাসুন এবং যারা তাদেরকে ভালোবাসবে আপনি তাদেরকেও ভালোবাসুন।"

একদিন নবী করীম ﷺ মিম্বরে বসে সাহাবাদেরকে হেদায়েতের বাণী শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় হাসানও হুসাইন দুই ভাই লালে লাল রঙের পোশাক পরে একবার পড়ে যায় আবার উঠে– এভাবে নবী করীম ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এলেন। এ অবস্থা দেখে নবী করীম ﷺ দ্রুত মিম্বর থেকে নেমে এগিয়ে এলেন এবং বললেন। আমি বাচ্চা দুটিকে একবার পড়ে যায় আবার উঠে– এ অবস্থা অবলোকন করে ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না। আমার কথা বন্ধ করতে হলো এবং তাদেরকে কোলে উঠাতে হল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হাসান (রা)-কে দেখলেই আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং চোখে অশ্রু প্রবাহিত হয়। আমি দেখেছি একদিন নবী করীম ﷺ মসজিদে বসা ছিলেন, আমিও তাঁর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, "লুকা' অর্থাৎ ছোট বাচ্চাটিকে ডাক, অথবা ছোট বাচ্চাটি কোথায়? নবী করীম ﷺ-এর ডাক শুনেই হাসান দৌড়াতে দৌড়াতে এগিয়ে এলো এবং নবী করীম ﷺ এর দাড়ি মুবারকের ভিতর হাত ঢুকায়ে দিল। আর তখন নবী করীম ﷺ নিজের চেহারা হাসানের মুখের সাথে লাগিয়ে মুনাজাত করলেন, "হে আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, আপনি তাকে ভালোবাসুন এবং যারা তাকে ভালোবাসে আপনি তাদেরকেও ভালোবাসুন।"

নবী করীম ﷺ অধিকাংশ সময়ই বলতেন, "হাসান আমার নাতী।"

নবী ঘরানায় হাসান (রা)-এর প্রশিক্ষণ : হাসান (রা) সদা সর্বদা নবী করীম ﷺ-এর সাথে সাথেই থাকতেন, তাই তিনি নবী ঘরানায় এবং নবীর তত্ত্বাবধানে আদব-আখলাক, অহীগত জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা অর্জনে সৌভাগ্যবান হওয়ার বিশেষ সুযোগ অর্জনে ধন্য হন।

আবুল হাওরা হাসান (রা)-কে প্রশ্ন করলেন যে, নবী করীম ﷺ-এর সাথে আপনার কোন ঘটনার কথা মনে হয় কি? হাসান বললেন যে, হ্যাঁ, একবার আমি যাকাতের একটি খেজুর খাওয়ার জন্য মুখে দিলাম আর নবী করীম ﷺ খেজুরটি লালাসহ আমার মুখ থেকে বের করে যাকাতের খেজুরের মধ্যে রেখে দেন। উপস্থিত একজন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'মুহাম্মদের পরিবার-পরিজনের জন্য যাকাতের কোন কিছু জায়েয নয়।' তিনি সদা সর্বদা বলতেন, "সন্দেহজনক বস্তু পরিত্যাগ কর, আর জেনে রাখ, সততাই শান্তির মূলস্তম্ভ।

আবু হাওরা বলেন, আমাকে নবী করীম ﷺ একটি দোয়া শিখায়েছিলেন, যে দোয়াটি আমি বেতরের সালাতে পড়ে থাকি। দু'আটি হল–

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهٗ لَايَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ۔

বস্তুত: আন্তরিকতা, একাগ্রতা, মহব্বত এবং আশা ভরসা নিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করা একান্তভাবেই অত্যাবশ্যক। হাসান এবং ভ্রাতা হুসাইন নবী ঘরানায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নবীগত চরিত্র এবং উত্তম এক পরিবেশে লালিত-পালিত হন। যুবক বয়সেই তিনি ছিলেন আচরণগতভাবে অত্যন্ত লাজুক, তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী, মধুর চরিত্র এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী। প্রশান্ত এবং অতি ভদ্র স্বভাবের হাসান ছিলেন সকলের কাছে স্নেহভাজন। অশ্লীল এবং অশালীন আলাপ-আলোচনা এবং আচরণ থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পুত:পবিত্র। তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক, অলংকার শাস্ত্রবিদ, উপস্থাপনায় পারদর্শী; মধুর ও প্রাঞ্জল ভাষার অধিকারী। তিনি এসব গুণাবলীর অধিকারী হন পৈত্রিক সূত্রেও বংশগতভাবে।

একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গ : জনগণ হাসান (রা)-এর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নবী বংশের সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশায় তাঁকে অধিক বিবাহে বাধ্য করতেন। তাই তাঁকে কয়েকটি বিবাহ করতে হয়েছে এবং তালাক প্রদান করতে হয়েছে। একদা আলী (রা) স্বয়ং কুফার জামে মসজিদে অগণিত মানুষের সামনে ঘোষণা করলেন, "হে কুফাবাসী! আপনারা হাসানের কাছে কারো কন্যা বিবাহ দিবেন না। কারণ সে অত্যধিক তালাকে অভ্যস্ত।" আলী (রা)-এর প্রকাশ্য এ ঘোষণা শুনে হামদানের এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, "আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আমরা অবশ্যই হাসানের কাছে বিবাহ দিব, তাঁর মনে যাকে চায় রাখবে যাকে চায় তালাক প্রদান করবে।

হাসান (রা)-এর বিশেষত্ব : হাসান (রা) ছিলেন অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের নম্র-ভদ্র মানুষ। কোন দিন তিনি নিজের বড়ত্বের দাবি করতেন না। ঝগড়া-বিবাদ ও তর্কবাজী করার স্বভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। কোনদিন কোন বিষয়ে তাঁকে আদালতে হাজির হতে হয়নি। তাঁর কথা এবং কাজে ছিল অপূর্ব মিল। যা বলতেন, উপদেশ দিতেন তা নিজেও আমল করতেন। আত্মীয়-স্বজন ভাই বন্ধুদের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, উদাসীন ছিলেন না। নিজের অধিকারকে কখনো প্রাধান্য দিতেন না। ভুলত্রুটির কারণে কেউ ওজর আপত্তি করলে মহান উদারতার পরিচয় দিতেন। ভর্ৎসনা তিরস্কার করার স্বভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। কোন কঠিন বিষয়ে সঠিক তত্ত্ব নিরূপণের সমস্যার সৃষ্টি হলে তিনি অতি গভীরভাবে সে বিষয়ে মনোনিবেশ করতেন এবং প্রবৃত্তির তাড়নামুক্ত হয়ে সমাধানের চিন্তা করতেন। অন্তরের ভুল চাহিদার আনুগত্য করতেন না। যথাসম্ভব হকের সমর্থন করতেন।

বুখারী শরীফের বর্ণনায় আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, 'আমি দেখি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হাসান মিম্বরে উপবিষ্ট, সে একবার মানুষের দিকে তাকায় আর একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে তাকায়। আর একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আমার এ সন্তান সাইয়্যেদ, আল্লাহ্ তা'আলা তার দ্বারা মুসলমানদের বিবাদমান দুটি বড় দলের মধ্যে ফয়সালা দান করবেন।

গভীরভাবে চিন্তা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হাসান (রা)-এর বিশেষত্বের জন্য এ একটি হাদীসই যথেষ্ট। হাসান এবং হুসাইনের মধ্যে সাহিত্য, গভীর চিন্তা বিচার-বিবেচনা, ধৈর্য-সহনশীলতা এবং উদারতা তার মাতাপিতা এবং

দাদাজান থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্তি লাভ করেন। ইলমে কুরআন এবং পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব জ্ঞানে তিনি স্বীয় পিতার উপযুক্ত স্থলাভিষিক্ত হন। সমকালীন সাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যান্যদের থেকেও তিনি প্রচুর জ্ঞান আহরণে সক্ষম হন।

দান-খয়রাত ও সহনশীলতা : হাসান (রা)-এর দান-খয়রাত ও সহনশীলতার অনেক ঘটনাবলী রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

১. একদিন হাসান (রা) এক ব্যক্তির মুনাজাতে শুনতে পান যে, সে আল্লাহ তা'আলার কাছে দশ হাজার দেরহাম প্রার্থনা করছে; তৎক্ষণাৎ তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন এবং ঐ ব্যক্তির জন্য দশ হাজার দেরহাম প্রেরণ করেন।

২. এক লোক হাসান (রা)-এর কাছে কিছু সদকা চাইলে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়েন, কারণ তখন দেয়ার মতো কোন কিছু তাঁর কাছে ছিল না। তিনি লোকটিকে বললেন, আমি তোমাকে একটি পরামর্শ দিব কি যে পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলে তোমার লক্ষ উদ্দেশ্য পূরণ হবে? লোকটি 'হ্যাঁ' বলে জবাব দিলে তিনি বললেন, 'তুমি খলিফার কাছে যাও, তাঁর স্নেহের কন্যার মৃত্যুতে সে অত্যন্ত ব্যথা বিহ্বল আস্থায় আছে এবং জনগণের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছে, এখনও সে যথাযথ শোকবার্তা পায়নি, তুমি তাকে এ শোকবার্তা পৌঁছে দাও–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَتَرَهَا بِجُلُوْسِكَ عَلٰى قَبْرِهَا وَمَا هَتَكَهَا بِجُلُوْسِكَ عَلٰى قَبْرِكَ -

লোকটি খলিফাকে এ শোকসংবাদ জানালে খলিফা অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তার সমস্ত দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ দূর হয়ে যায়। খলিফা খুশী হয়ে তাকে পুরস্কৃত করেন। খলিফা লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, "এ শোক সংবাদটি কি তোমার?" লোকটি বলল, "জী-না সংবাদটি আমার নয় বরং হাসান (রা) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।" খলিফা বললেন, তুমি সঠিকই বলেছ, সেতো ভাষায় পণ্ডিত। অতঃপর দ্বিতীয় বার পুরস্কৃত করলেন।

৩. কোন এক ব্যক্তি হাসান (রা)-এর স্বীয় অভাবের কথা জানালে হাসান (রা) খাজাঞ্চীকে ডেকে আনালেন এবং হিসাব নিকাশ করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত

সবকিছু হাজির করতে বললেন। খাজাঞ্চী ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) দেরহাম হাজির করল। হাসান (রা) বললেন, 'তোমার কাছে অতিরিক্ত আরো পাঁচশত দীনার রাখা ছিল সেগুলো কোথায়? খাজাঞ্চী বলল, 'আমার কাছে সংরক্ষিত আছে।' হাসান (রা) সেগুলোও নিয়ে আসতে বললেন।

৪. একবার হাসান, হুসাইন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর একত্রে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রাস্তায় যাবতীয় মালপত্র হারিয়ে যাওয়ায় তারা অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হন এবং ক্ষুধা ও পিপাসায় দুর্বল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় একটি তাঁবু দেখতে পেয়ে তারা সেদিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁবুটি ছিল এক বৃদ্ধা নারীর। হাসান (রা) বৃদ্ধা নারীকে বললেন, আমরা পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছি, আপনার কাছে পান করার মতো কোন কিছু আছে কি? বৃদ্ধা তার একটি বকরী এগিয়ে দিয়ে বলল, এ বকরী আমার, আপনারা এর দুধ পান করে নিন। তাঁরা তিন জনই বকরীর দুধ পান করে পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। অতপর হাসান (রা) বৃদ্ধাকে বললেন, আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্তও বটে, আপনার কাছে কিছু খাবার আছে কি? বৃদ্ধা বকরীটি তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এ বকরীটি ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই।

তোমরা এ বকরীটি যবাই করে তৈরি করে নাও, আমি লাকড়ীর ব্যবস্থা করে আনি। কসম আল্লাহর! তোমাদেরকে এ বকরী যবাই করে আহার করতেই হবে। অতঃপর বৃদ্ধার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাই করা হল। তাঁরা সেখানে পানাহার করলেন। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন এবং বিকালের দিকে গন্তব্যস্থলে যাত্রা করার সময় বৃদ্ধাকে বললেন, হে বৃদ্ধা! আমরা কুরাইশ বংশের মানুষ, হজ্জের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনলে তুমি আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে ইনশাআল্লাহ তোমার উপকার হবে। এ বলে তাঁরা চলে যাওয়ার পর বৃদ্ধার স্বামী বাড়িতে ফিরে সবকিছু শুনে বৃদ্ধার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হল এবং বৃদ্ধাকে ভর্ৎসনা করে বলল যে, অজানা-অচেনা মানুষের জন্য বকরীটি যবাই করেছ আবার বলছে তারা কুরাইশের লোক? বৃদ্ধার চুপ থাকা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না।

কিছুদিন পর চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বাধ্য হয়ে বৃদ্ধার পরিবারটি পবিত্র মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করল। উট এবং জানোয়ারের গোবর বিক্রি করে আয় রোজগার করা ছাড়া তাদের আর কোন পথ নেই। একদিন এ বৃদ্ধা মদীনা শরীফের পথে পথে

গোবর যোগাড় করার সময় হাসান (রা) বৃদ্ধাকে দেখে চিনতে অসুবিধা হয়নি। তিনি বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে বৃদ্ধা! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি দুজন সাথীসহ হজ্জের ভ্রমণে এত সনে এত তারিখে আপনার তাঁবুতে মেহমান হয়েছিলাম।

আর আপনি আমাদের মেহমানদারী করেছিলেন? বৃদ্ধা বললেন, আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না এবং আপনাকে চিনতে পরছি না।' হাসান (রা) বললেন, আপনি নাও চিনতে পারেন কিন্তু আমি আপনাকে ঠিকই চিনে ফেলেছি।' এ বলে এক হাজার বকরী কিনে সাথে নগদ এক হাজার দীনার বৃদ্ধাকে দিয়ে একজনের সাথে ভাই হুসাইনের কাছে প্রেরণ করলেন। হুসাইন (রা) বৃদ্ধাকে দেখার সাথে সাথে চিনতে পারলেন এবং লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'হাসান তাঁকে কি পরিমাণ দান করেছেন? তার মারফত পরিমাণ প্রসঙ্গে জেনে সেই পরিমাণ তিনি নিজেও দান করে লোকটির সাথে বৃদ্ধাকে চাচাতো ভাই ইবনে জাফরের কাছে পাঠালেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর বৃদ্ধাকে দেখেই চিনতে পারলেন এবং লোকটির মাধ্যমে হাসান এবং হুসাইনের প্রদত্ত সম্পদের পরিমাণ শুনে বললেন, 'যদি বৃদ্ধা আমার কাছে প্রথমে আসত, তাহলে আমি তাঁকে এত পরিমাণ দান করতাম যে, তাদের জন্য সে পরিমাণ দান করা অসম্ভব হতো।

অতঃপর তিনি দু'হাজার বকরী এবং দুই হাজার দীনার বৃদ্ধাকে দান করলেন। বৃদ্ধা সর্বমোট চার হাজার বকরী এবং চার হাজার নগদ দীনার নিয়ে নিজের আবাস ভূমিতে ফিরে গেল। একবার জনসাধারণ হাসান (রা)-কে প্রশ্ন করল, "অভাব অনটনের অবস্থাতেও আপনি কোন প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দেন না কেন?' তিনি জবাব দিলেন "যেহেতু আমি সবসময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে থাকি এবং পাওয়ার আশা রাখি তার বিমুখ হওয়াকে লজ্জা মনে করি, তাই কাউকে ফিরাতে আমার ভীষণ লজ্জাবোধ হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দান খয়রাতে অভ্যস্ত করেছেন, তিনি আমাকে অফুরন্ত নে'আমত দানে অভ্যস্ত যাতে আমি তাঁর দেয়া নে'আমত মানুষের মধ্যে পরিবেশন করি; কাজেই আমি দান-খয়রাত বন্ধ করলে আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলার নে'আমত প্রদানও বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি।" অতঃপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করেন, যার অর্থ নিম্নরূপ : "যদি আমর কাছে কোন ভিক্ষুক আসে তাহলে আমি তাকে মারহাবা বলে স্বাগত জানাই এবং তার প্রতি

দয়ার হাত বাড়াতে নিজের ওপর অপরিহার্য মনে করি। কেননা ভিক্ষুকের বরকতেই সকলের ওপর বরকত এবং ফযীলত অপরিহার্য হয়। ভিক্ষুকের প্রার্থনার সময়টি একজন যুবকের জন্য তার জীবনের সর্বোত্তম সময়।

সন্তানাদি : ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তিনি বহু বিবাহে অভ্যস্ত ছিলেন এবং তার কারণও বর্ণনা করেছি। তাঁর সর্বমোট সন্তান সন্ততির সংখ্যা ছিল ১১ জন। তাদের মধ্যে যায়েদ, হাসান ইবনে হাসান, কাসিম, আবূ বকর এবং আব্দুল্লাহ এ পাঁচজন স্বীয় চাচাজান হুসাইন (রা)-এর সাথে যুদ্ধে শরীক হন এবং শহীদ হন। অবশিষ্ট ছয়জন হচ্ছেন– আমর, আব্দুর রহমান, হুসাইন ইবনে হাসান, মুহাম্মাদ, ইয়াকুব এবং ইসমাঈল।

হাসান (রা)-এর বহু বিবাহ করার কারণ যৌনকামিতা এবং যৌবনের তাড়না ছিল না। এর কারণ ইতোপূর্বে স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন রাসূলের কন্যা ফাতেমা (রা)-এর সন্তান। তিনি ছিলেন নবীর নাতী, বিশ্বনবীর চরিত্রের সদৃশ এবং নমুনা, মুসলিম জাতি বিশেষত: কুরাইশদের স্মরণীয় নিদর্শন। তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সকল মানুষ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করত। তাদের আশা ছিল তাঁর সাথে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে নবী পরিবার এবং আহলে বাইতের সাথে বংশসূত্র লাভ করা যায়। নচেৎ তাঁর দুনিয়া বিরাগের দৃষ্টান্ত ইতিহাস অম্লান হয়ে রয়েছে। তাঁর সফর সাথী বা চলার পথে আরোহী গ্রহণ করতেন আর তিনি পায়ে হেঁটে চলতেন।

আদর্শের মূর্ত প্রতীক : এভাবে তিনি ১৫/২০টি হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি বলেন, পায়ে হেঁটে কা'বা ঘর যিয়ারত না করে তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে লজ্জাবোধ হয়। তিনি সর্বদা সিয়াম সাধনা এবং সারারাত নফল সালাত আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত সম্পদ খরচ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। ইবাদত, মুজাহাদা, দান খয়রাত, সমবেদনা এবং বাহাদুরীতে তিনি ছিলেন আদর্শ এবং মূর্ত প্রতীক। যুদ্ধের ময়দানে তার অসীম সাহসী ভূমিকার ঘটনাবলী মুসলিম ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে।

বীরত্ব ও সাহসিকতা : উসমান গণী (রা)-এর নিরাপত্তার তাগিদে বিদ্রোহী বাহিনী এবং খারেজীদেরকে প্রতিহতকরণের জন্য হাসান (রা) আপন ভাই হুসাইন এবং তদীয় গোলামকে নিয়ে যেভাবে পাহাড়াদারের দায়িত্ব পালন

করেছেন এবং দুঃসাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সেদিন শত্রু বাহিনী সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থই হয়েছিল এবং তাদের অগোচরে বাড়ির দেয়াল টপকিয়ে তাদেরকে ভিতর বাড়িতে পৌঁছতে হয়েছিল।

উসমান গণী (রা)-এর শাহাদাতের ফেৎনা প্রসঙ্গে হাসান (রা)-এর স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব অভিমত ছিল। তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতাকে কিছু লোকদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাকার পরামর্শ দেন, বরং ফেৎনার অবসান না হওয়া পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান ত্যাগ করে "ইয়াম্বুতে" অবস্থানের পরামর্শ দেন। এমনিভাবে উসমান গণী (রা)-এর শাহাদাতের পর সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তিনি পিতাকে খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে অন্যদের প্রতি অর্পণ করা এবং নিজের পক্ষে বাই'আত গ্রহণ না করার পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শ উপেক্ষিত হওয়ার কারণে তিনি পিতার সাথে রুঢ় আচরণে লিপ্ত হননি। বরং পিতার সাহচর্য অবলম্বন করেন এবং পিতার সাথে সকল যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। হ্যাঁ ইরাকের অভিযানে পিতাকে বসাবস্থায় দেখে চরমভাবে অশ্রুসিক্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সন্ধি স্থাপন : আলী (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়। মুসলিম জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসান (রা)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে তাঁকে খলিফা নির্বাচিত করে নেয়। কিন্তু এক শ্রেণীর বিদ্রোহী তৎপরতাকে তিনি ভালোভাবেই আঁচ করে নেন। এমতাবস্থায় কুফাবাসীগণ অবশ্য বিদ্রোহ দমনে প্রয়োজনে তাঁকে যুদ্ধের পূর্বাভাসও দেন, কিন্তু কুফাবাসীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং মতানৈক্য তদুপরি পিতা আলী (রা)-এর সাথে তাদের আচরণের প্রসঙ্গটি হাসান (রা)-এর সম্মুখে সুস্পষ্ট ছিল। এসব কিছু চিন্তা বিবেচনা করে হাসান (রা) মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে সন্ধিতে রাজী হন এবং খেলাফতের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করেন। মু'আবিয়া (রা) পরবর্তী খলিফা হিসেবে হাসান (রা)-এর নাম করার প্রস্তাব পেশ করলেও হাসান (রা) তাঁর প্রস্তাবকে এ বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, "পরবর্তী খলিফা মনোনীত হবে মজলিসে শুরার মাধ্যমে, মু'আবিয়া এককভাবে কোন খলিফা নিযুক্ত করতে পারবেন না।"

মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে হাসান (রা) বলেন, "হে লোক সকল! সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে যে পরহেযগার, তার গণ্ডমুখী সে যে পাপাচারী। খেলাফতের দায়িত্ব আমি

স্বেচ্ছায় মু'আবিয়া (রা)-এর ওপর ন্যস্ত করেছি। বাস্তবে সে এক হকদার হয়ে থাকলে তাঁর হক তাঁকে দেয়া হয়েছে। আর আমার হক হয়ে থাকলে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ এবং নিরাপত্তার জন্য এবং রক্তপাত এড়ানোর উদ্দেশ্যে আমি আমার অধিকার থেকে অব্যাহতি দান করেছি। যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের এবং তোমাদের প্রতি রহমত প্রদর্শন করেছেন এবং আমাদের দ্বারা অন্যদের রক্তপাত বন্ধ করেছেন।

৪১ হিজরী সনের জুমাদাল উলার মধ্যভাগে এ চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছিলেন : "আমার এ সন্তান সাইয়্যেদ, তার মাধ্যমে মুসলমানদের বিবাদমান দুটি দলের মধ্যে ফয়সালা সৃষ্টি হবে।"

নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, খেলাফতে রাশেদার সময় ৩০ বছর কাল পূর্ণ হবে। সত্যিকারে হাসান (রা)-এর খেলাফত থেকে অবসর গ্রহণ সময় পর্যন্ত ৩০ বছর পূর্ণ হয়। তাঁর এ অবসর গ্রহণের বিষয়ে সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হলে তিনি বলেন, অযথা এর অধিক রক্তে রঞ্জিত লোকেরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ তা'আলা! আমাদেরকে কেন বিনা অপরাধে হত্যা করা হল? এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সামনে আমার জন্য উপস্থিত হওয়া খুবই অপছন্দনীয়।

কিছু মূল্যবান বাণী : খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পর তিনি মদীনায় অবস্থান করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র এবং মিষ্টভাষী। সদাচরণ, সহনশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মধুর চরিত্রের অধিকারী হিসেবে তিনি ছিলেন সকলের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত, সকলের প্রিয়পাত্র। প্রতিদিন ফজরের সালাত আদায় করে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের কাছে হাজির হতেন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করতেন, খোঁজ খবর নিতেন এবং হাদিয়া পেশ করতেন। আর যোহরের সালাত আদায় করে মজলিসে বসতেন এবং সমবেত মুসল্লিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতেন। অধিকাংশ সময় সাহাবায়ে কেরামের সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাতের কথা বর্ণনা করতেন। তাঁর তালিম-তরবিয়ত এবং কিছু বক্তব্যের নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো–

আলী (রা) হাসানকে প্রশ্ন করলেন,

১. "সদাচার কাকে বলে?" জবাবে তিনি বললেন, "সততার মাধ্যমে অসত্যকে প্রতিহত করে সততাকে জয় করা।"

২. ভদ্রতা কাকে বলে? জবাব দিলেন : পরিবার-পরিজনের প্রতি দয়া করা এবং তাদের অসদাচরণের মোকাবেলায় ধৈর্য অবলম্বন করা।

৩. উদারতা এবং দানশীলতা কাকে বলে? জবাব দিলেন : স্বচ্ছলতা এবং অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় ব্যয় যথার্থ পথে করা।

৪. কমিনা কাকে বলে? জবাব দিলেন : ইজ্জত সম্মান বিকিয়ে অর্থ সম্পদ কুক্ষিগত করা।

৫. কাপুরুষতা কাকে বলে? জবাব দিলেন : বন্ধুর প্রতি দুঃসাহসী হওয়া এবং দুশমন থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

৬. অমুখাপেক্ষীতা কাকে বলে? জবাব দিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকা।

৭. ধৈর্য কাকে বলে? জবাব দিলেন : ক্রোধকে দমন করা এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

৮. সম্মান কাকে বলে? জবাবে বললেন : বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং ন্যায়নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করার সময় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা।

৯. অপমান কাকে বলে? জবাবে বললেন : বিপদের সময় অস্থির এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাওয়া।

১০. ছলচাতুরী এবং বানোয়াটি কাকে বলে? জবাবে বললেন : অনর্থক কথা বলা।

১১. মহত্ত্ব কাকে বলে? জবাবে বললেন : ঋণগ্রস্ত অবস্থায় দান খয়রাত করা এবং অপরাধীকে মার্জনা করা।

১২. নেতৃত্ব কাকে বলে? জবাবে বললেন : সৎকর্মপরায়ণ হওয়া এবং পাপকার্য পরিত্যাগ করা।

১৩. বোকামী কাকে বলে? জবাবে বললেন : নিম্নশ্রেণীর লোকদের সাহচর্য অবলম্বন এবং গোমরাহ ব্যক্তিবর্গকে ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করা।

১৪. গাফলতী কাকে বলে? জবাবে বললেন : মসজিদ বিমুখ হওয়া এবং অসৎ লোকদের আনুগত্য করা।

হাসান (রা) অনেক সময় বলতেন, তিন কারণে মানুষ ধ্বংস হয় : অহংকার, লোভ এবং হিংসা। তিনি বলেন, অহংকারের কারণে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি বিনষ্ট হয়, এ কারণেই ইবলীস অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছে। আর লোভ হচ্ছে কলবের শত্রু, যে কারণে আদম (আ) জান্নাত থেকে বঞ্চিত হন। আর হিংসা হলো পাপীদের গোয়েন্দা, এ কারণেই কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছে।

হাদীস বর্ণনা : তিনি সর্বমোট ১৩টি হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন পুত্র হাসান (রা) রাবীয়া (রা) আবু ওয়ায়িল (রা) এবং ইবনে সিরীন প্রমুখ। কমপক্ষে ১৬২টি বর্ণনার সাথে ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা)-এর সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

হাসান (রা) ৫০ হিজরীতে (মতান্তরে ৫১ হিজরীতে) মৃত্যুবরণ করেন।

বস্তু স্বার্থ পরিহারকরণ, উম্মতের রক্তপাত বন্ধকরণ, উম্মতের পরিশুদ্ধতা লাভ, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ত্যাগ-তিতীক্ষা বিশ্ব মুসলিম জগতে চির অমর হয়ে আছে। এসব কিছু তিনি এজন্য করেছিলেন যাতে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পুরস্কৃত হতে পারেন। কাজেই হে আল্লাহ্ তা'আলা! আপনি তাঁকে পুরস্কৃত করুন এবং তাঁর প্রতি অশেষ রহমত বর্ষণ করুন।

শ্রেষ্ঠ শহীদের খেতাব : হুসাইন আমার, আমি হুসাইনের; যে হুসাইনকে ভালোবাসবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ভালোবাসবেন। হাসান হুসাইন নবী বাগানের সুগন্ধিময় দুটি ফুল। জান্নাতী যুবকদের সর্দারকে দেখতে যার মনে চায় সে হুসাইনকে যেন দেখে। হাসান আমার প্রভাব এবং নেতৃত্ব আর হুসাইন আমার সাহস আর উদারতার মূর্ত প্রতীক।

১৫. ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রা)

নবী করীম ﷺ-এর অন্তরে হাসান-হুসাইনের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা এবং মর্যাদা বিদ্যমান থাকার বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামগণই অবগত ছিলেন। জানা ছিল বলেই আবু বকর সিদ্দীক (রা) হাসান এবং হুসাইনকে কোন সময় রাস্তাঘাটে পেলে 'খলিফাতুর রাসূল' বলে তাদের দু'জনকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন এবং চুম্বন করে বলতেন, "হাসান-হুসাইন নবীর মতো, আলীর মতো নয়। আলী (রা) খলিফাতুর রাসূলের বাণী শুনতেন, আর হেসে হেসে চলে যেতেন।

হাসান ও হুসাইন (রা) জান্নাতে ঐ সমস্ত লোকদের সরদার হবেন যারা যৌবনকালে মৃত্যুবরণ করেছে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হাসান ও হুসাইন (রা) জান্নাতী যুবকদের সরদার হবে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকেব, বাব মানাকেব আবু মুহাম্মদ আল হাসান ওয়াল হুসাইন)

নাম ও পরিচিতি : নবী বাগানের ফুল এবং দ্বিতীয় দৌহিত্র হুসাইন (রা)। উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর এ সন্তান বনী হাশেমের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং কুরাইশদের আদর্শ যুবক। নবী করীম ﷺ-এর প্রাণপ্রিয় কন্যা কলিজার টুকরা ফাতেমা (রা) হচ্ছেন তার মা।

জন্মগ্রহণ : ৪ হিজরী সনে শাবান মাসের পাঁচ তারিখে মদীনায় নয়নের মনি হুসাইন (রা) জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ হাসান (রা)-এর জন্মের সময় যা কিছু করেছিলেন, হুসাইন (রা)-এর জন্যও তা করেন।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সপ্তম দিন আক্বীকার সুন্নাত পালন করে মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলেন এবং চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকাহ্ করে ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হুসাইন (রা)-এর অসংখ্য গুণাবলী এবং অগণিত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে 'যাকী' 'রাশীদ' 'তাইয়্যেব' 'সাইয়্যেদ' 'মুবারক' এবং 'আল্লাহর আনুগত্যকারী' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। নবী করীম ﷺ হাসান এবং হুসাইন এর সুস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার জন্য নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন–

أُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ـ

শয়তান জীব জানোয়ার এবং মানুষের বদ-নজরের আছর থেকে আল্লাহর কালামের সাহায্যে তোমাদের দু'জনের জন্য আশ্রয় কামনা করছি।

নবী সাদৃশ্য : ফাতেমা (রা) হাসানের মতো হুসাইনের সাথেও কৌতুক করে বলতেন, "হুসাইন নবীর মতো, আলীর মতো নয়।" বলা হয় যে, হাসান (রা)-এর বক্ষ থেকে মাথা পর্যন্ত নবীর সদৃশ ছিল। আর হুসাইন (রা)-এর বক্ষ থেকে পা পর্যন্ত নবীর সদৃশ ছিল।

দৈহিক কাঠামো : হুসাইন (রা) তার নানা নবী করীম ﷺ-এর মতো গড়নে মধ্যম ছিলেন, না অতি দীর্ঘ-না খাটো। লাল মিশ্রিত সুন্দর ছিলেন। প্রশস্ত চেহারা এবং ঘন দাড়ির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বক্ষ এবং গর্দান প্রশস্ত ছিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়া ছিল মোটা ধরনের। বড় আকৃতির পা, অল্প কোকঁড়ানো চুল ও অতি সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল অতি প্রাঞ্জল ও মধুর। হুসাইন (রা)-এর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রফুল্লতা।

হুসাইন (রা) ছিলেন সর্বাধিক ইবাদতকারীও সর্বদা সিয়াম সাধনাকারী। তিনি সারারাত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি নবী ঘরানায় লালিত-পালিত হন। তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে শ্রদ্ধেয় নানাজান বিশ্ব নবীর মহত্ত্ব, পিতার ইলম ও জ্ঞান এবং জননীর দুনিয়া বিরাগিত অর্জন করেন।

রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা : তিনি এবং তাঁর ভাই হাসান (রা) ছিলেন আহলে বাইতের লোকদের মধ্যে নবী করীম ﷺ-এর সর্বাধিক প্রিয়, সর্বাধিক স্নেহভাজন এবং নিকটতম। তাদের প্রসঙ্গেই বিশ্বনবী ইরশাদ করেন–

أَحَبُّ أَهْلِ بَيْتِي إِلَيَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ .

আহলে বাইতের লোকদের মধ্যে আমার সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে হাসান এবং হুসাইন।

ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীসে ইবনে মুররা বলেন, "মুহাম্মদ ﷺ সাহাবাদেরকে নিয়ে কোন এক সাহাবীর দাওয়াতে গমন করছিলেন, এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ-কে রাস্তার পাশে দেখতে পান। নবী করীম ﷺ তাঁর দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে তাঁকে আহ্বান করলেন আর সে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করে। নবী করীম ﷺ তাঁকে ধরে ফেললেন এবং তাঁর একটি হাত থুঁতনীর নিচে আর একটি হাত মাথার ওপর ধারণ করে তাঁকে চুমু দিলেন, আর ইরশাদ করেন, হুসাইন আমার আমি হুসাইনের, যে হুসাইনকে মহব্বত করবে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবে।

হাসান এবং হুসাইনকে না দেখলে নবী করীম ﷺ পেরেশানী হয়ে পড়তেন তাদের দু'জনকে সম্মুখে নিয়ে আসতে বলতেন। অনেক সময় নিজে তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং নাকের দ্বারা তাদের ঘ্রাণ নিতেন। অনেক সময় তাঁরা দু'জনই নবীর পিঠে উঠে পড়তেন। ওপরন্তু বিশ্বনবীর সিজদাবস্থায় তাঁর পিঠের ওপর উঠে যেতেন আর তাদের নেমে যাওয়ার অপেক্ষায় নবী করীম ﷺ সিজদায় পড়ে থাকতেন।

একবার সাহাবায়ে কেরাম দীর্ঘ সিজদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিশ্বনবী ﷺ জবাবে বললেন, "আমার দুই সন্তান আমাকে তাদের আরোহী বানিয়েছিল, তাই আমি তাড়াহুড়া করিনি।"

এ বিষয়েই কোন কবি বলেন : বিশ্বে হুসাইনের মতো কে আছে, যে নিজে মাহমুদ (প্রশংসিত) এবং মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)-এর পিঠকে আরোহী বানাতে পেরেছে? হাসান, হুসাইন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রা)-এর প্রতি নবী করীম ﷺ-এর বিশেষ অফুরন্ত ভালোবাসা থাকার কারণেই তিনি তাদেরকে অল্প বয়সেই বাই'আত করেছিলেন। অন্যথায় অল্প বয়সে আর কাউকে বাই'আত করেননি।

নবী করীম ﷺ-এর অন্তরে হাসান-হুসাইনের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা এবং মর্যাদা বিদ্যমান থাকার বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামগণই অবগত ছিলেন। জানা ছিল বলেই আবু বকর সিদ্দীক (রা) হাসান এবং হুসাইনকে কোন সময়

রাস্তাঘাটে পেলে 'খলিফাতুর রাসূল' বলে তাদের দু'জনকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন এবং চুম্বন করে বলতেন, "হাসান-হুসাইন নবীর মতো, আলীর মতো নয়। আলী (রা) খলিফাতুর রাসূলের বাণী শুনতেন, আর হেসে হেসে চলে যেতেন।

রাসূলের গুণাবলীর প্রতিফলন : নবী করীম ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় হাসান এবং হুসাইনকে নিয়ে ফাতেমা (রা) বিশ্বনবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এ দুই সন্তানকে আপনার ওয়ারিস হিসেবে গ্রহণ করুন।" নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন–

أَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ سَخَائِيْ وَهَيْبَتِيْ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ شَجَاعَتِيْ وَسُؤْدَدِيْ -

হাসানের মধ্যে রয়েছে আমার দানশীলতা ও প্রভাব আর হুসাইনের মধ্যে রয়েছে আমার বীরত্ব ও নেতৃত্ব।

বাস্তবিক পক্ষেও হাসান (রা) নিজের মধ্যে নবী করীম ﷺ এর দানের মহান চেতনা এবং প্রভাব উপলব্ধি করতেন। মানুষ তাঁর সম্মুখে চোখ তুলে দেখার সাহস পেত না। এমনিভাবে হুসাইন (রা) নিজের মধ্যে নবী করীম ﷺ-এর বীরত্ব এবং নেতৃত্ব উপলব্ধি করতেন। তিনি ছিলেন মহান নেতৃত্বের অধিকারী এবং সাহসী বীর।

মোটকথা তাদের দু'জনের মধ্যে বিশ্বনবী ﷺ-এর গুণাবলী পাওয়া যায়। যারা তাদেরকে দেখেছে, তাঁদের সাথে সাক্ষাত লাভ করেছে তাদের বক্তব্য এবং ঘটনাবলী বিশ্ব ইতিহাসকে অলংকৃত করে রেখেছে। আমরা এখানে তার আংশিক কিছু বর্ণনা পেশ করেছি। হুসাইন (রা)-এর ব্যক্তিত্ব বিশ্ব মুসলিমের অন্তরে অমর হয়ে আছে, এর বেশি তাদের পরিচয় উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন।

কারণ, যুবকদের মধ্যে হুসাইন (রা)-এর মতো ভূমিকা পালনকারী কেউ আছে কি? কেউ আছে কি সংকট এবং বিপদের সময় তাঁর মতো দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী বীর এবং নির্ভীক সাহসী? আছে কি আবু আব্দুল্লাহ হুসাইন (রা)-এর মতো কোন নেতা, জীবদ্দশায় এবং শাহাদাতের পরও যার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং ভক্তি বিশ্ব মানবের অন্তরকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে?

বাল্যকাল থেকেই হুসাইন (রা)-এর মধ্যে বিশ্বনবী ﷺ-এর মহান চরিত্র এবং নেতৃত্ব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের অনুভূতি ও গুণাবলি ছিল। বাল্যকালেরই ঘটনা, একবার হুসাইন (রা) মদীনার মসজিদে গমন করে ওমর (রা)-কে নবী করীম ﷺ-এর মিম্বরে বসে খুতবা প্রদান করতে দেখেন। আর দেখেই বলে উঠলেন, 'আমার নানার মিম্বর থেকে নেমে পড়ুন এবং আপনার পিতার মিম্বরে গিয়ে বসুন।' ওমর (রা) নেহায়েত কাতর সূরে বললেন, 'আমার পিতার তো কোন মিম্বর নেই।' এ বলে ওমর (রা) বালক হুসাইনকে উঠিয়ে নিজের সাথে মিম্বরে বসিয়ে দিলেন এবং খুতবা শেষে তাঁকে হাতে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমাকে যা বলেছ তা তোমাকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছিল কি?" বালক হুসাইন বললেন, 'না, আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি, আমি নিজ থেকেই বলেছি। ওমর (রা) বললেন, 'হে প্রাণাধিক প্রিয় হুসাইন! তোমার যখনই ইচ্ছা হয় তখনই আমার কাছে চলে আসবে, অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই।'

হাসান ও হুসাইন (রা) উভয়ই মাতা-পিতা এবং নানাজানের যেমন ছিলেন জ্ঞান ও তাকওয়ার যোগ্যতার উত্তরাধিকার, তেমনি ছিলেন দাওয়াত ও তাবলীগের পরহেযগারী। হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থ আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসায়ীসহ হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে তাদের সূত্রে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাসান-হুসাইনের সাথে উমারের আচরণ : একদা উমার (রা) হাসান ও হুসাইন (রা)-কে পাঁচ হাজার করে হাদিয়া দেন এবং নিজ সন্তান আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমারকে এক হাজার প্রদান করেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) পিতাকে বললেন, "আপনি জানেন আমি তাঁদের দু'জনের আগে ইসলাম কবুল করেছি এবং হিজরত করেছি, অথচ আপনি তাদের দু'জনকে পাঁচ হাজার করে হাদিয়া দিলেন আর আমাকে দিলেন মাত্র এক হাজার, ওপরন্তু তাঁরা দু'জনই বয়সে ছোট, মদীনার অলিতে-গলিতে খেলাধূলা করে বেড়ায়। এর জবাবে পিতা উমার (রা) বললেন "চুপ থাক হে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার! তোমার কি তাঁদের দু'জনের নানার মতো নানা আছে? আছে কি তাঁর পিতার মতো পিতা?"

হুসাইন নিজেই একবারের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, এক সময় উমার (রা) এবং মু'আবিয়া (রা) নির্জনে বসে আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত ছিল। এমতাবস্থায় আমি উপস্থিত হয়ে দেখি ইবনে উমার (রা) অনুমতির প্রতীক্ষায় দরজায় বসে আছেন।

অবশেষে অনুমতি না পাওয়ার কারণে ফিরে যান। আমিও তাঁর সাথে সাথে ফিরে আসলাম। পরে একদিন উমার (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, 'কি ব্যাপার! তোমাকে আর যে দেখি না, আস না কেন? আমি বললাম, 'হে আমীরুল মু'মিনীন!, আমি এসেছিলাম– এসে দেখলাম আপনি মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে নির্জনে নিভৃতে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, আর অনুমতি না পেয়ে আপনার সন্তান ইবনে উমার ফিরে যাচ্ছে, তাই আমি তার সাথে ফিরে যাই। উমার (রা) বললেন, 'হে হুসাইন! আমার পুত্র আব্দুল্লাহর চেয়ে তোমার অধিকার বেশি, তোমরা আমাদের মাথার মুকুট, আমাদের মাথার চুলগুলো পর্যন্ত তোমাদের অবদানের ফলাফল। আল্লাহ্ তা'আলার পর তোমাদের অবদানে এ চুলগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

উমার (রা)-এর খেলাফতের যুগে পারস্য বিজয়ের সময় বন্দী শিবিরে পারস্য সম্রাটের মেয়েরা বন্দী হয়ে এলে আলী (রা) তাদেরকে খরিদ করেছিলেন এবং একজনকে তিনি হুসাইনকে হাদিয়াস্বরূপ দান করেছিলেন। তখন উমার (রা) হুসাইনকে স্বাগতম জানিয়ে বলেছিলেন যে, তোমার এ ঘরণীর বুকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সন্তান জন্ম নেবে। যয়নুল আবেদীনের জন্মের মাধ্যমে উমার (রা)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়।

বীরত্ব ও সাহসিকতা : উসমান গণী (রা)-এর খেলাফত আমলে হাসান (রা)-এবং হুসাইন (রা) বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আফ্রিকা, তারাবলুস (ত্রিপলি), মাগরিবা (পশ্চিম আফ্রিকা) অভিমুখী অভিযানে তারা অংশগ্রহণ করেন। ৩০ হিজরীতে সা'আদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর এশিয়া এবং তাবারিস্তান বিজয় যুদ্ধেও তারা দু'জন অংশগ্রহণ করেন। যখন খারিজী এবং অন্যান্য বিদ্রোহীরা উসমান (রা)-কে ঘিরে ফেলেছিল, তখন তাদেরকে প্রতিহত করা প্রসঙ্গে হাশেমী গোত্রের যে সমস্ত যুবকেরা নিষ্ঠার সাথে ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে আলী (রা)-এর আদেশক্রমে তাঁদের দুজনের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

বিদ্রোহীদের দমন করতে গিয়ে তাঁদের দু'জনকেই মারাত্মকভাবে আহত হতে হয়েছিল। উসমান গণী (রা)-এর আবাসস্থল জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভিতর বাড়িতে পৌঁছার বিদ্রোহীদের চরম প্রয়াসের বিরুদ্ধে হাসান (রা) এবং হুসাইন (রা)-এর সতর্কমূলক কঠোর প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়।

বিদ্রোহীরা কিছুতেই ভিতর বাড়িতে পৌঁছতে পারেনি। অবশ্য এরূপ কঠোর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কোন এক ঝামেলাপূর্ণ মুহূর্তে পক্ষের কিছু পাপিষ্ঠ অজ্ঞাতে দেয়াল টপকিয়ে ভিতর বাড়িতে প্রবেশ করে উসমান গণী (রা)-কে হত্যা করে।

উসমান গণী (রা)-এর শাহাদাতের পর আলী (রা) খলিফা নিযুক্ত হন। এ সময়ও তাঁরা দু'জন প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন এবং পিতাকে সঠিক বুদ্ধি পরামর্শ দেন ও সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা উভয়েই পিতার সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আলী (রা) অবশ্য এ সমস্ত বিষয়ে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াকে অগ্রাধিকার দিতেন। কিন্তু তাতে তাঁরা কোন সময় বিরক্ত হননি, বরং স্বতস্ফূর্তভাবেই খলিফাতুল মুসলিমীনের প্রতি সার্বিক সহযোগিতা ও পরিপূর্ণ আনুগত্য অব্যাহত রাখেন। মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াকে এ অগ্রাধিকারের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় উত্তর দেন–

كَانَ عَيْنَيْهِ وَكُنْتُ يَدَهُ وَالْمَرْءُ يَقِيْ عَيْنَيْهِ بِيَدِهِ .

হাসান হুসাইন আলীর দুটি চক্ষু আর আমি হলাম তাঁর হাত, মানুষ হাতের দ্বারা চক্ষুকে রক্ষা করে থাকে।

আলী (রা)-এর অসিয়ত : যে পরিবেশে হাসান-হুসাইন (রা) লালিত পালিত হয়েছেন, সে পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক জানার জন্য আল্লাহর দুশমন পাপিষ্ঠ ইবনে মুলজিমের আঘাতে শাহাদাত বরণের সময় আলী (রা) নিজ সন্তানদেরকে অমূল্য অসিয়ত করেছিলেন। আলী (রা) অসিয়ত করেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ভয়-ভীতির উপদেশ দিচ্ছি। মুসলমান না হয়ে যেন তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ কর না। তোমরা সকলে একতাবদ্ধভাবে আল্লাহ তা'আলার রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করবে। সাবধান! কখনও বিভক্ত হয়ো না। কেননা নবী করীম ﷺ-কে আমি এ বলতে শুনেছি, পরস্পরে সমঝোতা সালাত এবং রোযা থেকেও শ্রেয়।

পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বারবার সতর্ক করেছি, তোমাদের কোন কর্মকাণ্ড যেন এর বিধি নিষেধের বহির্ভূত না হয়। ফকীর মিসকীনদের সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বারবার ভীতি প্রদর্শন করছি, তোমাদের জীবন উপকরণে তাদেরকে সর্বদা অংশীদার রেখ। আল্লাহ তা'আলার অংশীদার তোমরা কারো ভর্ৎসনার কখনো পরওয়া কর না। তোমাদের বিরুদ্ধে ঈর্ষা পোষণকারীদের

ইচ্ছা এবং সীমালংঘন তোমাদের পক্ষে তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হবে। কখনও সৎকাজের উপদেশ এবং খারাপ কাজের প্রতিরোধ করা থেকে বিরত থেক না। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষের সাথে সদাচরণ কর, মানুষের সাথে সু-সম্পর্ক অটুট রাখবে। কখনও পাপ এবং নিকৃষ্ট কাজে সহযোগিতা করো না।"

অতঃপর মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে এ নসিহত করেন, "হাসান এবং হুসাইনের ব্যাপারে তোমার ওপর পূর্ণ অধিকার রয়েছে, তাই আমি তাদের অধিকার আদায়ের প্রতি এবং তাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদের দু'জনকে উপেক্ষা করে তুমি কখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর না।"

অতঃপর হাসান হুসাইনকে লক্ষ্য করে বলেন, "তার ব্যাপারে আমি তোমাদের দু'জনকে বিশেষভাবে অসিয়ত করছি। সে কিন্তু তোমাদের পিতারই সন্তান। তোমরা অবশ্যই জান যে, তোমাদের পিতা তাকে খুব ভালোবাসতেন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয়ে অর্পণ করে বিদায় নিচ্ছি। তোমাদের প্রতি শান্তি এবং মহান আল্লাহ্র অফুরন্ত রহমত ও বরকত নাযিল হোক।"

খেলাফত গ্রহণ : আলী (রা)-এর শহীদ হওয়ার পর হাসান (রা) মুসলমানদের খলিফা মনোনীত হন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে আসন্ন সংঘর্ষ এবং রক্তপাত ও যুদ্ধ এড়িয়ে যাবার জন্য খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণকে উত্তম মনে করেন। তবে হুসাইন (রা)-এর বিবেচনায় হাসান (রা)-ই ছিলেন ফেলাফতের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর মতে আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের প্রশাসক হিসেবে হাসান (রা)-ই ছিলেন মু'আবিয়া (রা) এবং সমকালীন যে কোন লোকের তুলনায় অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু হাসান (রা) তাঁর কারণে মুসলমানদের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হোক অথবা রক্তক্ষয় সংঘর্ষ হোক তা মোটেই পছন্দ করেননি। তাই তিনি খেলাফতের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ধৈর্যধারণ করেন। হুসাইন (রা) ভাইয়ের অভিমত এবং সিদ্ধান্তকে এ বলে মেনে নেন যে, 'আপনি পিতা আলীর বড় ছেলে এবং তাঁর খলিফা, আমাদের মতামত আপনার মতামতের অধীন।

হাসান হুসাইনের মর্যাদা : হাসান এবং হুসাইনের মর্যাদা এবং অবস্থান সমকালীন সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীনদের দৃষ্টিতে ছিল সর্বোচ্চে। ইবনে আব্বাস (রা) তাদের দু'জন থেকে বয়সে বড় ছিলেন। তিনি ছিলেন আলী

(রা)-এর চাচাতো ভাই। অগাধ জ্ঞান এবং বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হাসান এবং হুসাইনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাদের উটের ওপর গদি বিছিয়ে দিতেন এবং নিজ হাতে ধরে ধরে তাঁদেরকে আরোহণ করাতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বলেন, "তোমরা কি জান, এ দু'জন লোক কে? তারা নবী করীম ﷺ-এর আদরের সন্তান। আমার প্রতি নবী করীম ﷺ-এর বর্ণনাতীত অবদান থাকা সত্ত্বেও কি আমি তাদের বাহনের পিঠে গদি বিছিয়ে দিব না।"

একবার হুসাইন (রা) কাউকে দাফন করার উদ্দেশ্যে কবরের দিকে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় তাঁর পায়ে ময়লা-আবর্জনা লেগে যায়। এমতাবস্থায় আবু হুরায়রা (রা) দৌড়ে এসে নিজ বস্ত্র দিয়ে তাঁর পা মোবারক মুছে পরিষ্কার করে দেন। হুসাইন (রা) বললেন, 'আমাকে, "আপনি কি করছেন! আবু হুরায়রা (রা) বললেন, 'আমাকে একটু খেদমত করার সুযোগ দিন। আপনার সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তা যদি অন্য মানুষ জানত তাঁরা আপনাকে সর্বদা তাদের কাঁধের উপর উঠিয়ে রাখত।

আন্তরিকতা এবং ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে অনেক সাহাবা মৃত্যুবরণ করার সময় তাদের সহায় সম্পত্তির এক বিশেষ অংশ হাসান হুসাইনের জন্য নির্ধারিত করে যান। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবেই মেকদাদ ইবনে আমর (রা) তাদের দু'জনের জন্য ইন্তিকালের সময় ৩৬ হাজার দেরহাম দেয়ার অসিয়ত করে যান।

জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা : হুসাইন (রা) নানাজানের মসজিদে নিয়মিতভাবে দ্বীনী এবং ইলমী দরসের অনুষ্ঠান করতেন, সেখানে অগণিত জ্ঞান পিপাসু ফিকহ, তাফসীর এবং হাদীসসহ বিভিন্ন দ্বীনী বিষয়বস্তুতে জ্ঞান আহরন এবং আল্লাহ্ তা'আলার মারেফত লাভে ধন্য হতেন। কুরআন ও হাদীসের গবেষণার ক্ষেত্রে হুসাইন (রা)-এর নিমগ্নতা একাত্মতা এবং একাগ্রতার বিষয়টি যথাযথভাবে ধারণা করা যায় এ ঘটনা থেকে যে, কোন একদিন এক কুরাইশী লোক মু'আবিয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন হুসাইনকে কোথায় পাব? তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ-এর মসজিদে প্রবেশ করে দেখবেন অসংখ্য মানুষ একজনকে ঘিরে ধরে এমন নিরব নিস্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন যে, তাদের মাথার ওপর

পাখিরাও বসে থাকতে পারে। ঐ মজলিসটি হচ্ছে আবূ আব্দুল্লাহ হুসাইন (রা)-এর মজলিস। আর অর্ধ পায়ের গোছা পর্যন্ত লুঙ্গি পড়া ব্যক্তিটিই হচ্ছেন তিনি, যাকে আপনি সন্ধান করছেন।

কবিতা আবৃত্তি : হুসাইন তাঁর ঐতিহাসিক জীবনে অনেক কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তিনি কবিতা আবৃত্তি করে বলতেন–

* ইহকাল তোমার দৃষ্টিতে শোভনীয় বিবেচিত হলে তুমি জেনে নিও আল্লাহর প্রতিদান এর চেয়েও বেশি মূল্যবান ও উত্তম।
* জীবিকা নির্ধারিত এবং প্রত্যেকের জন্য বণ্টন করা আছে। তাই লোভাতুর হয়ে সম্পদ অর্জনের পেছনে দৌড়ানো নিষ্ফল প্রচেষ্টা মাত্র।
* সম্পদ রেখে যাওয়ার বস্তু, তাই পরিত্যক্ত সম্পদের বেলায় মানুষ অতি কৃপণ কেন হয়?
* যুগ তোমা থেকে তার চক্ষু দুটিকে বিরত রেখেছে, কাজেই তুমি সৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না।
* আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো কাছে করুণা ভিক্ষা কর না, কেননা গোটা বিশ্বে প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র তিনিই করুণাশীল।
* যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও আর গোটা বিশ্ব বিচরণ কর, ভালো-মন্দ করতে সক্ষম এমন কাউকে তুমি পাবে না।

হুসাইন (রা)-এর দানশীলতা ও সহানুভূতি : হুসাইন (রা) ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, সহানুভূতিশীল এবং দয়াশীল চিত্তের অধিকারী। যা কিছু তাঁর হাতে আসত তা সম্পূর্ণই তিনি অভাবগ্রস্ত এবং ফকীর মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন, এর সমান্য অংশও কোন দিন জমা করে রাখতেন না। তিনি অনেক সময় বলতেন–

* আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অফুরন্ত নে'আমত দান করেছেন, তাই মানুষ তাদের প্রয়োজনের দরুণ তোমাদের শরণাপন্ন হয়। কাজেই বিরক্তি বোধ কর না, তাহলে কিন্তু নে'আমত তোমাদের থেকে হারিয়ে যাবে।
* দায়গ্রস্ত ব্যক্তি হাত পাতার কারণে স্বীয় সম্মান রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে, কাজেই তুমি তাকে ফেরত না দিয়ে নিজ সম্মান রক্ষা কর।

* ধৈর্য মানুষের জন্য সৌন্দর্য। সদাচরণ হচ্ছে মানবতার মূর্ত প্রতীক। আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারা সৌভাগ্যের কথা। বেশি সম্পদ বরকতহীনতার চিহ্ন। কাজে কর্মে তড়িঘড়ি করা বোকামী, আর বোকামী হচ্ছে এক ধরনের দুর্বলতা। সীমালংঘন অমুক্তির সনদ। মন্দ ব্যক্তিবর্গের সাহচর্য অপমানের পথ সুগম করে। আর ফাসেক ফাজেরদের সংশ্রব সন্দেহের কারণ উদয় হয়।

এক ভিক্ষুক হুসাইন (রা)-এর দরজায় করাঘাত করে কবিতা আবৃত্তিপূর্বক বলল, আজ আপনার কাছে আশাবাদী, অবশ্যই নিরাশ হব না। কেননা যে আপনার দরজায় করাঘাত করে সে কখনও নিরাশ হয় না। হুসাইন (রা) সালাতে নিমগ্ন ছিলেন, ভিক্ষুকের কবিতা আবৃত্তির কারণে তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে অভাবগ্রস্ত এবং ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে দেখা মাত্র গোলামকে আহ্বান করে বললেন, ব্যয়ের অতিরিক্ত আমাদের কাছে কি পরিমাণ সম্পদ রয়েছে?

গোলাম দ্রুত জবাব দিল, 'আহলে বাইতের ব্যয়ের জন্য আপনার প্রদত্ত দু'শত দেরহাম সংরক্ষিত রয়েছে।' হুসাইন (রা) বললেন, শীঘ্রই এনে আমার নিকট নিয়ে এসো, কারণ তাদের তুলনায় অধিক হকদার এসে পড়েছে। অতঃপর দুশত দেরহাম ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিয়ে বেশি পরিমাণ দিতে না পারার কারণে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। দুইশত দেরহাম হাতে নিয়ে ভিক্ষুক পূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করে বলল, "অর্থভাণ্ডার খালি হলে কি হবে– তাঁরা অতি নির্মল এবং পাক-পবিত্র, তাদেরকে স্মরণ করে মানুষ তাদের প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করে থাকে। আপনারা সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, কেননা আপনাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে পবিত্র সূরা এবং পবিত্র কুরআন।"

উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-এর ৬০০ হাজার দেরহাম ঋণ ছিল। মৃত্যু সন্নিকটে। এজন্য তিনি ভীষণ চিন্তিত ছিলেন। হুসাইন (রা) বিষয়টি অবগত হয়ে সম্পূর্ণ ঋণ নিজ মাল হতে পরিশোধ করে দেন।

সদাচরণ : একদিন হুসাইন (রা)-এর এক দাসী সালামের মাধ্যমে একটি ফুলের তোড়া হাদিয়া দিলে তিনি বিনিময় হিসেবে উক্ত দাসীকে মুক্ত করে দেন। আনাস (রা) বললেন, 'একটি ফুলের তোড়ার বিনিময়ে একটি দাসীকে আজাদ করে দিলেন? হুসাইন (রা) বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ সদাচরণই শিক্ষা দিয়েছেন।'

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَا ۔

যদি কেউ তোমাদেরকে সালাম প্রদান করে তাহলে তোমরা তার চেয়ে উত্তম অথবা অনুরূপ সালাম দিও। (সূরা নিসা : আয়াত-৮৬)

সে আমাকে ফুলের তোড়া দেয়ার সময় সালাম দিয়েছে তাই উত্তম জবাব হিসেবে আমি তাকে আজাদ করে দিলাম।

হুসাইন (রা)-এর আদব এবং সদাচারণের একটি ঘটনা এরূপ বর্ণিত রয়েছে যে, একবার হুসাইন (রা) এবং তার ভাই মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়ার মধ্যে কোন কারণে মতোবিরোধ দেখা দেয়। তখন মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া এ মর্মে একটি পত্র লেখেন, "আল্লাহ তা'আলার নামে মুহাম্মদ ইবনে আলীর পত্র হুসাইন ইবনে আলীর কাছে। আপনি মর্যাদার যে স্তরে রয়েছেন আমি সে স্তরে পৌঁছতে অক্ষম, তবে আলী যেমন আপনার পিতা তেমনি আমারও পিতা, এ সম্পর্কে আমি আর আপনি সমান। কারও কারো ওপর প্রাধান্য নেই, আপনার মা হচ্ছেন ফাতেমা। যদি আমার মায়ের মতো নারী দ্বারা গোটা বিশ্ব ভরে যায় তবুও আপনার মায়ের সমান হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমার পত্র পাওয়ার পর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে চাদর এবং জুতা পরিধান করে আমার কাছে উপস্থিত হন এবং আমাকে সন্তুষ্ট করুন। সাবধান! এ ফযীলত যেন আপনার পূর্বে আমি হাসিল করে না ফেলি। কেননা এ ফযীলতের অধিকারী আমার তুলনায় আপনি বেশি হকদার।"

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়ার চিঠি পাঠ করে হুসাইন চিন্তা করলেন আমার তুলনায় মর্যাদায় কম হওয়া সত্ত্বেও সে নবী করীম ﷺ-এর বাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল আর আমি এ ব্যাপারে উদাসীন হয়ে আছি। তাই তিনি আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে আপন ভাইয়ের কাছে পৌছেন এবং তাকে আনন্দে উদ্ভাসিত করেন। হাদীসটি হলো "কারো জন্য তিন দিনের বেশি ভাইয়ের সাথে বিন্দুমাত্র বিলম্ব বন্ধ রাখা বৈধ নয়, দু'জনের মধ্যে সর্বপ্রথমে যে সালাম দিবে সে উত্তম।"

অনুরূপ আর একটি ঘটনা বড় ভাই হাসানের সাথেও সংঘটিত হয়েছিল। তিন দিন অতিক্রম করার পর হাসান (রা) নিজে ছোট ভাই হুসাইনের কাছে পৌঁছেন। বড় ভাইকে দেখে হুসাইন (রা) তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করত: পাশে বসে বলেন, "আমি প্রথমে আপনার কাছে পৌঁছে ক্ষমাপ্রার্থী না

হওয়ার কারণ এই যে, আপনি বড় ভাই প্রথমে সালাম করে ফযীলত লাভের অধিকারী আপনি আমি না, তাই আমি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাই না।"

ইবাদত ও সাধনা : হুসাইন (রা) একজন ইবাদতগোযার ব্যক্তি। সারারাত তিনি সালাতে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি ছিলেন খুব অল্পতে তুষ্ট। তিনি সর্বদা সিয়াম সাধনায় অভ্যস্ত ছিলেন। সৎকাজে থাকতেন সকলের অগ্রে। নির্জনে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন।

মুস'আব যুবাইরী বলেন, "হুসাইন (রা) পায়ে হেঁটে ২৫ বার হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রমী, বিপদ অত্যাধিক ধৈর্যশীল ছিলেন। কখন বিষণ্ন মলিনতা তাকে স্পর্শ করেনি, কখনো তিনি বিচলিত হতেন না। অধিক সাহসী ছিলেন, কোন কাজে পিছু হটতেন না। তাকদীরের ওপর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতেন, বালা-মুসীবতের সময় আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকতেন। এ কারণেই একবার তার প্রাণপ্রিয় এক সন্তানের অকাল মৃত্যুতে তিনি কোন ব্যকুলতা প্রকাশ করেননি। জনগণ প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : আমরা আহলে বাইতের লোক, আমরা যখনই আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করি তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করে থাকেন এবং যা প্রার্থনা করি তা তিনি দিয়ে থাকেন, তাই আমাদের অপছন্দীয় কোন কিছু আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করলে আমরা তাতে সন্তুষ্ট থাকি।

শাহাদাতের বিপদ মুহূর্তেও হুসাইন (রা) সাহসিকতার ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন, কোন ধরনের অস্থিরতা অথবা দুর্বলতা তাঁর থেকে প্রকাশ পায়নি।

হত্যার ষড়যন্ত্রকারীরা : একজন মুসলমানের জীবনের কি মূল্য, আল্লাহ্র দরবারে মুসলমানের রক্তের কি মর্যাদা, তদুপরি আহলে বাইতের অধিকার, ফযীলত এবং মর্যাদার পরিধি কতখানি, হাসান, হুসাইনের সম্মান এবং মাহাত্ম্য কি পরিমাণ, যারা এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে তাদের কাছে হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা অত্যন্ত বিষাদ বেদনাময় ও হৃদয়বিদারক। কেননা, হাসান হুসাইন (রা) ছিলেন প্রিয়নবীর কলিজার টুকরা, যাদেরকে কোলে বসিয়ে নবী করীম ﷺ প্রার্থনা করতেন, "হে আল্লাহ! আমি এদেরকে ভালোবাসি, অতএব আপনিও তাদেরকে ভালোবাসুন এবং যারা তাদেরকে ভালোবাসে তাদেরকেও আপনি ভালোবাসুন। হাসান (রা) এবং হুসাইন (রা) সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এও ইরশাদ করেছেন, "তাঁরা দু'জন জান্নাতী যুবকদের সর্দার।"

হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনা এবং এর পূর্বের ও পরের কারণসমূহ আলোচনা-পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এর পেছনে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্টকারী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী শত্রু চক্রের গোপন হাত সক্রিয় ছিল। তাদের ঘৃণ্য তৎপরতার ফলেই এ ন্যাক্কারজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায় যে, এরা তারাই যারা ইতিপূর্বে আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা)-কে শহীদ করেছিল, তারা তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থকরণের মানসে উসমান (রা) এবং আলী (রা)-সহ আরো অনেকের প্রতি মিথ্যা অপবাদ প্রতিপন্ন করে আসছিল।

ষড়যন্ত্রমূলক নীল নকশা তৈরি করে এরাই উসমান (রা)-কে হত্যা করেছিল। অথচ উসমান (রা) ছিলেন একেবারেই নিরহ, নির্দোষ। তারা এ নির্দোষ এবং জান্নাতী ব্যক্তি বিশ্বনবীর দু'জন কন্যার স্বামীকে সিয়ামরত অবস্থায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় নির্মমভাবে শহীদ করেছিল। এতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হয়নি। উসমান (রা) ইচ্ছা করলে নিমিষেই সকল বিদ্রোহীদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতেন। এটা তাঁর জন্য তেমন কোন কঠিন বিষয় ছিল না। কিন্তু তার মাধ্যমে মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত হোক উসমান (রা) তা আশা করেননি। একই উক্তি করে বিদ্রোহ দমনে আলী (রা) সহ সাহাবাদেরকে কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত রেখে তিনি এক দৃষ্টান্তহীন আদর্শ স্থাপন করেন।

জামালের যুদ্ধের অন্তরালেও এদেরই গুপ্তহাত কাজ করছে। কেননা কা'কা ইবনে আমরের মধ্যস্থতায় উভয় দলের সম্মতিতে যুদ্ধ বিরতির ব্যাপারটি চূড়ান্ত হয়েছিল। কিন্তু দেখা যায়, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা)-কে হত্যা করে হঠাৎ ভোর বেলা যুদ্ধের পথ সুপ্রশস্ত করা হয়। তিনি ছিলেন উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্যতম একজন প্রচেষ্টাকারী। তারা যুবাইর (রা)-কেও হত্যা করে।

অথচ তখন তিনি সালাতে নিমগ্ন ছিলেন। শুধু এতটুকুই নয়, তারা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কেও শহীদ করতে অগ্রসর হয়েছিল এবং ষড়যন্ত্রকারীদেরকে এ চরম অপরাধের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু শত শত সাহাবা রক্তের বিনিময়ে সেদিন উম্মুল মু'মিনীনকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। আয়েশা (রা)-এর নির্দেশে যুদ্ধ মীমাংসার প্রতীক হিসেবে কা'আব আযাদী পবিত্র কুরআন আঁকড়ে ধরেছিলেন। এ কারণে তাকেও এরা শহীদ করে দিতে কুণ্ঠিতবোধ করেনি।

ওদেরই ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের নীল নকশা অনুযায়ী সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উভয় দলের মধ্যে পরস্পর সমঝোতার প্রচেষ্টা ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ওরা আলোচনার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। যুদ্ধ শেষে শত শত সাহাবায়ে কেরামের শাহাদাত বরণ এবং তৃতীয় পক্ষের ওপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আরোপিত হওয়ার পর চক্রান্তকারীদের গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ হৃদয়বিদারক ঘটনার লোকচক্ষুর অন্তরালে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল ইয়াহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার তল্পিবাহী চক্র। এ চক্রটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ সমাধা করেছিল।

ক. এদের একদলের আহ্বান ছিল যে, আলী নিজেই মহান আল্লাহ, রিযিকদাতা এবং সর্বশক্তিমান। আলী (রা) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যান। কিন্তু তারা তাদের ভুল বক্তব্যে অটল থাকে। পরিশেষে আলী (রা) তাদেরকে চিহ্নিত করে আগুনে দগ্ধ করতে আরম্ভ করেন। এমতাবস্থায় এরা উক্তি করে যে, যদি আলী নিজেই আল্লাহ না হতেন, তাহলে আগুনে পুড়াতেন না। কারণ আগুনে পোড়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, অন্য কারো নেই। তাদের অন্যতম বক্তব্য ছিল যে, আলী এ পর্যন্ত যাদেরকে আগুনে পুড়েছেন তাদের সকলকেই তিনি আবার জীবন ফিরায়ে দিয়েছেন।

পরবর্তীতে এরাই 'হুলূল'-এর আকীদা (অবতার হওয়ার আকীদা) প্রবর্তন করে এবং এ ভুল আকীদা থেকে নানা প্রকারের বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন অযুক্তিক আকীদা সমাজে প্রসার লাভ করে।

খ. এদের অপর একটি দল সিফফীনের যুদ্ধ বিরতির পর আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কারণ তাদের মতে মু'আবিয়া (রা)-এর সাথে ফয়সালা পূর্বক যুদ্ধ বিরতির কারণে আলী (রা) কাফেরে পরিণত হয়ে যান। এরা ইতোপূর্বে তিন খলিফাকেও কাফের বলে আখ্যায়িত করে। আর প্রখ্যাত তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে হুবাবকে এ জন্য নির্মমভাবে শহীদ করে যে, তিনি আলী (রা) সহ সকল খলীফাদের প্রশংসায় লিপ্ত থাকত। আর স্ত্রীর গলদেশকে টুকরো টুকরো করে ফেলে এবং 'তাই' গোত্রের তিনজন নারীকে একই কারণে নির্মমভাবে হত্যা করে। আলী (রা) হত্যাকারীদেরকে সোপর্দ করতে নির্দেশ দিলে তারা এ বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে যে, তারা এবং

আপনারা সকলেই হত্যার উপযুক্ত; তাই আমরা সকলে মিলেই হত্যা করেছি অতএব কাদেরকে সোপর্দ করব?

আলী (রা)-এর শাহাদাতের পর ইরাকবাসীরা হাসান (রা)-এর হাতে স্বতস্ফূর্তভাবে বাই'আত গ্রহণ করে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনসহ অধিকাংশ লোক এ বাই'আতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হাসান (রা) খেলাফত থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

নবী করীম ﷺ হাসান (রা) সম্পর্কে ইরশাদ করেছিলেন যে, আমার এ সন্তান সাইয়্যেদ, তার মাধ্যমে বিবাদমান মুসলিম দুটি দলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হবে। নবী করীম ﷺ-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপ নেয়। হাসান (রা) খেলাফতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব মু'আবিয়া (রা)-এর ওপর অর্জন করে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করেন। ফলে লোকেরা মু'আবিয়া (রা)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করে নেয়। সেখানে এ কথাও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মু'আবিয়া (রা)-এর পরবর্তী খলিফা হবেন হাসান (রা) আর শহীদদের ক্ষতিপূরণ তথা রক্তপণ বাইতুল মাল থেকে আদায় করা হবে। এ সমঝোতার নিদর্শন হিসেবে এ বছরটিকে পরস্পর ঐক্যের বছর বলে অভিহিত করা হয়। এ সমঝোতা এবং মীমাংসার ফেলে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ও দ্বন্ধের অবসান ঘটল, ইসলাম এবং হেদায়েতের আলো বিতরণের পথ পুনরায় প্রশস্ত ও সুগম হতে লাগল। এ সন্ধি ছিল আল্লাহর পথ থেকে মুসলমানদের জন্য একটি বিশেষ নে'আমত এবং পরবর্তীকালে মুসলিম বিজয়ের বিরাট অন্যতম কারণ।

শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত ঘটনা : মু'আবিয়া (রা) জীবদ্দশায় তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে ইয়াযীদের পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করেন। কিন্তু খলিফা মনোনয়নের এ পন্থা ইতোপূর্বে কেউ গ্রহণ করেননি বিধায় অনেক সাহাবাই এ বাই'আতে অসম্মতি জানান। তবে যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম সকলেই মুজতাহিদ ছিলেন তাই যারা বাই'আত গ্রহণ করেছেন এবং যারা করেননি উভয় শ্রেণীই এ বিষয়ে সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন। কারণ তাঁরা কেউ অপরের মতামত গ্রহণে একান্ত বাধ্যগত নয়। বস্তুত: মু'আবিয়া (রা)-এর ইন্তিকালের পর যখন ইয়াযীদ খেলাফতের দায়িত্বভার লাভ করেন, তখন মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্ধের বীজ অংকুরিত হয়।

এ প্রেক্ষাপটে একদল মুসলমানের মধ্যে রক্তপাত এড়ানোর জন্য এবং নিরাপত্তার তাগিদে নিরব ভূমিকা পালন করেন। তারা বাই'আত গ্রহণ না করে ইয়াযীদের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিজেদেরকে আত্মগোপন করে রাখেন। কিন্তু অপর একদল একেবারেই ব্যতিক্রম চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়। খলিফা মনোনয়নে ইতোপূর্বের খলিফাদের নীতি অবলম্বন না করা এবং নিকটতম ব্যক্তির স্থলে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে খলিফা নিয়োগ না করার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করাকে তাঁরা নৈতিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করেন।

ঘটনাপ্রবাহ সূত্রে বলা যায় যে, ৬০ হিজরীতে ইয়াযীদের পক্ষে বাই'আত গ্রহণ শুরু হলে মদীনার গভর্নর ওলীদ ইবনে উতবার কাছে ইয়াযীদের সমর্থনে বাই'আত গ্রহণের ফরমান জারী হয়। কিন্তু মদীনাবাসীদের মধ্যে যারা ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণে অস্বীকৃতি করে ছিলেন তারা ৬০ হিজরী রজব মাসের শেষ ভাগে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমার অভিমুখে যাত্রা করেন। তাদের অন্যতম একজন হলেন হুসাইন (রা)। হুসাইন (রা) এবং তার সঙ্গীগণ শাবান, রমযান, শাওয়াল এবং জিলকদ মাস সর্বমোট এ চার মাস মক্কায় অবস্থান করেন।

ইতোপূর্বে কুফাবাসীরা হাসান (রা)-এর সাথে গোপনভাবে যোগাযোগ রাখে, চিঠিপত্র আদান প্রদান করে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে দল গঠন করে হুসাইন (রা)-এর সাথে সাক্ষাতে প্রেরণ করে। তারা হুসাইন (রা)-কে তাদের সমর্থনের কথা অভিহিত করে এবং বাই'আতের উদ্দেশ্যে কুফায় আসার জন্য আমন্ত্রণ করে। এভাবে তারা হুসাইন (রা)-কে রাজি করতে সক্ষম হয়। অবশ্য ইবনে আব্বাস এবং ইবনে উমার (রা) হুসাইন (রা)-কে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, ইরাক এবং কুফাবাসীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঠিক নয়। এরা বিশ্বাসঘাতকতা করার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু যারা হুসাইন (রা)-এর সাথে পত্র এবং বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করেছিল, তাদের প্রতি সুধারণার ফলে তিনি কুফার যাওয়ার পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হুসাইন (রা)-এর কুফার পথে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া নিজ ভাইয়ের আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে কাতর কণ্ঠে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

হুসাইন (রা) যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে কুফার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেন। এর পূর্বেই তিনি মুসলিম ইবনে আকীল ইবনে আবু তালিবকে তার পক্ষে বাই'আত গ্রহণের জন্য কুফায় পাঠান। ইতোপূর্বে প্রায় ১২ হাজার লোকের

বাই'আত গ্রহণের কাজ সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু কুফায় নিযুক্ত ইয়াযীদের গভর্ণর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে মুসলিমকে আটক করে এবং হত্যা করে দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, মুসলিমের গ্রেফতারী এবং হত্যার খবর সম্পর্কে হুসাইন (রা) কাদিসিয়া নামক স্থানে আগমনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জানতে সক্ষম হননি।

এদিকে মুসলিমের গ্রেফতারী এবং হত্যার কারণে কুফাবাসীদের ঐক্যে মারাত্মক ফাটল ধরে। অপরপক্ষে মুসলিমের ভ্রাতাগণ এর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং পরিশেষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় হুসাইন (রা) নিরুপায় হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে তিনি বলেন, তোমাদেরকে ব্যতীত আমার জীবন বিপন্ন, তাই তিনিও ঘোষণা করেন, যাদের ইচ্ছা ফিরে যাও, আর যাদের ইচ্ছা আমার সাথে থাকতে পার। এ ঘোষণার ফলে ভীষণ খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, মাত্র ৭০/৭৫ জন মক্কা থেকে আগত সাথীবৃন্দ ব্যতীত সকলেই হুসাইন (রা)-এর সাহচর্য প্রত্যাহার করে ফিরে যায়। হুসাইন (রা) মাত্র ৩২ জন অশ্বারোহীসহ কাদিসিয়ায় অবস্থান করেন।

ইতোমধ্যে ইয়াযীদের গভর্ণর উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ পুলিশ প্রধান হুসাইন তামিমীকে অগণিত সৈনিকসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করে। সে দ্রুত রওয়ানা দিয়ে কাদিসিয়ায় পৌঁছে এবং হুসাইন (রা)-এর বিরুদ্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণে করে। যাতে হুসাইন (রা) মক্কা কিংবা মদীনা পথেও প্রত্যাবর্তন করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে উবাইদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ হুর ইবনে ইয়াযীদ তামিমীর নেতৃত্বে আর একটি সৈনিক দল কাদিসিয়ার দিকে প্রেরণ করে। এক হাজার সৈনিকসহ এ দলটি ঠিক দুপুরের সময় মক্কা মদীনার রাস্তায় হুসাইন (রা)-এর মুখোমুখী হয় এবং চরম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। বিপদের এ কঠিন মুহূর্তে হুসাইন (রা) যে হৃদয়স্পর্শী এবং বেদনাদায়ক এক কালজয়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ :

"হে লোকসমাজ! আমি মহান আল্লাহকে হাজির-নাজির রেখে বলছি, তোমরা চিঠিপত্রের মাধ্যমে এবং লোক মারফত বাধ্য করেছিলে বলেই আমি তোমাদের নিকট আগমন করেছি, তোমরা আমাকে লিখেছ, আমাদের কোন ইমাম নেই, আমরা আপনার শুভাগমন প্রত্যাশা করি। আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে ঐক্য এবং হেদায়েতের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারেন। কাজেই

তোমরা যদি আমাকে নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দাও তাহলে আমি অবস্থান করি আর যদি আমার আগমনে তোমরা অসন্তুষ্ট হয়ে থাক, তাহলে আমাকে পরিত্যাগ কর আমি যেখানে থেকে এসেছি সেখানেই চলে যাই।"

হুসাইন (রা)-এর এ ভাষণের পর অত্যন্ত নিরবতার আঁধার নেমে আসে। ইতিমধ্যে সালাতের জন্য আযান ধ্বনিত হয়। হুসাইন (রা)-এর ইমামতিতে সালাত অনুষ্ঠিত হয়। হুর ইবনে ইয়াযীদও সালাতে অংশগ্রহণ করে। সালাত আদায় করে হুর ইবনে ইয়াযীদ স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করে। হুসাইন (রা) সেখানেই আসরের সালাতও আদায় করেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহকে অধিক ভয় কর এবং তাঁর বান্দাগণের অধিকার সম্পর্কে জানতে সচেষ্ট হও, তবে আর এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির অন্যতম কারণ।

আমরা আহলে বাইতের লোক। জালেম অত্যাচারীদের তুলনায় আমরা খেলাফতের অধিক যোগ্যতম। কিন্তু যদি আমরা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় হয়ে থাকি, তোমরা যদি আমাদের অধিকার ভুলে গিয়ে থাক, চিঠি এবং লোক মারফত আমাকে তোমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি যদি পরিবর্তন হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি আমার স্থানে ফিরে যেতে চাই, তোমরা আমাকে ফিরে যেতে দাও।" এ বলে হুসাইন (রা) তাদের সম্মুখে দুটি বাক্স খুলে সমস্ত চিঠিপত্র তাদের সামনে উপস্থাপন করল। এ সময় হুর ইবনে ইয়াযীদ বলল, "আমরা আপনাকে পেয়েছি, আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে আপনাকে কুফার গভর্ণরের কাছে না পৌছানো পর্যন্ত পৃথক না হতে। তাই আমরা আপনাকে ছাড়তে পারি না এবং পৃথকও হতে পারি না।"

হুসাইন (রা) তাদের ধোঁকাবাজী এবং ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উত্তমরূপেই বুঝতে বাকি রইল না। তিনি ইবনে যিয়াদের বাহিনী প্রধান ওমর ইবনে সা'আদের কাছে নিম্নোক্ত প্রস্তাবে তুলে ধরলেন–

১. আমাকে আমার স্থানে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হোক।
২. সারাবিশ্ব জুড়ে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ দেয়া হোক।
৩. কিংবা আমাকে ইয়াযীদের কাছে হাজির হওয়ার সুযোগ দেয়া হোক।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, হুসাইন (রা)-এর কোন প্রস্তাবই গৃহীত হল না, বরং কুফার গভর্ণরের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য হুসাইন (রা)-কে বাধ্য করা হল। কিন্তু তাতে তিনি সম্মত হতে পারেননি এবং হননি।

নবীর নাতী, খলিফাতুল মুসলিমীনের উত্তরাধিকারী হুসাইন (রা)-এর পক্ষে চরম অপমান এবং অপদস্ততার স্তরে আত্মসমর্পণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি, তাই তাকে অবশেষে যুদ্ধেরই চূড়ান্ত ঘোষণা করতে হয়, "আমি হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত, বিদ্রোহীরা বাতিলপন্থী। অতএব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলার আদালতে আমি নির্দোষ হিসেবে সাব্যস্ত হব।"

এ বিশ্বাস নিয়েই হুসাইন (রা) যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। হুসাইন (রা) স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করলেন, "তোমরা আমাকে এবং আমার লোকজনকে প্রতারণা করেছ এবং অপদস্ত করেছ। অতএব যা হবার হবেই। যাদের ইচ্ছা হয় চলে যেতে পার, আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন দায়িত্ব নেই।" এ বক্তব্যের পর মক্কা থেকে আগত এবং পরিবারের লোকজনকে ছাড়া প্রায় সকলেই পৃথক হয়ে পড়ে। হুসাইন (রা) এরূপ ওয়াদা ভঙ্গকারী লোকদেরকে আসন্ন অভিযানে সাথে রাখতে পছন্দ করেননি। কারণ তিনি ভালোভাবে জানতেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবে না। থাকবে শুধু তারাই, যারা তার প্রতি সমবেদনাশীল। আর তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

কতিপয় লোক বলল, এমনি এক মুহূর্তে আপনার বড় ভাইয়ের যে অভিমত ছিল আমরা সে বিষয়ে অবহিত। এখন আপনার মতামত প্রসঙ্গেও জানি। হুসাইন বললেন, আমার ভাই যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাকে পছন্দ করেছিলেন। আমি একান্ত আশাবাদী আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার নিয়তের ওপর পুরস্কৃত করেছেন। আর আমি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নিয়ত করেছি। আল্লাহ তা'আলার নিকট আমি আমার নিয়তের ভিত্তিতে প্রতিদানের আশাবাদী।

এরপর আহলে বাই'আতের লোকসহ মাত্র ৭০ জন হুসাইন (রা)-এর সাথে অবস্থান করলেন। আর বিশ্বাসঘাতকরা আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে ইবনে যিয়াদের বাহিনীতে অংশগ্রহণ করল। হুসাইন (রা) তার সাথীদেরকে নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। ঠিক এ সময় 'হুর' এ বলে সম্মুখে দাঁড়াল যে, আপনাকে ইবনে যিয়াদের দরবারে হাজির করার জন্য আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই আপনি কুফার পথ পরিত্যাগ করে পবিত্র মদীনার পথে অগ্রসর

হোন। আমি ইবনে যিয়াদকে অবস্থান লিখে জানাই, আর আপনি ইয়াযীদ এবং ইবনে যিয়াদের কাছে আপনার বক্তব্য লিখে জানিয়ে দিন। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা এমন কোন পথ বের করে দিবেন যে পথ আমাদের সকলের জন্যই শান্তির এবং নিরাপদের হবে। আর আপনার বিষয়ে সংকটের সমাধান হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় হুসাইন (রা) কুফার পথ পাড়ি দিয়ে কাদিসিয়া পথে অগ্রসর হতে লাগলেন, আর 'হুর' দেখানোর উদ্দেশ্যে হুসাইন (রা)-কে বাঁধা দিতে থাকল।

কিন্তু ৬১ হিজরী মুহাররম মাসের ৩য় জুমার দিন ওমর ইবনে সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস চার হাজার অস্ত্রধারী সৈনিক নিয়ে কুফা থেকে উপস্থিত হয়। এদের অধিকাংশই ছিল ঐ বিশ্বাসঘাতকগণ যারা হুসাইন (রা)-এর হাতে ইতিপূর্বে বাই'আত গ্রহণ করেছিল এবং চিঠিপত্র প্রেরণ করে লোক মারফতে অনুরোধ করে বাই'আতের জন্য হুসাইন (রা)-কে কুফায় গমনের জন্য বাধ্য করেছিল। উমার ইবনে সা'আদ উপস্থিত হয়ে হুসাইন (রা)-এর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জিজ্ঞাসা করল যে, "আপনি মক্কা থেকে কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছিলেন।"

হুসাইন (রা) বললেন, তোমার শহরের লোকেরা লোক প্রেরণ করে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমাকে আহ্বান করেছিল তাই আমি এসেছিলাম। আসার পরে তোমাদের অপছন্দের কথা অবহিত হয়ে পুনরায় ফিরে যাচ্ছি। ওমর ইবনে সা'আদ হুসাইন (রা)-এর জবাব লিখিতভাবে ইবনে যিয়াদের নিকট পাঠাল। এর উত্তরে ইবনে যিয়াদ উমার ইবনে সা'আদের নিকট লিখে প্রেরণ করল যে, হুসাইনের কাছে ইয়াযীদের হাতে বাই'আতের প্রস্তাব উপস্থাপন কর। যদি সে এতে রাজী হয় তাহলে আমরা তার সম্পর্কে বিবেচনা করব, অন্যথায় তাকে এবং তার সমস্ত সাথীদেরকে বন্দি কর এবং তাদের জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ করে দাও। হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের তিন দিন পূর্বে থেকেই এ নির্দেশ কার্যকর করা হয়।

এ সময় হুসাইন (রা) এবং উমার ইবনে সা'আদ একাধিকবার আলাপ-আলোচনায় একত্রিত হয় এবং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উমার ইবনে সা'আদ ইবনে যিয়াদের নিকট এ মর্মে আর একটি চিঠি লিখে পাঠানো হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে আন্দোলনের উত্তপ্ত অগ্নিশিখা নিবৃত করেছেন

এবং আমাদের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে। হুসাইন আমার সাথে চূড়ান্তভাবে প্রতিশ্রুতি করেছেন যে, তিনি এখান থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবেন অথবা কোন সীমান্ত এলাকায় চলে যাবেন, অথবা ইয়াযীদের কাছে হাজির হয়ে বাই'আত গ্রহণ করে নিবেন। আমি মনে করি এতে আপনাদের এবং বিশ্ব মুসলিম জাতির জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রশস্ত পথ উম্মুক্ত হবে।

কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এ চিঠি প্রাপ্তির সাথে সাথে ইবনে যিয়াদ এ লিখে সীমারকে ওমর ইবনে সাআদের কাছে প্রেরণ করে যে, হুসাইনকে আমার নিকট হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বল। এ উদ্দেশ্যে অতিসত্বর হুসাইনকে তার সাথীবৃন্দসহ আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। যদি হুসাইন এতে সম্মত না হয়, তাহলে আর কালবিলম্ব না করে যুদ্ধ আরম্ভ কর। ইবনে যিয়াদ সীমারকে গোপনে এ কথাও বলে দেয় যে, যদি উমার ইবনে সা'আদ আমার নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে তুমি তার সমর্থন এবং সহযোগিতা করবে, অন্যথায় তোমাকে আমীর নিয়োগ করলাম।

তুমি প্রথমে উমার ইবনে সাদের গর্দান কেটে ফেলবে অতঃপর আমার নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর করবে। ইবনে যিয়াদ তার চিঠিতে উমার ইবনে সা'আদকে একথাও সু-স্পষ্টভাবে লিখে দেয় যে, আমি তোমাকে হুসাইনের মুক্তির জন্য পথ উম্মুক্ত করা, তার মনবাঞ্ছনা পূরণ করা, আর বসে তার জন্য তোষামোদ ও সুপারিশ করতে পাঠাইনি। অতএব হুসাইনকে বলে দেখ যদি সে এবং তার দল আমার কাছে আত্মসর্পণে রাজী হয় তাহলে তাদেরকে আমার কাছে প্রেরণ কর আর রাজী না হলে কালবিলম্ব না করে তাদের ওপর সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়, তাদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নাক কান কেটে দাও। কারণ এরা এরূপ শাস্তিরই যথার্থ উপযুক্ত।

আর হুসাইনকে হত্যা করে ঘোড়ার পদাঘাতে তার পেট পিট পিষে ফেল। কারণ, সে বড়ই কষ্টদায়ক ফাটল সৃষ্টিকারী এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী অত্যাচারী। আমার এ নির্দেশ কার্যকর করণে সক্ষমতা লাভ করলে তুমি একজন আনুগত্যকারী বীরপুরুষ হিসেবে পুরস্কৃত হবে। পক্ষান্তরে তুমি আমার নির্দেশ কার্যকর করণে অক্ষম হলে আমাদের বাহিনী থেকে তুমি পৃথক হয়ে যাও এবং সীমারের ওপর দায়িত্বভার ন্যস্ত কর।"

উমার ইবনে সা'আদ ইবনে যিয়াদের চিঠি পড়ে সৈন্যবাহিনীকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দেয় এবং আসরের সালাতের পর হুসাইনকে চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত করে। হুসাইন (রা) সকাল পর্যন্ত সুযোগ চান এবং সমগ্র রাত্রি সাথীদেরকে নিয়ে ইবাদত, এস্তেগফার এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি ও মুনাজাতে নিমগ্ন থাকেন।

শনিবার ফজরের সালাতের পর কিংবা আশুরার জুম্মাবারে উমার ইবনে সা'আদ যুদ্ধস্থলে নাযিল হয়। শুরু হল চরম যুদ্ধ। বেড়ে উঠল যুদ্ধের দামামা। তারা হুসাইন (রা)-কে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল। হুসাইন (রা) বললেন, হে কুফাবাসী! তোমাদের মতো বিশ্বাসঘাতক এবং গাদ্দার কোন দিন আমাদেরকে বারবার ডেকেছ, তাই আমরা উপস্থিত হয়েছি। তোমরা মশা মাছির মতো দ্রুত আমার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছ। যখন আমরা তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসে পড়েছি, তখন তোমরা মৌমাছির মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছ। শুধু তাই নয় বরং পাষণ্ড মনে আমাদের ওপর শত্রুদের খোলা অস্ত্র তুলে ধরেছ। অথচ আমাদের পক্ষ থেকে কোন দিন তোমাদের প্রতি অবিচার করা হয়নি, কোন অপরাধও করিনি। মনে রেখ, অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ হত্যাবশ্যক।"

এ বলে হুসাইন (রা) যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং অবিরাম যোহরের সালাত পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেন। যোহরের সালাত আদায় করে পুনরায় যুদ্ধে নিয়োজিত থাকে। ইতিমধ্যে হুসাইন (রা)-এর সাথীবৃন্দ বেশির ভাগই শাহাদাতবরণ করেন। ইয়াযীদ ইবনে হারিছও হুসাইন (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হন। হুর ইবনে যিয়াদ উমার ইবনে সা'আদের দল ত্যাগ করে হুসাইন (রা)-এর বাহিনীতে গিয়ে হুসাইন (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে রাসূলের সন্তান! আমি প্রথমে আপনার বিরুদ্ধবাদী ছিলাম, এখন আমি আপনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। কারণ আমি আপনার নানাজানের সুপারিশ কামনা করি। অতঃপর তিনি হুসাইন (রা)-এর পক্ষে সংগ্রাম করে শাহাদত বরণ করেন।

এমনিভাবে যুদ্ধ করে সকলেই শাহাদাতবরণ করেন। শুধু থাকলেন হুসাইন (রা)। হুসাইন (রা) একাই লড়াই করতে থাকলেন। শত্রু বাহিনী চতুর্দিকে থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আঘাতের পর আঘাত করে তাঁকে জর্জরিত করে ফেলে। প্রচণ্ড পানি পিপাসায় অস্থির হয়ে মরদে মুজাহিদ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। শত্রু বাহিনী এ সুযোগকে উত্তমরূপে কাজে লাগায়। কান্দাহ্ এলাকার

এক পাপীষ্ঠ হুসাইন (রা)-এর মাথা মোবারকের ওপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। ফলে তিনি রক্তাক্ত হয়ে অত্যাধিক আহত হন। হুসাইন (রা) যমীনে প্রবাহমান রক্ত হস্ত মুবারকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে মুনাজাত করে বলেন–

"হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাদের সম্পর্কে আসমানী সাহায্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করে থাকেন, তাহলে আমাদের জন্য এর চেয়ে অধিক উত্তম যা আমাদের জন্য তাই করুন। সাথে সাথে এ অত্যাচারীদের সমীচীন প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।" এ প্রার্থনা করে পানির পিপাসায় কাতর নবীর সন্তান হুসাইন (রা) পানির দিকে এগিয়ে গেলেন। এমন সময় হুসাইন তামীমী নামক আর এক পাপীষ্ঠ হুসাইন (রা)-এর চেহারা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে এবং আহত যাতনায় ভারাক্রান্ত মনে পুনরায় আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মুনাজাত করে বলেন–

"হে আল্লাহ! আমার প্রতি তীর নিক্ষেপকারী হুসাইন তামীমীকে অত্যন্ত পিপাসাতুর করে হত্যা কর।"

আল্লামা আজহুরী উল্লেখ করেছেন যে, "তামীমী গরম এবং ঠাণ্ডা উভয় শাস্তিতে একই সাথে এভাবে আক্রান্ত হয় যে, তার ভিতর পেটে অগ্নি গরম, আর পিঠে ঠাণ্ডার কারণে পেরেশানী হয়ে পড়ে। তাই সম্মুখে বরফ রেখে বাতাস করা হতো আর পিঠের পাশে সর্বদা অগ্নিতাপ চাপ দিতে হতো। আর সে উভয় যাতনায় সদা সর্বদা চিৎকার করতে থাকত। পানি এবং দুগ্ধ একত্রে মিশিয়ে পান করতে দিলেও পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারত না। হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের পরে এমনিভাবেই এ পাপীষ্ঠের মৃত্যু হয়।

হুসাইন (রা) পরপর আঘাতের কারণে মুমূর্ষাবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং সর্বশেষ মুনাজাতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আর্তনাদের সুরে বলেন, "হে আল্লাহ তা'আলা! আপনার নবী কন্যার সন্তানের সাথে যা করা হল সে ব্যাপারে আপনার দরবারে অভিযোগ পেশ করলাম, এদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলুন, টুকরো টুকরো করুন, এদের কেউ যেন বাকি না থাকে।

এ মুহূর্তে হুসাইন (রা)-কে হত্যা করতে কেউ অগ্রসর হলো না। বরং প্রত্যেকেই হুসাইন (রা)-কে হত্যার অপরাধ থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে চাইল। এমন সময় পাপীষ্ঠ সীমার অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করে বলল, 'তোমরা কি দেখছ? কেন তাকে হত্যা করছ না?

সীমারের ভয়ে ভীত হয়ে জনগণ চতুর্দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং ছুরআতা ইবনের শারীক তামীমী নামক এক পাষণ্ড হুসাইন (রা)-এর বাম হস্ত মুবারককে কঠোর আঘাত হানে। আর সিনানা ইবনে আনাস নাখয়ী নামক পাষণ্ড এ সুযোগে বর্শা দ্বারা পবিত্র দেহের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালায়, আর পাপীষ্ঠ সীমার এ সুযোগে হুসাইন (রা)-কে হত্যা করে ফেলে। তাকে সহযোগিতা করে হিময়ারী গোত্রের নরাধম খাওলা ইবনে ইয়াযীদ আছবাহী।

সীমার হুসাইন (রা)-কে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাঁর মাথা মুবারক পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সামনে রেখে কবিতা আবৃত্তি করে বলে, "আমার রেকাব (ঘোড়ার ওপর বসার গদি) স্বর্ণ-রূপা দ্বারা সুসজ্জিত কর, কারণ আমি মুকুটহীন রাজাকে হত্যা করেছি। শ্রেষ্ঠ পিতা-মাতার শ্রেষ্ঠতম সন্তানকে হত্যা করেছি। আমি যাকে হত্যা করেছি সে বংশ হিসেবেও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তিগতভাবে এবং বাস্তবেও সর্বমহান।"

এ বলে সীমার হুসাইন (রা)-এর যা কিছু ছিল সবকিছু হস্তগত করে নেয়। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। মানুষ নিজেদের বাড়ির দিকে ফিরে গেল। ফেরার সময় হুসাইন (রা)-কে সাথীবৃন্দের সমস্ত সহায় সম্বল লুটপাট করে নিয়ে যায়। বলা হয় যে, ইবনে যিয়াদের নির্দেশ অনুযায়ী হুসাইন (রা)-এর লাশকে ঘোড়া দ্বারা দলিথ মথিত করা হল। যারা এ মর্মান্তিক যুদ্ধে হুসাইন (রা)-এর সাথে শাহাদতবরণ করেছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৭২, আর উমার ইবনে সা'আদের ৮৮৮ জন সৈনিক এবং অসংখ্য লোক আহত হয়।

তিরমিযী শরীফসহ অন্যান্য কিতাবের উদ্ধৃতিতে প্রতীয়মান হয় যে, হুসাইন (রা)-এর পবিত্র লাশকে ইবনে যিয়াদের কাছে রাখার পর এ পাপীষ্ঠ লাঠি দ্বারা হুসাইন (রা)-এর নাকের ছিদ্র এবং মুবারক দাঁতগুলোতে আঘাত করে আক্রমণের ঝাল মেটায়। এ দুঃখজনক অবস্থা স্বচক্ষে দেখে নবী করীম ﷺ-এর সাহাবী আনাস (রা) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং সাহাবী যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ইবনে যিয়াদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে ইবনে যিয়াদ! তোমার লাঠি সরিয়ে ফেল, আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আমি নবী করীম ﷺ-কে হুসাইনের দুই ঠোঁটের মধ্যভাগে বহুবার চুম্বন করতে দেখেছি।" এ বলে তিনিও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

এ পরিস্থিতি অবলোকন করে ইবনে যিয়াদ তাদেরকে অশ্লীল ভাষায় গাল-মন্দ করে। ফলে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ইবনে যিয়াদের কাছে থেকে এ বলতে বলতে চলে আসেন যে, "হে মানবসমাজ! আজ থেকে তোমরা গোলামী জিঞ্জির পড়ে থাকবে। কারণ তোমরা ফাতেমার সন্তানকে হত্যা করেছ আর মুরজানার পুত্রকে আমীর নিযুক্ত করেছ। জেনে নাও, এরা তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম ব্যক্তি তাদের সকলকেই হত্যা করে ছাড়বে। আর যারা বাকি থাকবে তাদের দ্বারা গোলামী করাবে। যারা এরূপ লজ্জাজনক অপমানজনক এবং ঘৃণ্য আচরণে পরিতুষ্ট, তাদের সকলেরই ধ্বংস সাধিত হোক।

অতঃপর ইবনে যিয়াদের প্রতি লক্ষ্য করে যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বললেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে দেখেছি, হাসানকে ডান এবং হুসাইনকে বাম উরুতে বসিয়ে দুই কাঁধের সাথে তাদের মাথা একত্রিত করে ধরে মুনাজাত করেন; "হে আল্লাহ্ তা'আলা! আমি এদের দু'জনকে এবং নেক ঈমানদারদেরকে আপনার কাছে আমানত রেখে গেলাম।"

হে ইবনে যিয়াদ! তোমার নিকট নবী করীম ﷺ-এর রেখে যাওয়া আমানতের এ পরিণাম! এ বক্তব্য শুনে ইবনে যিয়াদ অত্যন্ত ক্রোধ হয় এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু এ বলে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে যে, "বার্ধক্যের কারণে যদি আপনার স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট না হতো, তাহলে আপনাকে আমি চাবুক মেরে মেরে সমুচিত শিক্ষা দিতাম।

এরপর ইবনে যিয়াদ হুসাইনকে (মাথা মুবারকসহ) তার পরিবার পরিজন সমেত ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার নিকট প্রেরণ করেন। ইয়াযীদ অবস্থা সম্পর্কে জেনে দুঃখিত এবং লজ্জিত হয় এবং বলে, ইবনে যিয়াদের কাছে আমার প্রতি আনুগত্যের কামনা ছিল তবে হুসাইনের হত্যা কামনা করিনি। ইবনে সুমাইয়্যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ বর্ষিত হোক, আল্লাহ্ তা'আলার কসম! আমি হলে হুসাইনকে মার্জনা করে দিতাম। আল্লাহ্ পাক হুসাইনের প্রতি দয়া বর্ষণ করুন।"

ইবনে তাইমিয়া এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে হুসাইন (রা)-এর লাশ মুবারক ইবনে যিয়াদের নিকট নিয়ে আসলে সে লাঠির দ্বারা দাঁতে আঘাত করে এবং টানিয়ে রাখে। আর উমার ইবনে সাআদ আলী ইবনে হুসাইনকে রোগাক্রান্ত

অবস্থায় হুসাইনের সন্তান-সন্ততি, ভাই, বন্ধু এবং অন্যান্য শিশুদেরকেসহ ইবনে যিয়াদের দরবারে উপস্থিত করে।

"ইত্তেফাক' নামক কিতাবে, শিবরাভী শাফেয়ী লিখেছেন, "হুসাইন (রা)-এর মাথা মুবারক অন্যান্য নারী এবং ছেলে-মেয়েদেরকেসহ ইবনে যিয়াদ উটে করে ইয়াযীদের নিকট পাঠান। এ কারণেই জাওয়াজিরুল আকদাইন নামক কিতাবে আল্লামা সামহুদী লিখেন যে, যে হুসাইন (রা)-কে হত্যা করেছে, তাদের অভিশাপ দেয়া জায়েয বলে কতক উলামা ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

আল্লামা সামহুদী বলেন, আল্লাহ তা'আলা হুসাইন (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। তাই ইয়াযীদের রাজত্ব বেশি দিন টিকেনি। আল্লাহ তা'আলা তার বংশধর থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং হুসাইনের হত্যাকারীদের ওপর আল্লাহ তা'আলা মুখতার ছাকাফীকে নিয়োগ করেন যে, উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ, উমার ইবনে সা'আদ সহ হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদেরকে সন্ধান করে সকলকেই হত্যা করে ফেলে। হাসান বছরী (র) বলেন, "যদি আমি হুসাইন (রা)-এর হত্যাকারীদের সাথী হতাম তাহলে আমার জন্য নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে লজ্জায় ও ভয়ের কারণ জান্নাতে প্রবেশ করা কঠিন।"

বড়ই পরিতাপের বিষয়, ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়া যদি হুসাইন (রা)-এর ভূমিকা ও কুফায় তাঁর আগমন সম্পর্কে জানত, যদি সে নবী করীম ﷺ-এর সাথে হুসাইন (রা)-এর সম্পর্কের কথা উপলব্ধি করত, নবী করীম ﷺ তাদের দুই ভাইয়ের ব্যাপারে যে মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের প্রতি নবী করীম ﷺ-এর আন্তরিকতা কতখানি ছিল যদি ইয়াযীদ সময় মতো তা অনুভব করত, আর অনুভব করে হুসাইন (রা)-এবং তার সাথীদেরকে হত্যা না করার এবং তাদের রক্ষা এবং নিরাপত্তার সুস্পষ্ট আদেশ জারি করত, তাহলে মুসলিম উম্মাহ অত্যন্ত বেদনাদায়ক এ বিপদ থেকে অবশ্যই রক্ষা পেত এবং নবী করীম ﷺ-এর বংশধরের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম হতো।

অপরাধী ইবনে যিয়াদ যদি মক্কা প্রত্যাবর্তনের কিংবা ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণের জন্য দামেস্কে গমনের হুসাইন (রা) দ্বারা প্রদত্ত প্রস্তাবে সাড়া দিত তাহলে এহেন ন্যক্কারজনক ঘটনায় মুসলিম ইতিহাসে কলঙ্কময় অধ্যায় রচিত হতো না। হ্যাঁ, মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী, মুসলমানদের শিরোমনী, জান্নাতী যুবকদের

শ্রেষ্ঠতম সর্দার ফাতিমা (রা), নবী কন্যা কলিজার টুকরা, আর তার পরিবার পরিজন, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী সহচরবৃন্দ এবং অনুসারীদের বিষয়ে তাকদীরের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করার খোদায়ী সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। আর যা চূড়ান্ত ছিল তাই বাস্তবায়িত হয়েছে, এক্ষেত্রে আর কোন কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

হুসাইন (রা) বাতিলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। তার অভিযানের ভিত্তি ছিল অন্যায়ের প্রতিবাদে সত্যের আহ্বান। ভয়াবহ এবং রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে ইয়াযীদের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছে বেশির ভাগ মানুষ, কিন্তু তা দিয়েছে অবস্থার গরজে। তারা সকলেই আমাদের শিরোমনী, সম্মানী এবং মুজতাহিদ। তাদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে তারা অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার কাছে পুরস্কৃত হবেন। আর সমীচীন সিদ্ধান্ত যা, তা আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তই কার্যকর হওয়ার উপযুক্ত। আর উপযুক্ত বলেই তাই কার্যকর হয়েছে।

আহলে বাইতের প্রতি অনুকম্পা ও তাদের শিষ্টাচারিতা, সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষার তাগিদে তাদেরকে অধীনস্তদের প্রতি জুলুম, অত্যাচারের পাপাচারিতা থেকে হেফাযত রাখার জন্য তাদের থেকে খেলাফত এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'আলার তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এ ঘটনা তারই প্রতিফলন বৈ আর কিছু নয়। কেননা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পুরাপুরে যৌবনকালীন অবস্থা হচ্ছে নিরেট জুলুম অত্যাচার। এক্ষেত্রেও স্বতন্ত্রতা নেই তা কিন্তু নয়। হযরত আবু বকর উমারসহ অনেকেরই স্বতন্ত্রতার ইতিহাস বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তারা যে প্রকার প্রজাদের ওপর প্রশাসন পরিচালনা করেছেন আহলে বাইতের সময়ে এমন প্রজাদের ওপর প্রশাসন পরিচালনার আদৌ কি সম্ভাবনা ছিল?

উসমান গণী (রা)-এর খেলাফতের যুগে শত্রুচক্রের ভয়াবহ ফেৎনা-ফাসাদ কি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেনি? তা কি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে? মোটেই না। বরং ক্রমান্বয়েই এ ফেৎনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েই উঠেছে। প্রকারান্তরে এ পথে হুসাইন (রা) সর্বশেষ শাহাদতবরণ করেন বরং পরবর্তী সময় একই ধরাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

এ অস্থায়ী জগতের সবকিছুই নবী করীম ﷺ-এর সামনে পেশ করা হয়েছে। উপস্থিত করা হয়েছে চিরস্থায়ীভাবে বস্তুর মসনদে বসে থাকার প্রস্তাব। কিন্তু

তাতে কি তিনি রাজী হয়েছেন? তিনি এ সমূহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁকে বাদশাহরূপী নবী থাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দারূপে রাসূল থাকাকে পছন্দ করেছেন। তিনি পানাহার এবং অন্ন-বস্ত্রহীন হলে ধৈর্য-সহ্যের নিদর্শন স্থাপন করতেন। আর ইন্তিকালের শেষ সময়ে প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীনের হাড়িতে এক বেলার অনুপযোগী সামান্য আটা ব্যতীত জীবন বাচাঁর খাবার বলে কোন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

হুসাইন (রা)-কে হত্যা করার অপরাধ ছোট খাট অপরাধ নয়। একে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। এর বেদনায় আসমান, যমীন, পাহাড়, পর্বত এবং গোটা দুনিয়া ফেটে যাওয়ার মতো অপরাধ, অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু তবু এর রেশকে দীর্ঘ রূপ প্রদান করা যায় না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ এবং আত্মকলহে লিপ্ত হয়ে মুসলিম ঐক্যে অনৈক্যের বীজ বপন করা আমাদের জন্য মোটেও কল্যাণজনক হবে না। যা হওয়ার ছিল তা হয়ে গিয়েছে। যা তাকদীরে ছিল তাই ঘটেছে। তাদের প্রত্যেকেই স্বীয় কৃতকর্মের সম্মুখীন হয়েছে। সম্মুখীন হয়েছে আল্লাহ তা'আলা, যিনি ন্যায়বিচারক এবং সকলের নিয়ত সম্পর্কে জানেন। তাই হিসাব নিকাশের জন্য তিনিই যথেষ্ট।

হুসাইন (রা) সর্বপ্রথম শহীদ নন। ইতোপূর্বে বস্তু বিরাগী খলিফায়ে রাশেদ হুসাইন (রা)-এর পিতা আলী (রা) ও শাহাদাত বরণ করেছেন। একই স্বার্থবাদী চক্র এর পূর্বে মাজলুম খলিফা উসমান (রা)-কে শহীদ করেছে। তিনি ধৈর্যের যে নিদর্শন স্থাপন করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তার জন্য কোন মুসলমানের রক্তপাত ঝরবে, এরূপ চিন্তা করে তিনি সাহাবাদেরকে বিদ্রোহ দমনের অনুমতি দেননি। এরও পূর্বে ওমর (রা)-কেও শহীদ করা হয়েছে। অথচ তিনি তখন নবী করীম ﷺ-এর মসজিদে তাঁর স্থলে দণ্ডায়মান হয়ে ফজরের সালাতে ইমামতি করলেন। উমার (রা) একদিকে যেমন ছিলেন মহান ব্যক্তিত্ব, তেমনি ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পর মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম খলিফা।

এ অপরাধীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জামালের যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন অগণিত সাহাবায়ে কেরাম। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবী তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) এবং যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা) জামালের যুদ্ধে এদের হাতেই।

এরপূর্বে আরিসী ইয়াহুদীরা আল্লাহ্ তা'আলার মহান নবী ঈসা (আ)-কে হত্যা কর না এবং শূলিবিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ কথা ভিন্ন যে, তারা তাদের সিদ্ধান্তকে কার্যকর করণে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীকে স্বীয় কুদরতের দ্বারা জীবিতাবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেন এবং হত্যার উদ্দেশ্যে অনুপ্রবশেকারীকে ঈসার আকৃতির দিয়ে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন। ইয়াহুদী অনুপ্রবেশকারীকে ঈসার মতো অনুরূপ তাকে হত্যা এবং শূলীবিদ্ধ করে অদ্যাবধি চিত্তানন্দে লিপ্ত রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ـ

তারা তাকে হত্যা করেনি, শূলীবিদ্ধও করেনি। বরং তাদের সামনে তার আকৃতি দান করা হয়েছিল। (সূরা নিসা : আয়াত-১৫৭)

শুধু তাই নয়, ইয়াহুদীরা শত্রুতামূলক পরশ্রীকাতর হয়ে অগণিত নবী-রাসূলের ওপর জুলুম এবং নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাদেরকে হত্যা করেছে। তাদের নবী হত্যার চিত্রকে কুরআন কারীমের কতিপয় আয়াতে উদ্ধৃতি করা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَتَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ـ

যখনই কোন রাসূল তোমাদের কাছে এমন নির্দেশ নিয়ে আগমন করেছে যা তোমাদের মনপূতঃ হয়নি, তখনই তোমরা গর্ব করেছ। কতিপয়কে মিথ্যুক বলে অভিহিত করেছ আর কতিপয়কে হত্যা করেছ। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-৮৭)

ফেরাউন যদি সক্ষম হতো তাহলে মূসা (আ)-কেও হত্যা করে ফেলত। কেননা মূসা (আ)-কে হত্যা করার সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপই সে অবলম্বন করেছিল। সূরা ইয়াসীনসহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার আয়াতসমূহে পূর্বেকার অসংখ্য ঈমানদারদের হত্যা করার হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। আসহাবে উখদুদের ভয়াবহ ঘটনা আবৃত্তি করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلنَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ - اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ - وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ - وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ -

অভিশপ্ত অগ্নিসংযোগকারীরা, যখন তারা তার পাশে উপবিষ্ট ছিল এবং তারা ঈমানদারদের সাথে যা করেছিল তা নিরীক্ষণ করছিল। তারা তাদেরকে শুধু এ কারণে শাস্তি প্রয়োগ করেছিল যে, তারা প্রশংসিত পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (সূরা বুরুজ : আয়াত-৫-৮)

এদেরই অপকীর্তির উল্লেখ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : তোমাদের পূর্বে শত্রু কাওম ঈমানদারদেরকে ধরে যমীনের গর্তে পুতে ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কর্তন করে: দুই ভাগ করে ফেলত এবং লোহার ধারালো চিরুণী দ্বারা হাড় গোশতসহ ছিঁড়ে ফেলত। তবুও তাদেরকে ধর্মচ্যুত করা সম্ভবপর হতো না।

মানুষের মধ্যে পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলার সনাতন বিধান অনুযায়ী সত্য এবং বাতিল, ঈমান ও কুফর এবং নেফাকের মধ্যে এরূপ সংঘাত সর্বদা অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। কারা ন্যায়পরায়ণ আর কারা স্বার্থবাদী তারই হাতে কলমে প্রমাণ দাঁড় করানোর জন্য এ পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

হুসাইন (রা) এবং তাঁর সাথীদের শাহাদতের ঘটনা উল্লেখ করে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন এবং ঘটনাকে বিভিন্ন রূপে রূপায়িত করেছেন। ঐতিহাসিকদের বিবেচনা এবং পর্যালোচনার নিরিখে এ কথা বলা যায় যে, হুসাইন (রা) এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীদের হত্যাকারী পাষণ্ড পাপাচারী সকলেই ছিল ক্ষমতা লিপ্সু এবং ন্যায় ও বিবেকহীন স্বার্থপরায়ণ। এ প্রশ্নে উমার ইবনে সা'আদের ভূমিকা পর্যালোচনা উল্লেখ করা যেতে পারে। সে প্রথম হুসাইন (রা)-এর প্রস্তাবকে সমর্থন দান করে। আর ন্যায়সংগত মনে করেই সে প্রস্তাবসমূহকে নিজের বক্তব্য অনুযায়ী ইবনে যিয়াদকে লিখিতভাবে অবহিত করেন। হুসাইন (রা)-কে ইয়াযীদের নিকট পাঠানোর একান্ত ইচ্ছা কথাও ইবনে যিয়াদকে জ্ঞাত করেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে সীমার এসে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব উপস্থাপন করে। তার প্রস্তাব ছিল, 'আপনি হুসাইনকে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ

করতে বাধ্য করুন এবং তাকে ইবনে যিয়াদের দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য করুন।" হুসাইন (রা)-এর নিকট এ প্রস্তাব পেশ করা হলে তিনি সম্পূর্ণ অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তবুও উমার ইবনে সাআদ হুসাইন (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে প্রত্যাশা করেননি। ইবনে সা'আদের যে প্রায় ৩০ জন বিশিষ্ট কুফাবাসী দরবারী লোকেরা তাকে তখন এ বলে ভৎসনা করেছিল যে, নবী করীম ﷺ-এর মেয়ের সন্তান তোমাদের কাছে তিন তিনটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তোমরা তার কোন একটি প্রস্তাবকেও সমর্থন করতে পার না? তারা রাগান্বিত হয়ে ওমরের সমর্থন প্রত্যাহার করে হুসাইন (রা)-এর সমর্থনে যুদ্ধ করে।

এখান থেকে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের মর্মান্তিক অনিবার্যে মূলনায়ক এবং ষড়যন্ত্রকারী মূলত: সীমার। সেই জনগণকে অনুপ্রাণিত করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে হত্যা করে স্বীয় ইচ্ছা চরিতার্থ করে। এদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার, ফেরেশতাদের এবং সমস্ত মানুষের লা'নত বর্ষিত হোক। আর সমস্ত জান্নাতবাসী শহীদদের সাথে হুসাইন (রা) আনন্দে উদ্ভাসিত হোন, আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের এ প্রত্যাশা।

এ সম্পর্কিত আমরা আল্লাহ তা'আলার সমীপে পেশ করতে পারি। এ ব্যাপারে মহান রাব্বুল আলামীনের সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশই হবে আমাদের খাঁটি ঈমান এবং শিষ্টাচারিতার পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলা তার সেরা সৃষ্টি মানুষের মধ্যে অব্যাহত মতবিরোধের বিষয়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-বিশ্লেষণে পারদর্শীও প্রজ্ঞাবান এটাই আমাদের চরম ও পরম বিশ্বাস। তিনি অত্যন্ত হিকমতের মালিক এবং সর্বজ্ঞ। তিনি ইচ্ছা করলে তার এবং ঈমানদারদের কল্যাণের বহির্ভূত কোন কিছুই সংঘটিত হত না।

আল্লাহ তা'আলা হুসাইন (রা)-কে সমস্ত শহীদের সাথে চিরসুখে জান্নাতবাসী করুন, যারা তার ভক্তবৃন্দ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য তার সাথে শাহাদতবরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অশেষ রহমত অবতীর্ণ করুন। তাদের সাথে সাথে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত শহীদগণের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত করুণা ও নে'আমত অবিরত বর্ষণ হোক। বস্তুত: শাহাদাতের পুত:পবিত্র এ ধারাবাহিকতা ঈসা (আ)-এর আগমন এবং দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত অবশ্যই অব্যাহত থাকবে।

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

সে উম্মত গত হয়েছে, তারা যা করেছে তা তাদের জন্য আর তোমরা যা করেছ, তা তোমাদের জন্য। তারা যা করেছে সে ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না। (সূরা বাক্বারা : আয়াত-১৪১)

হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের হৃদয়বিদারক এ ঘটনা আমরা সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করেছি। সুতরাং ধর্মীয়, নৈতিক এবং বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মিথ্যা ও ভ্রান্ত তত্ত্বের আশ্রয়ে আমাদের সমালোচনা করা মোটেই সঠিক হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে অজানা বিষয়ের কোন কিছু বলতে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইরশাদ করেছেন–

وَلاَتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً ـ

যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পশ্চাতে পড়ো না। চক্ষু, অন্তর, প্রত্যেকের সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩৬)

নিজের এবং মানুষের প্রতি সুধারণা এবং ঈমানের পাল্লায় সমস্ত বিষয়বস্তুর ওপর করা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি অপরিহার্য করেছেন। এ কারণেই উম্মুল মু'মিনূন আয়েশা (রা)-এর মতো পুত:পবিত্রা সম্মানিতা নবী স্ত্রীর বিষয়ে মিথ্যা অপপ্রচার প্রসারিত হলে সমর্থন অসমর্থন করে অনেকেই সমালোচনায় জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু যারা প্রকৃত এবং খাঁটি ঈমানদার ছিলেন তারা এ ঘটনাকে ডাহা মিথ্যা এবং অপপ্রচার বলে আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি সু-ধারণার পরিচয় দেন। তাই যারা এর বিপরীত করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভূমিকার প্রতিবাদ করে ইরশাদ করেন–

وَقَالُوا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ـ

এবং তারা কেন বলেনি এতো সু-স্পষ্ট অপবাদ। (সূরা নূর : আয়াত-১২)

বিশিষ্ট সাহাবী আবু আইয়্যুব আনসারী (রা) তাঁর স্ত্রী উম্মে আইয়্যুবকে বলেছিলেন, আয়েশা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? উম্মে আইয়্যুব জবাবে

বলেছিলেন, যদি ছাফওয়ানের স্থলে আপনি হতেন তাহলে আপনি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করতে পারতেন? তিনি বললেন, অবশ্যই না। উম্মে আইয়্যুব বললেন, যদি আয়েশার স্থানে আমি হতাম, তাহলে আমি রাসূলের স্ত্রী হলে কোন দিন অপকর্ম করতাম না। আর আয়েশা আমার তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ ও উত্তম, আর আপনার চেয়ে ছাফওয়ান অধিক নেককার। কাজেই যা রটানো হচ্ছে তা কি করে সত্য হতে পারে? এ কথোপকথনের পরই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন :

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ـ لَوْلَا جَآءُوْا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ـ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

এ কথা শ্রবণ করে ঈমানদার পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে সুধারণা করেনি? এবং কেন বলেনি যে, এতো সুস্পষ্ট অপবাদ! তারা এ ব্যাপারে কেন চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি। যখন সাক্ষীদেরকে উপস্থাপন করতে পারেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। ইহকাল এবং পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এ মিথ্যা চর্চার কারণে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি স্পর্শ করতে। (সূরা নূর : আয়াত-১২-১৪)

উপরিউক্ত এবং পরবর্তী আয়াতের দ্বারা দিবালোকের মতো এটাই সু-স্পষ্ট হয় যে, স্বার্থান্বেষী মহলের হীন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত কোন সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত হলে জ্ঞানের কষ্টিপাথরে তা নিরীক্ষা যাচাই করে দেখা ঈমানদারের ওপর ফরয। আর যাচাই-বাছাই না করে সমালোচনায় শরীক হলে অথবা অসার এবং ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচারে অংশ নিলে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তাই আমরা উপরিউক্ত তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই যে, পবিত্র আহলে বাইতের মহামানব হুসাইন (রা) এবং তাঁর সফরসাথীদেরকে তারাই হত্যা করেছে যারা ঈমানের দাবির অন্তরালে কুফরী গোপন করেছিল। মূলত: এরা ছিল

ইসলাম এবং মুসলমানের চরম এবং পরম শত্রু। আমরা আমাদের আলোচনার শুরুতে হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করে ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি যে, হুসাইন (রা)-কে ঐ স্বার্থবাদী পাপাচারী চক্রই হত্যা করেছে, যারা বছরা, কুফা এবং মিসরের গণ্ডমূর্খ। যারা অতি গোপনে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ফেৎনার সূচনা করে আসছিল এবং তাদের নীলনকশা অনুপাতে এক সময় মদীনা শরীফে সম্মিলিত হয়ে উসমান গণী (রা)-এর নামে মিথ্যা পত্র রচনা করে তাকে শহীদ করার গোপন সিদ্ধান্ত কার্যকর করে।

এরাই পরবর্তী সময় আহলে বাইতের প্রতি ক্রোধ এবং শত্রুতা অন্তরে গোপন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসা এবং আক্রোশ বাস্তবায়িত করণের মানসে নিজেদেরকে হুসাইন (রা)-এর একক বন্ধু এবং প্রেমিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এটা ছিল তাদের কপটতা ও ছলনা। তারা ফিৎনাকে স্থায়ীভাবে রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামের পুতঃপবিত্র আকীদার বিষয়সমূহে গর্হিত বিষয় সংযোজন করতে প্রয়াস পায়। এক পর্যায়ে তারা আলী (রা)-কে খোদা বলে দাবি উত্থাপন করে। তারা বলে আল্লাহ্ তা'আলা আলী (রা)-এর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেছেন অথবা নিজেই তিনি আলীর আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এ জাতীয় ভিত্তিহীন ও গর্হিত আকীদাসমূহের মূল হোতা এরাই। এসব গর্হিত আকীদার ভিত্তিতেই মুসলমানদের মধ্যে আত্মকলহ দ্বন্দ্ব এবং অসংখ্য দল উপদল সৃষ্টি হয়।

হুসাইন (রা)-এর মাথা মুবারক : কথিত রয়েছে যে, ইয়াযীদ হুসাইন (রা)-এর মাথা মুবারক তার পরিবারের অন্যান্য লাশসহ পবিত্র মদীনায় প্রেরণ করে এবং মা ফাতেমার পাশে হুসাইন (রা)-এর মাথা মুবারককে কাফন পরিয়ে দাফন করা হয়। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিকগণ এ তথ্যাদিকে ভ্রান্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে শাহাদাতের চল্লিশ দিন পর কারবালায় বাকি লাশের সাথে রাখা হয়। তাদের অনেকে লিখেছেন যে, মাথা মুবারক শূলী কাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখার কিছুদিন পর ইয়াযীদ মাথা মুবারককে তার অস্ত্রাগারে সংরক্ষণ করে রাখে। যখন সুলাইমান ইবনে মালিক খলিফা নিয়োগ হন তখন তিনি মাথা মুবারক আতরের সুগন্ধে সুরভিত ও মোহিত করে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কাফন এবং জানাযা সালাত শেষে দামেশকের কবরস্থানে দাফন করেন।

যখন তাইমুরী বাহিনী দামেশকে প্রবেশ করে, তারা কবর খনন করে মাথা মুবারককে নিয়ে যায়। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মুকারিযী মাওয়ায়েজুল 'এতেবার' নামক গ্রন্থে লেখেন, ৪৯১ হিজরীর শাবান মাসে সেনাপতি আফজল তার বাহিনীসহ বাইতুল মুকাদ্দাস অভিমুখে যাত্রা করেন এবং আসকালান শহরের কোন দেয়ালে রক্ষিত হুসাইনের মাথা মুবারক হস্তগত করে অতি সম্মানের সাথে আসকালান শহরের কোন এক স্থান সংরক্ষণ করে রাখেন।

সেখানে সেনাপতি বদরুল জামানের নির্দেশক্রমে নিদর্শনস্বরূপ একটি বিরাট প্রাচীর নির্মাণ কাজও শুরু হয়, আর সমাপ্তি ঘটে তারই সুযোগ্য সন্তান সেনাপতি আফজলের হাতে। বলা হয় আসকালান শহরের ঐ প্রাচীরেই হুসাইন (রা)-এর মাথা মুবারক সংরক্ষিত থাকে। এরপর জুমাদাল উখরা ৫৪ হিজরী সনে সে স্থান থেকে মাথা মুবারক মিসরে স্থানান্তরিত করে হেফাজত করা হয়। সে রক্ষিত স্থানে সুলতান সালাহউদ্দীন নিজ তত্ত্বাবধানে বিশাল ইসলামী সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে হাদীস এবং ফেকাহর ওপর রিসার্চ এবং গবেষণার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল .

মঈনুদ্দীন সাহেব হাসান ইবনে শায়খ ইবনে হামাভিয়ার মন্ত্রিত্বকালে এ ইসলামী সেন্টারের প্রতি সবিশেষ পরিচর্যা নেয়া হয়। দূররুন্নাজীম গ্রন্থে বলা হয়, তিনি হুসাইন (রা)-এর মাযারের পাশে মিসরের সর্বসুন্দর একটি মসজিদ এবং তৈরি খানা নির্মাণ করেন।

মুরশিদুযযাওয়াক-এর লেখকের মতে হুসাইন (রা)-এর মাথা মুবারক আসকালান থেকে যাহের ফাতেমীর যুগে মিসরের শাহী বালাখানায় স্থানান্তরিত করা হয়। আবার কেউ কেউ লিখেছেন যে, ৫৫৫ হিজরী সনে ইবনে রুযাইক নির্মিত দেয়ালে মাথা মুবারক দাফন করে রাখার দীর্ঘ দিন পর মন্ত্রী ইবনে রুযাইক ৩০ হাজার দিনার খরচ করে মাথা মুবারক মিসরে স্থানান্তরিত করেন এবং নিদর্শন স্থাপন করেন। অদ্যাবধি মাথা মুবারক এখানে সংরক্ষিত রয়েছে কি-না এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক সূত্রে নিশ্চয়তার সাথে নির্ভরশীল হওয়ার মতো কোন তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে তাঁর মাথা মুবারক ও লাশ যেখানেই থাকুক না কেন তিনি বিশ্ব মুসলিমের চিন্তা-ভাবনা, মাথা উপশিরা এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে সংরক্ষিত ও অমর হয়ে আছেন, ছিলেন এবং থাকবেন।

বর্ণনা : বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে অন্তত ১৩৮৮টি বর্ণনার সাথে ইমাম হুসাইন ইবনে আলী (রা)-এর সম্পর্ক দেখা যায়।

১৬. হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)

হামযার হত্যাকারী ওয়াহশী (রা) মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম কবুল করে নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি ওয়াহশী? জবাব দিলেন : হ্যাঁ। 'তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছ?' জবাব দিলেন : 'আল্লাহর রাসূল যা শুনেছেন, তা সত্য।' নবী করীম ﷺ বললেন : 'তুমি কি তোমার মুখমণ্ডল আমার কাছে একটু গোপন করতে পার?' তক্ষুণি তিনি বাইরে বের হয়ে যান এবং জীবনে আর কখনো নবী করীম ﷺ-এর মুখোমুখি হননি।

জাফর ইবনে আবু তালেব এবং হামজা (রা) জান্নাতী

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ فَنَظَرْتُ فِيْهَا فَاِذَا جَعْفَرُ يَطِيْرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَاِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلٰى سَرِيْرٍ -

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : গত রাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে, জাফর ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর হামজা খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। (ত্বাবারানী, সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ৩৩৫৮)

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম হামযা, আবু ইয়ালা ও উপনাম আবু 'আম্মারা এবং আসাদুল্লাহ হলো উপাধি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আপন চাচা। হামযার মাতা হালা বিনতু উহাইব নবী করীম ﷺ-এর মা আমিনার চাচাতো বোন। এছাড়া হামযা ছিলেন নবী করীম ﷺ-এর দুধ ভাই। আবু লাহাবের দাসী 'সুওয়াইবা' তাঁদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছিলেন। বয়সে তিনি রাসূলে করীম ﷺ-এর চেয়ে দু' বছর মতান্তরে চার বছর বড়।

বিশেষ গুণাবলী : ছোটবেলা থেকেই তরবারি চালনা, তীরন্দাযী ও কুস্তির প্রতি ছিল তার প্রচণ্ড আগ্রহ। সফর ও শিকারের প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন আকর্ষণ। জীবনের বৃহৎ এক অংশ তিনি এ কাজে ব্যয় করেন।

বেশ কিছু দিন ধরে মক্কার অলি-গলিতে তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হচ্ছিল। তবে হামযার মতো সিপাহী-স্বভাব মানুষের এ তাওহীদের বাণীর প্রতি তেমন মনোযোগ ছিল না।

একদিন তিনি শিকার থেকে ফিরছিলেন। সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের এক দাসী তাঁকে ডেকে খবরটা দিল। বলল 'আবু আম্মারা! আহ্, কিছু সময় আগে এসে আপনার ভাতিজার অবস্থা যদি একটু দেখতেন! অসম্ভব কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু নবী করীম কোন উত্তর না দিয়ে অসহায়ভাবে ফিরে গেছেন।' একথা শুনে তাঁর সৈনিকসুলভ রক্ত টগবগ করে উঠল। দ্রুত তিনি কা'বার দিকে এগিয়ে গেল। তাঁর অভ্যাস ছিল, শিকার থেকে ফেরার পথে কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে কিছু সময় দাঁড়িয়ে তার সাথে দু-চারটি কথা বলা হত।

প্রতিশোধ পরায়ণ : কিন্তু আজ তিনি প্রতিশোধ স্পৃহায় অস্থির হয়ে পড়লেন। রাস্তায় কারো দিকে কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা কা'বার নিকট গিয়ে আবু জাগলের মাথায় ধনুক দিয়ে সজোরে এক আঘাত বসিয়ে দিলেন। আবু জাহলের মাথা ফেটে গেল। অবস্থা খারাপ দেখে বনু মাখযুমের কিছু সংখ্যক লোক আবু জাহলের সাহায্যে দৌড়ে এল। তারা বলল : 'হামযা! সম্ভবত: তুমি ধর্মচ্যুত হয়েছ।' উত্তরে বললেন : 'যখন তার সত্যতা আমার নিকট উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে, তখন তা থেকে আমাকে বাধা দিবে কে? হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। যা কিছু তিনি বলেন সকলই সত্যি।

আল্লাহর কসম আমি তা থেকে আর প্রত্যাবর্তন করতে পারি না। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, আমাকে একটু বাধা দিয়েই দেখ।' আবু জাহল তার সাহায্যে অগ্রসর হওয়া লোকদের বলল : 'তোমরা আবু আম্মারকে ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, কিছু আগেই আমি তাঁর ভাতিজাকে মারাত্মক গালাগালি করেছি।'

পরবর্তীকালে হামযা বলেছেন, আমি ক্রোধে দিশাহারা হয়ে কথাগুলো তো বলে ফেললাম; কিন্তু আমার পূর্বপুরুষ ও গোত্রের ধর্মত্যাগের জন্য আমি অনুশোচনায় দগ্ধিভূত হতে লাগলাম। একটা সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে পড়ে সারা রাত ঘুম হয়নি। কা'বায় এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম, যেন

আমার অন্তর-দুয়ার সত্যের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়, অন্তর থেকে সংশয় দূরীভূত হয়। প্রার্থনার পর আমার অন্তর দৃঢ় প্রত্যয়ে পূর্ণ হয়ে যায়। তারপর আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আমার অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার অন্তরের স্থিতির জন্য দোয়া করলেন।

ইসলাম গ্রহণ : এটা মুসলমানদের সেই দুঃসময়ের কথা যখন নবী করীম ﷺ আরকাম ইবনে আবুল আরকামের ঘরে আশ্রয় নিয়ে গোপনে ইসলামের প্রচার করছিলেন। মুসলমান বলতে তখন ছিলেন সামান্য কিছু আশ্রয়হীন মানুষ। এ অবস্থায় আকস্মিকভাবে হামযার ইসলাম গ্রহণে অবস্থা ভিন্ন খাতে মোড় নেয়। মু'মিনদের সাথে বিধর্মীদের অহেতুক বাড়াবাড়ি ও বেপরোয়া ভাব অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, তাঁর দুঃসাহস ও বীরত্বের কথা মক্কার প্রতিটি মানুষই অবগত ছিল।

হামযার ইসলাম গ্রহণের পর একদা উমার (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন। তিনি তখন আরকামের ঘরে কিছু সংখ্যক সাহাবীর সাথে অবস্থান করছেন। হামযাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। উমার (রা) ছিলেন সশস্ত্র অবস্থায়। তাঁকে দেখেই উপস্থিত সকলে প্রমাদ গুণল। কিন্তু হামযা বলে উঠলেন : 'তাকে আসার সুযোগ দাও। যদি সে ভালো উদ্দেশ্যে এসে থাকে, আমরাও তার সাথে উত্তম আচরণ করব। অন্যথায় তারই তরবারি দিয়ে তাকে নিহত করা হবে।' উমার ভেতরে প্রবেশ করেই কালেমা তাওহীদ পড়তে থাকেন। তখন উপস্থিত মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে। এ দুই মনীষীর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়। মক্কার মুশরিকরা বুঝতে পারে, মুহাম্মাদের ﷺ দেহে আঁচড় কাটা আর সহজ হবে না।

মক্কায় থাকাবস্থায় নবী করীম ﷺ তাঁর প্রিয় খাদেম যায়েদ ইবনে হারিসার সাথে হামযার ভ্রাতৃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। যায়েদের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালোবাসা এত প্রগাঢ় হয় যে, যখন তিনি বাইরে কোথাও প্রস্থান করতেন তাঁকেই সব বিষয়ে অসীয়াত করে যেতেন।

ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে : নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে আরো অনেকের সাথে হামযাও মদীনায় ও মুনাওয়ারায় হিজরত করলেন। এখানে তাঁর আল্লাহর দেয়া শক্তি ও সাহসিকতা প্রকাশ করার বাস্তব সুযোগ এসে যায়।

হিজরতের সপ্তম মাসে রাসূল ﷺ 'ঈস' অঞ্চলের সমুদ্র উপকূলের দিকে তিরিশ সদস্যের মুহাজিরদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠান। উদ্দেশ্য, কুরাইশদের গতিবিধি

প্রত্যক্ষ করা। এ বাহিনীতে আনসারদের কেউ ছিল না। এখানে তাঁরা সমুদ্র উপকূলে আবু জাহলের নেতৃত্বে মক্কার তিনশো অশ্বারোহীর একটি বাহিনীর মুখোমুখি হন। তারা সিরিয়া থেকে ফিরছিল। কিন্তু মাজদী ইবনে 'আমর জুহানীর প্রচেষ্টায় এবারের মতো সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। মাজদীর সাথে দু'পক্ষের সন্ধিচুক্তি ছিল। মদীনা থেকে যাওয়ার সময় নবী করীম ﷺ হামযার হাতে ইসলামী ঝাণ্ডা তুলে দেন। ইবনে আবদুল বারসহ কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, এটাই ছিল আল্লাহর রাসূল ﷺ কর্তৃক কোন মুসলমানের হাতে তুলে দেয়া প্রথম ঝাণ্ডা। (সিরাত ইবনে হিশাম)

দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে নবী করীম ﷺ নিজে ষাটজন সশস্ত্র সাহাবী নিয়ে কুরাইশদের বাণিজ্য পথে 'আবওয়া' অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানেও হামযা ছিলেন পতাকাবাহী এবং সব বাহিনীর কমাণ্ডও ছিল তাঁর হাতে। মুসলিম বাহিনী আগেই কুরাইশ কাফেলা অতিক্রম করায় এ সফরেও কোনরূপ সংঘর্ষ ঘটেনি। এমনিভাবে হিজরী দ্বিতীয় সনের 'উশায়রা' অভিযানেও হামযা মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহীর গৌরব লাভ করেন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইসলামের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী দ্বিতীয় সনে। এ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষ সারিবদ্ধ হওয়ার পর কুরাইশ পক্ষের উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদ সারি থেকে বের হয়ে এসে মুসলিম বাহিনীর কাউকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে। দ্বীনের সিপাহীদের মধ্য থেকে তিনজন আনসার জওয়ান তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন। কিন্তু উতবা চিৎকার করে বলে উঠে : 'মুহাম্মদ, আমাদের সমমান লোকদেরই প্রেরণ কর। এসব অনুপযুক্ত লোকদের সাথে আমরা আহ্বান চাই না।

নবী করীম ﷺ নির্দেশ করলেন : হামযা, আলী ও উবাইদা ওঠে এস, সামনে এগিয়ে যাও।' তাঁরা শুধু আদেশের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিলেন। এ তিন নওজোয়ান নিজ নিজ নিশানা ও বর্শা নিয়ে তাঁদের প্রতিপক্ষের সামনে দাড়ালেন। প্রথম আক্রমণেই হামযা উতবাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। আলীও বিজয় লাভ করলেন তাঁর প্রতিপক্ষের ওপর। কিন্তু আবু উবাইদা ও ওয়ালিদের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধস্তাধস্তি চলছিল। অতঃপর আলীর সহযোগিতায় আবু উবাইদা তাকে তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন। শত্রুপক্ষের এ করুণ অবস্থা দেখে তুয়াইমা ইবনে আদী তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এল। হামযার সহযোগিতায় আলী (রা)

তরবারির এক আঘাতে তাকে ভূপতিত করল। এরপর মুশরিক বাহিনী সর্বাত্মকভাবে আক্রমণ চালায়।

মুসলিম মুজাহিদরাও এতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এ যুদ্ধে হামযা পাগড়ীর ওপর উটপাখির পালক গুঁজে রেখেছিলেন। এ কারণে যে দিকে তিনি গমন করছিলেন সুস্পষ্টভাবে তাকে দেখা যাচ্ছিল। দু'হাতে বজ্রমুষ্টিতে তরবারি ধরে বীরত্বের সাথে কাফিরদের ব্যূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছিলেন। এ যুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর শত্রুরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। উমাইয়া ইবনে খালাফ আবদুর রহমান ইবনে 'আউফকে প্রশ্ন করেছিল : উটপাখির পালক লাগানো এ ব্যক্তিটি কে? তিনি যখন বললেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চাচা হামযা, তখন সে বলেছিল : 'এ ব্যক্তিই আজ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস সাধন করেছে।'

মদীনার উপকণ্ঠেই ছিল ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের বনু কাইনুকা'র আবাসস্থল। নবী করীম ﷺ মদীনায় হিজরতের পর তাদের সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় অর্জনে তাদের হিংসার লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তারা প্রচণ্ড বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এ চুক্তি ভঙ্গের কারণে রাসূলে করীম ﷺ দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানেও হামযাকে পতাকাবাহীর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ : বদরের শোচনীয় পরাজয়ে কুরাইশদের আত্ম অহংকার দারুণভাবে আহত হয়। প্রতিশোধ ইচ্ছায় উন্মত্ত বিশাল কুরাইশ বাহিনী হিজরী তৃতীয় সনে মদীনার দিকে অগ্রসর হলো। আল্লাহর নবী ﷺ সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তাদের গতিরোধ করেন। শাওয়াল মাসে যুদ্ধ শুরু হয়। কাফিরদের পক্ষ থেকে 'সিবা' নামক এক বাহাদুর সিপাহী অগ্রসর হয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে। হামযা কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে মাঠে এসে হুংকার ছেড়ে বললেন : ওরে উম্মে আনমারের অপবিত্র পানির সন্তান, তুই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছিস? এ কথা বলে তিনি এমন প্রচণ্ড আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, এক আঘাতেই সিবার কাজ সমাপ্ত। তারপর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হামযার ক্ষিপ্ত আক্রমণে কাফিরদের আস্তানা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। এ যুদ্ধে তিনি একাই ৩০ জন কাফির সৈন্যকে হত্যা করেন।

উহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ : যেহেতু হামযা বদর যুদ্ধে কুরাইশদের অনেক বীর পুরুষ জাতীয় নেতাকে হত্যা করেছিলেন, এ কারণে কুরাইশদের সকলেই তাঁরই খুনের তৃষ্ণা ছিল সবচেয়ে বেশি। হামযার হত্যাকারী ওয়াহ্শী উহুদ ময়দানে হামযার হত্যা ঘটনাটি পরবর্তীকালে প্রকাশ করেছিল। ইবনে হিশাম তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থে তা বর্ণনা করেছেন। ওয়াহ্শী বলেন : 'আমি ছিলাম যুবাইর ইবনে মুত'য়িমের এক হাবশী ক্রীতদাস। বদর যুদ্ধে যুবাইরের চাচা তুয়াইম ইবনে 'আদী হামযার হাতে নিহত হয়। মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে যুবাইর আমাকে বলল : যদি তুমি মুহাম্মদের চাচা হামযাকে হত্যা করে আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পার, আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব। আমাকে সে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিল।

আমি শুধু হামযাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই উহুদ অভিমুখে রওয়ানা করলাম। যুদ্ধ শুরু হলো। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে হামযার অপেক্ষায় ওৎপেতে রইলাম। এক পর্যায়ে আমার সন্নিকটে উপস্থিত হলে অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করলাম। তারপর আমার স্বপক্ষ সৈন্যদের কাছে ফিরে এসে নিষ্কর্মা হয়ে বসে রইলাম। যুদ্ধে আর শরীক হলাম না। কারণ, আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। আমি মক্কায় ফিরে এলে আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়।'

এ মর্মান্তিক ঘটনা তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি। সংঘটিত হয় হামযার বয়স তখন ষাটের কাছাকাছি।

হামযার শাহাদাত লাভের পর কুরাইশ মহিলারা আনন্দ সংগীত পরিবেশন করেছিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা হামযার নাক-কান কেটে অলংকার তৈরি করেছিল, বুক, পেট চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে থুথু নিক্ষেপ করেছিল। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেছিলেন, সে কি তার কিছু অংশ ভক্ষণও করেছিল? লোকেরা বলেছিল : না। তিনি বলেছিলেন : হামযার শরীরের কোন একটি অংশও আল্লাহ্ জাহান্নামে যেতে দেবেন না।

সাইয়্যেদুশ শুহাদা উপাধি : যুদ্ধ শেষে শহীদের দাফন-কাফনের আয়োজন শুরু হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মানিত চাচার লাশের কাছে দাড়ালেন। যেহেতু হিন্দা তাঁর নাক-কান কেটে বিকৃত করে ফেলেছিল, তাই এ দৃশ্য অবলোকন করে তিনি কেঁদে ফেললেন। তিনি বললেন : কিয়ামতের দিন হামযা হবে 'সাইয়্যেদুশ শুহাদা' বা সকল শহীদের সর্দার। তিনি আরো বললেন : তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার জানামতে তুমি ছিলে আত্মীয়তার সম্পর্কের বিষয়ে অধিক সচেতন ও অতিশয় সৎকর্মশীল। যদি সাফিয়্যার শোক ও দুঃখের কথা

আমার মনে না থাকত তাহলে এভাবেই তোমাকে ফেলে রেখে যেতাম, যাতে পশু-পাখি তোমাকে খেয়ে ফেলত এবং শেষ বিচারের দিন তাদের পেট থেকে আল্লাহ তোমাকে জীবিত করতেন। আল্লাহর কসম, 'তোমার প্রতিশোধ নেয়া আমার ওপর ওয়াজিব। আমি তাদের সত্তর জনকে তোমার মত নাক-কান কেটে বিকৃত করব।' রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কসমের পর জিবরীল (আ) সূরা নাহলের নিম্নোক্ত আয়াত দুটি নিয়ে উপস্থিত হলেন–

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ط وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ـ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَتَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ـ

যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তবে ঠিক ততখানি প্রতিশোধ নেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করলে, ধৈর্যশীলদের জন্য তাই-ই তো উত্তম। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর। তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মন খারাপ করবে না। (সূরা নাহল : আয়াত-১২৬-১২৭)

আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কসমের কাফফারা আদায় করেন। (তাবাকাতে ইবনে সাদ)

কাফন : সাফিয়্যা ছিলেন হামযার বোন। ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে তাঁকে এক দৃষ্টি দেখার জন্য দৌড়ে আসেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখতে না দিয়ে কিছু সান্ত্বনা দিয়ে ফিরিয়ে দেন। ভাইয়ের কাফনের জন্য সাফিয়্যা দু'খানি চাদর পাঠালেন। কিন্তু হামযারই পাশে আরেকটি লাশও কাফনহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। তাই চাদর দু'খানি দু'জনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) বলেন, একটি চাদর ব্যতীত হামযাকে কাফন দেয়ার জন্য আর কোন কাপড় আমরা পেলাম না। তা দিয়ে পা আবৃত করলে মাথা এবং মাথা আবৃত্ত করলে পা দেখা যেত। তাই আমরা চাদর দিয়ে মাথা এবং 'ইজখির' ঘাস দিয়ে পা আবৃত করে দিলাম। (হায়াতুস সাহাবা ১/৩২৬)

সমাহিত : সাইয়্যেদুশ শুহাদা হামযাকে উহুদের ময়দানেই দাফন করা হয়। ইমাম বুখারী জাবির থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম ﷺ উহুদ যুদ্ধে

শহীদদের দু'জন করে একটি কবরে দাফন করেছিলেন। হামযা ও আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশকে এক কবরে দাফন করা হয়।

ইবনে হাজার 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে 'ফাওয়ায়েদে আবিত তাহিরের' সূত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, জাবির (রা) বলেন : মুয়াবিয়া যে দিন উহুদে কূপ খনন করেছিলেন সেদিন আমরা উহুদের শহীদদের জন্য কান্নাকাটি করেছিলাম। শহীদের আমরা সম্পূর্ণ তাজা অবস্থায় পেয়েছিলাম। এক ব্যক্তি হামযার কদমে আঘাত করলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে পড়ে।

হামযার হত্যাকারীর ইসলাম গ্রহণ : হামযার হত্যাকারী ওয়াহশী (রা) মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম কবুল করে নবী করীম-এর খেদমতে হাজির হলেন। নবী করীম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি ওয়াহশী? জবাব দিলেন : হ্যাঁ। 'তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছ?' জবাব দিলেন : 'আল্লাহর রাসূল যা শুনেছেন, তা সত্য।' নবী করীম বললেন : 'তুমি কি তোমার মুখমণ্ডল আমার কাছে একটু গোপন করতে পার?' তক্ষুণি তিনি বাইরে বের হয়ে যান এবং জীবনে আর কখনো নবী করীম-এর মুখোমুখি হননি।

নবী করীম-এর ইন্তিকালের পর আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত কালে ভণ্ডনবী মুসাইলামার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। তিনিও সে অভিযানে অংশগ্রহণ করলেন এ উদ্দেশ্যে যে, মুসাইলামাকে হত্যা করে হামযার হত্যার কাফফারা আদায় করবেন। তিনি এ উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করলেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দিয়ে ইসলামের যতটুকু ক্ষতি করেন তার চেয়ে অধিক উপকার সাধন করেন।

কাব্য প্রতিভা : হামযার মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল প্রখর। ইসলাম গ্রহণ করার পর তখনকার অনুভূতি তিনি কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। সীরাতে ইবনে হিশামে "হামযার ইসলাম গ্রহণ" অধ্যায়ের টীকায় তার কিয়দংশ উল্লেখ করা হয়েছে।

১৭. জাফর ইবনে আবু তালিব (রা)

রাসূলে করীম ﷺ জা'ফরকে দেখে ভীষণ খুশী হলেন যে, তাঁর দু'চোখের মাঝখানে চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেম : 'আমি জানি না, খাইবার বিজয় আর জাফরের প্রত্যাবর্তন এ দু'টির কোনটির কারণে আমি অধিক খুশী।

'জাফর ইবনে আবু তালেব এবং হামজা (রা) জান্নাতী।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ الْبَارِحَةَ فَنَظَرْتُ فِيْهَا فَإِذَا جَعْفَرُ يَطِيْرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَإِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِيءٌ عَلٰى سَرِيْرٍ -

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : গতরাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম যে, জাফর ফেরেশতাদের সাথে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর হামজা খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে। (ত্বাবারানী, সহীহ্ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ৩৩৫৮)

নাম ও পরিচিতি : তাঁর নাম আবু আবদুল্লাহ্ জাফর, পিতা আবু তালিব এবং মাতা ফাতিমা। কুরাইশ গোত্রের হাশেমী বংশের সন্তান। নবী করীম ﷺ-এর চাচাত ভাই এবং আলী (রা)-এর সহোদর ভাই। বয়সে আলী (রা) থেকে দশ বছর বড়।

বনী আবদে মান্নাফের পাঁচ ব্যক্তির চেহারা নবী করীম ﷺ-এর চেহারার সাথে এত অধিক মিল ছিল যে প্রায়শ : ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলত। সে পাঁচ ব্যক্তি হলেন :

১. আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস ইবন আব্দুল্লাহ মুত্তালিব। তিনি একাধারে নবী করীম ﷺ-এর চাচাতো ভাই এবং দুধ ভাইও।

স্বীয় পরিবার-পরিজন ও গোত্রকে ছেড়ে যে মনিবকে তিনি নির্বাচন করতেন, তিনিই সে, সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন এবং গোটা বিশ্বজগতের প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল, এর কোন কিছুই তিনি জানতেন না। তার মনে তখন একটি বারের জন্যও এতটুকু চিন্তা উদয় হয়নি যে, এ বিশ্বে এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র কল্যাণ ও ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তিনিই হবেন সে কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। না, এর সব কিছুই তখন যায়েদের চিন্তা ও কল্পনায় বাইরে ছিল। সবই আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি বিনা হিসাবে প্রচুর দান করেন।

দাসদের মধ্যে প্রথম মুসলমান : এ ঘটনার মাত্র কয়েক বছর পর মুহাম্মদ ﷺ নবুওয়াত লাভ করেন। যায়িদ হলেন পুরুষ দাসদের মধ্যে প্রথম মুসলমান। পরবর্তীকালে তিনি হলেন রাসূলে করীম ﷺ-এর বিশ্বাসভাজন আমীন, তাঁর সেনাবাহিনীর কমাণ্ডার এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে মদীনার অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক।

যায়েদ যেমন পিতা-মাতাকে ছেড়ে করীম ﷺ-কে নির্বাচন করে নেন, তেমনি রাসূলে করীম ﷺ ও তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসলেন এবং তাঁকে নিজ সন্তান ও পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। যায়েদ দূরে গেলে তিনি উৎকণ্ঠিত হতেন, ফিরে আসলে আনন্দিত হতেন এবং এত আনন্দের সাথে তাঁকে বরণ করতেন যে অন্য কারো সাক্ষাতের সময় তেমন দেখা যেত না। কোন এক অভিযান শেষে যায়েদ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার একটি বর্ণনা প্রদান করেছেন আয়েশা (রা)। তিনি বলেন–

'যায়েদ ইবনে হারিসা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করল। নবী করীম ﷺ তখন আমার ঘরে। সে দরজার কড়া নাড়াল। নবী করীম ﷺ প্রায় খালি গায়ে উঠে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর শরীরে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটি পোশাক ব্যতীত কিছু ছিল না। এ অবস্থায় কাপড় টানতে টানতে দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন। তাঁর সাথে মোলাকাত করলেন ও চুমু খেলেন। আল্লাহর কসম, এর পূর্বে বা পরে আর কখনও রাসূলে করীম ﷺ-কে এমন খালি গায়ে আমি দেখিনি।'

হিব্বু রাসূলিল্লাহ উপাধি : যায়েদের প্রতি নবী করীম ﷺ-এর গভীর ভালোবাসার কথা মুসলিম জনতার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণে লোকে তাকে 'যায়েদ আল হুব্ব' বলে সম্বোধন করত এবং তাঁর উপাধি হয় 'হিব্বু রাসূলিল্লাহ' বা রাসূলুল্লাহর প্রীতিভাজন।

হামযা (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলে করীম ﷺ তাঁর সাথে যায়েদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। এমন কি হামযা কখনও ভ্রমণে বের হলে তাঁর দ্বীনি ভাই যায়েদকে অসী বানিয়ে যেতেন।

বিবাহ : 'উম্মু আয়মন' নামে নবী করীম ﷺ-এর এক দাসী ছিলেন। একদিন তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন : কেউ যদি কোন জান্নাতী মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করে, সে উম্মু আয়মনকে বিবাহ করুক। যায়েদ আল্লাহর নবীকে ﷺ খুশী করার জন্য তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁরই গর্ভে প্রখ্যাত সেনা নায়ক উসামা ইবনে যায়েদ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর তিনি কুলসুম ইবনে হিদমের মেহমান হন। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা)-এর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। এত দিন তিনি নবী পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে একসাথে থাকতেন। এখানে আসার পর তাঁকে আলাদা বাড়ি করে দেয়া হয় এবং রাসূলে করীম ﷺ-এর আপন ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জাহাশের সাথে তার পরিণয় সূত্র ঘটে। কিন্তু যয়নবের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তিনি তালাক দেন। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে নবী করীম ﷺ যয়নবকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ : যায়েদ ছিলেন তৎকালীন আরবের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। বদর থেকে মূতা পর্যন্ত প্রতিটি অভিযানেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। একমাত্র 'মাররে ইয়াসী' অভিযানে যোগদান করতে পারেননি। এ যুদ্ধের সময় রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হিজরী অষ্টম সনে একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেল। এ বছর রাসূলে করীম ﷺ ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি পত্রসহ হারিস ইবনে উমাইর আল-আযদীকে বসরার শাসকের কাছে প্রেরণ করেন। হারিস জর্দানের পূর্ব সীমান্তে 'মূতা' নামক স্থানে পৌঁছলে গাসসানী সম্রাটের একজন শাসক শুরাহবীল ইবনে 'আমর পথে গতিরোধ করে তাঁকে বন্দি করে। তারপর তাঁকে হত্যা করে। রাসূলে করীম ﷺ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। কারণ, এর পূর্বে আর কোন দূত এভাবে নিহত হয়নি।

রাসূলে করীম ﷺ মূতায় অভিযান পরিচালনার জন্য তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন যায়েদ ইবনে হারিসার

হাতে। অভিযানের পূর্ব মুহূর্তে নবী করীম ﷺ উপদেশ দিলেন : 'যদি যায়েদ শহীদ হয়, দলটির পরবর্তী আমীর হবে জা'ফর ইবনে আবু তালিব। জা'ফর শহীদ হলে আমীর হবে আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা। যদি সেও শহীদ হয় তাহলে তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে নেবে।'

মূতার অভিযানে নেতৃত্ব : যায়েদের নেতৃত্বে বাহিনীটি মদীনা থেকে রওয়ানা দিয়ে জর্দানের পূর্ব সীমান্তে 'মায়ান' নামক স্থানে পৌঁছল। রোম সম্রাট হিরাকল গাসসানীদের পক্ষে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এক লাখ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলো। তার সাথে যোগ দিল পৌত্তলিক আরবদের আরও এক লাখ সৈন্য। এ সম্মিলিত বাহিনী মুসলিম বাহিনীর অনতিদূরে অবস্থান গ্রহণ করল। 'মায়ানে' মুসলিম বাহিনী দু' রাত অবস্থান করে করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা করলেন। কেউ বললেন, পত্র মারফত শত্রু বাহিনীর সংখ্যা নবী করীম ﷺ-কে জানিয়ে পরবর্তী নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকা অপরিহার্য। কেউ বললেন, আমরা সংখ্যা, শক্তি বা আধিক্যের দ্বারা যুদ্ধ করি না। আমরা যুদ্ধ করি এ দ্বীনের দ্বারা। যে উদ্দেশ্যে তোমরা বের হয়েছ, সেজন্য সম্মুখে অগ্রসর হও। হয় বিজয় লাভ না হয় শাহাদাতবরণ এর যে কোন একটি সাফল্য তোমরা অর্জন করবে।

অতঃপর এ দুই অসম বাহিনী মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। দু'লাখ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাজার সৈন্যের বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে রোমান বাহিনী আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। তাদের অন্তরে ভীতিরও সঞ্চার হলো।

শাহাদাত বরণ : যায়েদ ইবনে হারিসা রাসূলে করীম ﷺ-এর পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য যে বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তীর ও বর্শার অসংখ্য আঘাতে তাঁর শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। অবশেষে, তিনি রণক্ষেত্রে চিরতরে ঢলে পড়েন। তারপর একে একে জাফর ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা পতাকা তুলে নেন এবং বীরত্বের সাথে তারাও শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনীর সম্মিলিত সিদ্ধান্তে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কমাণ্ডার নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন নও মুসলিম। তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী অনিবার্য পরাজয় ও ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। এভাবে নবম হিজরীতে ৫৪ অথবা ৫৫ বছর বয়সে যায়েদ শাহাদাত বরণ করেন।

মূতার দুঃখজনক সংবাদ রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এতই বিমর্ষ ও শোকাতুর হয়ে পড়েন যে, আর কখনও তেমন শোকাভিভূত হতে দেখা

যায়নি। তিনি শহীদ কমাণ্ডারদের ঘরে গিয়ে তাদের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান। যায়েদের ঘরে পৌঁছলে তাঁর ছোট্ট কন্যাটি কাঁদতে কাঁদতে নবী করীম ﷺ-কে জড়িয়ে ধরে এবং রাসূলও ﷺ ঢুকড়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে সা'দ ইবনে উবাদা বলে ওঠেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! একি?

তিনি বলেন : 'এ হচ্ছে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।'

পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ : রাসূলে করীম ﷺ বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যায়েদের অল্প বয়স্ক পুত্র উসামাকে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এক বাহিনী সহকারে প্রেরণ করেন। এত অল্প বয়স্ক ব্যক্তির নেতৃত্ব অনেকের পছন্দ হলো না। রাসূলে করীম ﷺ একথা জানতে পেরে বললেন : 'তোমরা পূর্বে তার পিতার নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলে। এখন তার পুত্রের নেতৃত্বে সন্তুষ্ট হতে পারছ না। আল্লাহর কসম! যায়েদ নেতা হওয়ার যোগ্য ছিল এবং সে ছিল আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তারপর আমার সবচেয়ে প্রিয় তাঁর পুত্র উসামা।' উসামা ছিলেন পিতার উপযুক্ত একমাত্র সন্তান। পিতৃ হত্যার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়ে তিনি মদীনায় প্রর্তাবর্তন করেন।

রাসূলের প্রতি ভালোবাসার আনুগত্য : রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা, আনুগত্য ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভই ছিল যায়েদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। উম্মু আয়মন (রা) ছিলেন বেশি বয়সের প্রায় বৃদ্ধা, বাহ্যিক রূপহীনা এক নারী। শুধু নবী করীম ﷺ-কে খুশী করার উদ্দেশ্যেই যায়েদ (রা) তাঁকে বিবাহ করেন। যয়নাবের (রা) সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে তিনি নিজেই আবার যয়নাবের (রা) কাছে নবী করীম ﷺ-এর বিবাহের পয়গাম পেশ করেন। কেবলমাত্র এজন্য যে, নবী করীম ﷺ তাঁকে বিবাহ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এ কারণে যয়নাব (রা)-এর প্রতি সম্মানের খাতিরে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাননি। অন্যদিকে চেহারা ঘুরিয়ে শুধু প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন। (মুসলিম)

যায়েদ ও তাঁর সন্তানদের প্রতি রাসূলে করীম ﷺ-এর সীমাহীন ভালোবাসা লক্ষ্য করে আয়েশা (রা) বলতেন : 'যদি যায়েদ বেঁচে থাকতেন, রাসূলে করীম ﷺ মৃত্যুর পর হয়তো তাকেই স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন।'

১৯. সালমান আল-ফারেসী (রা)

ক্ষণিকের মুসাফির হিসেবে তিনি জীবন যাপন করেছেন। জীবনে কোন বাড়ি নির্মাণ করেননি। কোথাও কোন প্রাচীর বা গাছের ছায়া পেলে সেখানেই শুয়ে পড়তেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে অনুমতি চাইল, তাঁকে একটি ঘর নির্মাণ করে দেয়ার। তিনি নিষেধ করলেন। বার বার পীড়াপীড়িতে শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন ঘর তৈরি করব? লোকটি বলল : এত ছোট যে, দাঁড়ালে মাথায় চাল বেঁধে যাবে এবং শয়ন করলে দেয়ালে পা ঠেকে যাবে। এ কথায় তিনি রাজী হলেন। তাঁর জন্য একটি ঝুপড়ি ঘর নির্মাণ করা হয়।

আম্মার ইবনে ইয়াসার এবং সালমান ফারেসী (রা) জান্নাতী।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ اِلٰى ثَلاَثَةٍ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ (رضـ)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাত তিন ব্যক্তির প্রতি আসক্ত আলী, আম্মার ও সালমান (রা)।

(হাকেম, সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ১৫৯৪)

রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, 'সালমান নবী পরিবারেরই একজন।'

এটি একজন সত্য-সন্ধানী ও আল্লাহকে পাওয়ার অভিলাষী এক ব্যক্তির জীবন আলেখ্য। তিনি সালমান আল-ফারেসী। সালমান আল-ফারেসীর মুখেই তাঁর সে সত্য প্রাপ্তির চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন—

আমি তখন পারস্যের ইসফাহান অঞ্চলের একজন পারসী নওজোয়ান। আমার গ্রামটির নাম 'জায়্যান'। পিতা ছিলেন গ্রামের দাহকান-দলপতি। সর্বাধিক ধনবান ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। জন্মের পর থেকেই আমি ছিলাম তাঁর কাছে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। আমার বয়স বৃদ্ধির পাশাপাশি আমার প্রতি

তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে কোন অকল্যাণের আশংকায় তিনি আমাকে মেয়েদের মতো ঘরে আবদ্ধ করে রাখেন।

আমার বাবা-মার মাজুসী ধর্মে আমি কঠোর সাধনা শুরু করলাম এবং আমাদের উপাস্য আগুনের তত্ত্বাবধায়কের পদটি খুব দ্রুত অর্জন করলাম। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা উপাসনার সে আগুন জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্বটি আমার ওপর ন্যস্ত ছিল।

আমার বাবা ছিলেন বিরাট ভূ-সম্পত্তির অধিকারী। তিনি নিজেই তা পরিচর্যা করতেন। তাতে আমাদের প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতো। একদিন কোন কারণবশত তিনি বের হয়ে আটকে পড়লেন, গ্রামের খামারটি পরিচর্যার জন্য যেতে পারলেন না। আমাকে যেতে তিনি বললেন :

'বৎস্য, তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ, বিশেষ কারণে আজ আমি খামারে যেতে পারছি না। আজ বরং তুমি একটু সেখানে যাও এবং আমার পক্ষ থেকে কাজকর্ম দেখাশুনা কর।'

আমি খামারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথে খ্রিস্টানদের একটি গীর্জার পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় তাদের কিছু কথার শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। তারা তখন প্রার্থনা করছিল। এ শব্দই আমাকে সচেতন করে তোলে।

দীর্ঘ সময় ঘরে আবদ্ধ থাকার কারণে খ্রিস্টান কিংবা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। তাদের কথার শব্দ শুনে তারা কি করছে তা দেখার জন্য আমি গীর্জার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লাম। গভীরভাবে তাদেরকে আমি নিরীক্ষণ করলাম। তাদের প্রার্থনা পদ্ধতি আমার খুবই ভালো লাগল এবং আমি তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। মনে মনে বললাম : আমরা যে ধর্মের অনুসারী তা থেকে এ ধর্ম অধিক উত্তম। আমি খামারে না গিয়ে সে দিনটি তাদের সাথেই অতিবাহিত করলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম :

– এ ধর্মের মূল উৎস কোথায়?

– শামে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। সারাদিন আমি কি কি করেছি, বাবা তা আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

বললাম : 'বাবা কতিপয় লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখতে পেলাম তারা তাদের উপাসনালয়ে প্রার্থনা করছে। তাদের ধর্মের যেসব

কার্যকলাপ আমি দেখেছি তা আমার খুবই ভালো লেগেছে। সূর্যস্ত পর্যন্ত আমি তাদের সাথেই কাটিয়ে দিয়েছি।' আমার কথা শুনে বাবা শংকিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন :

বৎস্য, সে ধর্মে কোন কল্যাণ নেই, তোমার ও তোমার পিতৃপুরুষের ধর্ম তা থেকেও উত্তম।' বললাম, 'আল্লাহর কসম, কখনো তা নয়। তাদের ধর্ম আমাদের ধর্ম থেকেও অতি উত্তম।'

আমার কথা শুনে বাবা ভীত-শন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়লেন এবং আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করলেন। তাই আমার পায়ে বেড়ী লাগিয়ে ঘরে বন্দি করে রাখলেন।

আমি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই সে সুযোগ এসে গেল। গোপনে খ্রিস্টানদের কাছে এ বলে সংবাদ প্রেরণ করলাম যে, শাম অভিমুখী কোন কাফিলা তাদের নিকট এলে তারা যেন আমাকে সংবাদ দেয়।

কিছু দিনের মধ্যেই শাম অভিমুখী একটি কাফিলা তাদের নিকট আগমন করল। তারা আমাকে সংবাদ দিল। আমি আমার বন্দীদশা থেকে পালিয়ে গোপনে তাদের সাথে বের হয়ে পড়লাম। তারা আমাকে শামে পৌঁছে দিল। শামে পৌঁছে আমি জিজ্ঞেস করলাম :

– এ ধর্মের সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ব্যক্তি কে?

তারা বলল : বিশপ, গীর্জার পুরোহিত।

আমি তাঁর নিকট এগিয়ে গেলাম। বললাম : আমি খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমার ইচ্ছা, আপনার সাহচর্যে থেকে আপনার খিদমত করা, আপনার কাছ থেকে শিক্ষালাভ ও আপনার সাথে প্রার্থনা করা। তিনি বললেন : ভেতরে প্রবেশ কর।

আমি ভেতরে প্রবেশ করে তার নিকট গেলাম এবং তার খিদমত শুরু করে দিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমি বুঝতে পারলাম লোকটি অসৎ। কারণ সে সঙ্গী সাথীদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দেয়, নেকী অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে; কিন্তু যখন তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য তার হাতে কিছু তুলে দেয়, তখন সে নিজেই তা আত্মসাত করে এবং নিজের জন্য পুঞ্জিভূত করে

রাখে। গরীব-মিসকীনদের সে থেকে বঞ্চিত করে। এভাবে সে সাত কলস স্বর্ণ জমা করে।

তার এ চারিত্রিক অধপতন দেখে আমি তাকে ভীষণ ঘৃণা পোষণ করতাম। কিছু দিনের মধ্যেই লোকটি মৃত্যুবরণ করল। এলাকার খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাকে দাফনের জন্য একত্রিত হলো। তাদেরকে আমি বললাম : তোমাদের এ বন্ধুটি খুবই অসৎ প্রকৃতির লোক ছিল। তোমাদের সে দান খয়রাতের নির্দেশ করত এবং তোমাদেরকে উৎসাহ দিত। কিন্তু তোমরা যখন তা তার হাতে তুলে দিতে সে সবই আত্মসাত করত। গরীব-মিসকীনদের কিছুই দিত না তাদেরকে বঞ্চিত করত।

তারা জিজ্ঞেস করল : তুমি তা কেমন করে জানলে?

বললাম : তোমাদেরকে আমি তার জমাকৃত সম্পদের গোপন ভাণ্ডার দেখাচ্ছি।

তারা বলল : ঠিক আছে, তাই দেখাও।

আমি তাদেরকে গোপন ভাণ্ডারটি দেখিয়ে দিলে তারা সেখান থেকে সাত কলস সোনা-চান্দি উদ্ধার করে। এ দেখে তারা বলল :

– আল্লাহর কসম আমরা তাকে দাফন করব না।

তাকে তারা শূলিতে ঝুলিয়ে পাথর মেরে তার দেহ জর্জরিত করে দিল। কিছুদিন অতিবাহিত না হতেই তারা অন্য এক ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত করল। আমি তাঁরও সাহচর্য গ্রহণ করলাম। এ লোকটি অপেক্ষা দুনিয়ার প্রতি অধিক উদাসীন, পরকালের প্রতি অত্যাধিক অনুরাগী ও রাতদিন ইবাদতের প্রতি অধিক নিষ্ঠাবান কোন লোক আমি ইতোপূর্বে আর দেখিনি। আমি তাঁকে খুব ভালোবাসতাম। একটা দীর্ঘ সময় তাঁর সাথে আমি অতিবাহিত করলাম। যখন তাঁর জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, আমি তাঁকে বললাম :

– জনাব, আপনার মৃত্যুর পর কার সাহচর্যে কাটাবার উপদেশ দিচ্ছেন আমাকে?

বললেন : বৎসা! আমি যে সত্যকে আঁকড়ে রেখেছিলাম, এখানে সে সত্যের ধারক আর কাউকে আমি জানি না। তবে মাওসেলে এক লোক আছেন, নাম তাঁর অমুক, তিনি এ সত্যের এক বিন্দুও পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেননি। তুমি তাঁর সাহচর্য লাভ করো।

আমার সে বন্ধুটির ইন্তিকালের পর মাওসেলে গমন করে তাঁর বর্ণিত লোকটিকে আমি খুঁজে বের করি। আমি তাঁকে আমার কথাগুলো খুলে বলি। একথাও তাঁকে

আমি বলি যে, অমুক ব্যক্তি তাঁর ইন্তিকালের সময়ে আমাকে আপনার সাহচর্য থাকার উপদেশ দিয়ে গেছেন। আর তিনি আমাকে একথাও বলে গেছেন যে, তিনি যে সত্যের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন, আপনি সে সত্যকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। আমার কথা শুনে করে তিনি বললেন : তুমি আমার নিকট থাক। আমি তাঁর নিকট রয়ে গেলাম। তাঁর আচার-আচরণ আমার ভালোই লাগল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ইন্তিকাল করলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় অতি সন্নিকটে হলে আমি তাঁকে বললাম :

–জনাব, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আল্লাহ্র ফায়সালা আপনার কাছে এসে গেছে। আর আমার বিষয়টি তো আপনি অবগত রয়েছেন। এখন আমাকে কার নিকট গমনের উপদেশ দিচ্ছেন?

বললেন : বৎস্য! আমরা যে জিনিসের ওপর ছিলাম, তার ওপর অটল আছে এমন কাউকে তো আমি জানি না। তবে 'নাসসিবীনে' অমুক নামে এক ব্যক্তি রয়েছেন, তুমি তাঁর সাথে মিলতে পার।

তাঁকে দাফন-কাফনের পর আমি নাসসিবীনের সেই লোকটির সাথে দেখা করলাম এবং আমার সমস্ত কাহিনী তাঁকে খুলে বললাম। তিনি আমাকে তাঁর নিকট অবস্থান করতে বললেন। আমি অবস্থান করলাম। এ ব্যক্তিকেও পূর্ববর্তী দু'বন্ধুর মতো নিষ্কলুষ চরিত্রের দেখতে পেলাম। আল্লাহ্র কি অপরূপ মহিমা, অল্পদিনের মধ্যে তিনি ইন্তিকাল করলেন। শেষ মুহূর্তে তাঁকে আমি বললাম : আমার সম্পর্কে আপনি মোটামুটি সব কথা জানেন। এখন আমাকে কার কাছে যেতে বলেন?

তিনি বললেন : অমুক নামে 'আম্মুরিয়াতে' এক ব্যক্তি রয়েছে, তুমি তাঁরই সংস্পর্শ পাবে। এছাড়া আমাদের এ সত্যের ওপর বাকি আর কাউকে তো আমি জানি না। তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আমি আমার সব কথা বললাম।

আমার কথা শুনে তিনি বললেন : আমার কাছে অবস্থান কর। আল্লাহ্র কসম, তাঁর কাছে থেকে আমি দেখতে পেলাম তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সংগীদের মতো একই মত ও পথের অনুসারী। তাঁর কাছে অবস্থানকালেই আমি অনেকগুলো ছাগলের অধিকারী হয়েছিলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর পূর্ববর্তী সাথীদের যে পরিণতি দেখেছিলাম, সে একই পরিণতি তাঁরও ভাগ্যে আমি দেখতে পেলাম। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে আমি তাঁকে বললাম : আমার অবস্থা তো আপনি ভালোই অবগত রয়েছেন। এখন আমাকে কি করতে বলেন, কার নিকট যেতে পরামর্শ দান করেন?

বললেন : বৎস! আমরা যে সত্যকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলাম, সে সত্যের ওপর ভূ-পৃষ্ঠে অন্য কোন ব্যক্তি বাকি আছে বলে আমার জানা নেই। তবে, অদূর ভবিষ্যতে আরব দেশে একজন নবী আগমন করবেন। তিনি ইবরাহীমের দ্বীন নতুনভাবে নিয়ে আগমন করবেন। তিনি তাঁর জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে বড় বড় কালো পাথরের যমীনের মাঝখানে খেজুর বাগান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট কিছু নিদর্শনও তাঁর থাকবে। তিনি দানের জিনিস তো ভক্ষণ করবেন; কিন্তু সাদকার জিনিস ভক্ষণ করবেন না। তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে নবুওয়াতের সীল থাকবে। সম্ভব হলে সে দেশে তুমি গমন কর।

এরপর তিনি ইন্তিকাল করলেন। আমি আরো বেশ কিছুদিন আম্মুরিয়াতে অবস্থান করলাম। একদিন সেখানে 'কালব' সম্প্রদায়ের কতিপয় আরব ব্যবসায়ী আগমন করল। আমি তাদেরকে বললাম : আপনারা যদি আমাকে সাথে করে আরব দেশে নিয়ে যান তবে বিনিময়ে আমি আপনাদেরকে আমার এ গরু ও ছাগলগুলো দিয়ে দেব। তাঁরা বললেন : ঠিক আছে, আমরা তোমাকে আমাদের সাথে করে নিয়ে যাব।

আমি তাদেরকে আমার গরু-ছাগলগুলো দিয়ে দিলাম। তাঁরা আমাকে সাথে নিয়ে চললেন। যখন আমরা মদীনা ও শামে'র মধ্যবর্তী 'ওয়াদী আল-কুরা' নামক স্থানে পৌছলাম, তখন তাঁরা আমার সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে এক ইহুদীর কাছে আমাকে বিক্রি করে দিল। আমি তার দাসত্ব শুরু করে দিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই বনী কুরাইজা সম্প্রদায়ের তার এক চাচাতো ভাই আমাকে ক্রয় করে এবং আমাকে 'ইয়াসরিবে' (মদীনা) নিয়ে আসে। এখানে আমি আম্মুরিয়ার বন্ধুটির বর্ণিত সে খেজুর গাছ দেখতে পেলাম এবং তিনি স্থানটির যে বিশদ বর্ণনা করেছিলেন, সে অনুযায়ী শহরটিকে চিনতে অসুবিধা হয়নি। এখানে আমি আমার মনিবের সাথে অবস্থান করতে লাগলাম।

রাসূলে করীম ﷺ তখন মক্কায় দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু দাস হিসেবে সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁর সম্পর্কে কোন কথা বা আলোচনা আমার কানে

এসে পৌঁছেনি। কিছুদিনের মধ্যে রাসূলে করীম ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে ইয়াসরিবে এলেন। আমি তখন একটি খেজুর গাছের মাথায় উঠে কি যেন কাজ করছিলাম, আমার মনিব গাছের নিচেই বসেছিল। এমন সময় তার এক ভাতিজা এসে তাকে বলল :

আল্লাহ্ বনী কায়লাকে (আউস ও খাযরাজ গোত্র) ধ্বংস করুন। কসম আল্লাহ্র, তারা এখন কুবাতে মক্কা থেকে আজই আগত এক ব্যক্তির কাছে মিলিত হয়েছে, যে কিনা নিজেকে নবী বলে দাবি করে।

তার কথাগুলো আমার কানে যেতেই আমার দেহে যেন জ্বর আসল। আমি ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করলাম। আমার ভয় হলো, গাছের নিচে বসা আমার মনিবের ঘাড়ের ওপর ধপাস করে পড়ে না যাই। দ্রুত আমি গাছ থেকে নেমে পড়লাম এবং সে লোকটিকে বললাম :

– তুমি কি বললে? কথাগুলো আমার কাছে আবার বলো তো।

আমার কথা শুনে আমার মনিব রাগে ফেটে পড়ল এবং আমার গালে কষে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলল :

–এর সাথে তোমার সম্পর্ক কি? যাও, তুমি যা করছিলে তাই কর গিয়ে।

সেদিন সন্ধ্যায় আমার সংগৃহীত খেজুর থেকে কিছু খেজুর নিয়ে রাসূলে করীম ﷺ যেখানে অবস্থান করছিলেন সেদিকে অগ্রসর হলাম। রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে বললাম :

– আমি শুনতে পেরেছি আপনি একজন নেককার ব্যক্তি। আপনার কিছু সহায়-সম্বলহীন সঙ্গী সাথী রয়েছেন। এ সামান্য কিছু জিনিস সদকার উদ্দেশ্যে আমার কাছে জমা ছিল, আমি দেখলাম অন্যদের তুলনায় আপনারাই এগুলো পাওয়ার বেশি হকদার। এ কথা বলে খেজুরগুলো তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি সঙ্গীদের বললেন : তোমরা খাও। কিন্তু তিনি নিজের হাতটি গুটিয়ে নিলেন, কিছুই খেলেন না। মনে মনে আমি বলালাম : এ হলো একটি।

সেদিন আমি ফিরে এলাম। আমি আবারও কিছু খেজুর জমা করতে লাগলাম। রাসূলে করীম ﷺ কুবা থেকে মদীনায় আগমন করলেন। আমি একদিন খেজুরগুলো নিয়ে তাঁর কাছে গমন করলাম : 'আমি দেখেছি, আপনি সদকার জিনিস ভক্ষণ করেন না। তাই এবার কিছু আপনার জন্য হাদিয়া নিয়ে এসেছি,

আপনাকে দেয়ার উদ্দেশ্যে।' এবার তিনি নিজে খেলেন এবং সঙ্গীদের ডাকলেন তাঁরাও তাঁর সাথে খেলেন। আমি মনে মনে বললাম : এ হলো দ্বিতীয়টি।

তারপর অন্য একদিন আমি রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন 'বাকী আল-গারকাদ' গোরস্থানে তাঁর এক সঙ্গীকে দাফন করছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি গায়ে 'শামলা' (এক জাতীয় ঢিলা পোশাক) জড়িয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর আমি তাঁর পেছনের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। আমি খুঁজতে লাগলাম, আমার সে আম্মুরিয়ার বন্ধুটির বর্ণিত নবুওয়াতের মোহরটি।

রাসূলে করীম ﷺ আমাকে তাঁর পিঠের দিকে বারবার তাকাতে দেখে আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর পিঠের চাদরটি সরিয়ে নিলেন এবং আমি মোহরটি সুস্পষ্ট দেখতে পেলাম। আমি তখন তাঁকে চিনতে পারলাম এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাঁকে চুমুতে চুমুতে ভরে দিলাম ও কান্নাকাটি করে চোখের পানিতে বুক ভাসালাম। আমার এ অবস্থা অবলোকন করে রাসূলে করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন :

– তোমার সংবাদ কি?

আমি সব ঘটনা তাকে খুলে বললাম। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং আমার মুখ দিয়েই এ ঘটনাটি তাঁর সঙ্গীদের শুনাতে চাইলেন। আমি তাঁদেরকেও শুনালাম। তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন ও খুবই আনন্দিতও হলেন।

দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার কারণে সালমান (রা) রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে পারেননি। ফলে তিনি খুবই মর্মযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন। সালমান বলেন : 'একদিন রাসূলে করীম ﷺ আমাকে ডেকে বললেন : তুমি তোমার মনিবের সাথে মুকাতাবা (চুক্তি) কর। আমি চুক্তি করলাম, তাকে আমি তিন শ' খেজুরের চারা রোপন করে দেব এবং পাশাপাশি চল্লিশ 'উকিয়া স্বর্ণও দেব। আর বিনিময়ে আমি মুক্তি লাভ করব। আমি নবী করীম ﷺ-কে এ চুক্তির কথা জ্ঞাত করলাম।

তিনি সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন : তোমরা তোমাদের এ ভাইকে সাহায্য কর। তারা প্রত্যেকেই আমাকে পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশটি করে যে যা পারলেন চারা দিলেন। এভাবে আমার তিনশ' চারা সংগ্রহ হয়ে গেল। তারপর আমি রাসূলে

করীম ﷺ-এর নির্দেশে গর্ত খুঁড়লাম। তিনি নিজেই একদিন আমার সাথে সেখানে গেলেন। আমি তাঁর হাতে একটি করে চারা তুলে দিলাম, আর তিনি সেটা রোপন করলেন। আল্লাহর শপথ, তাঁর হাতে রোপনকৃত একটি চারাও মরে যায়নি। (ঐতিহাসিকরা বলছেন, সালমান (রা) একটি মাত্র চারা রোপন করেছিলেন, আর সেটাই মারা যায়। বাকি সবগুলোই রাসূলে করীম ﷺ রোপন করেছিলেন এবং সবগুলোই বেঁচে যায়।) এভাবে আমি আমার চুক্তির একাংশ পূরণ করলাম, বাকি রইল অর্থ।

একদিন রাসূলে করীম ﷺ আমাকে ডেকে মুরগির ডিমের মতো দেখতে স্বর্ণজাতীয় কিছু পদার্থ আমার হাতে দিয়ে বললেন, যাও, তোমার চুক্তি অনুযায়ী পরিশোধ কর। আমি বললাম, এতে কি তা পরিশোধ হবে? তিনি বললেন : 'মনে কর, আল্লাহ এতেই পরিশোধ করবেন।' আল্লাহর কসম, আমরা ওজন করে দেখলাম তাতে চল্লিশ উকিয়াই রয়েছে।

এভাবে সালমান (রা) তার চুক্তি পূর্ণ করে মুক্তিলাভ করেন। দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সালমান (রা) মুসলমানদের সাথে অবস্থান করতে থাকেন। তখন তাঁর কোন বাসস্থান ছিল না। রাসূলে করীম ﷺ অন্যান্য মুহাজিরদের মতো প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী আবু দারদার (রা) সাথে তাঁর মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। দাসত্বের কারণে সালমান (রা) বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের পর খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের পর খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে পূর্ববর্তী দু'টি যুদ্ধে অনুপস্থিতির ক্ষতি পুষিয়ে নেন। গোটা আরবের বিভিন্ন গোত্রে কুরাইশদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। খবর পেয়ে রাসূলে করীম ﷺ সাহাবীদের সাথে শালা-পরামর্শ করেন। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দান করেন। সালমান বলেন, পারস্যে পরিখা খনন করে নগরের রক্ষা করা হয়। মদীনার অরক্ষিত দিকে পরিখা খনন করে নগরীর রক্ষা করা সমীচীন। এ পরামর্শ নবী করীম ﷺ-এর মনঃপূত হয়। মদীনার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সুদীর্ঘ পরিখা খনন করে বিশাল কুরাইশ বাহিনীর আক্রমণ খুব সহজে প্রতিরোধ করা হয়। নবী করীম ﷺ নিজেও এ পরিখা বা খন্দক খননের কাজে অংশগ্রহণ করেন।

কুরাইশ বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে এ অপূর্ব রণ-কৌশল দেখে অবাক হয়ে যায়। তারা ২১/২২ দিন মদীনা অবরোধ করে বসে থাকার পর শেষে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। খন্দকের পর যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে সালমান অংশগ্রহণ করেছেন। নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকালের পর সালমান বেশ কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করেন। সম্ভবত: আবু বকর (রা)-এর খিলাফতের শেষ অথবা 'ওমরের খিলাফতের প্রথম দিকে তিনি ইরাকে এবং তাঁর দ্বীনী ভাই আবু দারদা (রা) সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। তিনি ওমরের যুগে ইরান বিজয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ করেন। জালুলুর বিজয়েও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ওমর (রা) তাঁকে মাদায়েনের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। উসমানের খিলাফতকালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর সালমানের জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় নবী করীম ﷺ-এর সংস্পর্শে। এ কারণে তিনি ইলম ও মা'রেফাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। আলী (রা)-কে তাঁর ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলেন : 'সালমান ইলম ও হিকমতের ক্ষেত্রে লুকমান হাকীমের সমতুল্য।' অন্য একটি বর্ণনা মতে তিনি বলেন : 'ইলমে আউয়াল ও ইলমে আখের সকল ইলমের আলিম ছিলেন তিনি।' ইলমে আখের অর্থ কুরআনের ইলম। আরবে তার কোন আত্মীয় ও খান্দান ছিল না, তাই রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে আহলে বাইতের সদস্য বলে ঘোষণা করেন। মু'আজ ইবনে জাবাল, যিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিম ও মুজতাহিদ সাহাবী, তিনি বলেন : চার ব্যক্তি থেকে ইলম অর্জন করবে। সে চারজনের মধ্যে সালমান অন্যতম।

তিনি ছিলেন যুহুদ ও তাকওয়ার বাস্তব নমুনা। ক্ষণিকের মুসাফির হিসেবে তিনি জীবন যাপন করেছেন। জীবনে কোন বাড়ি নির্মাণ করেননি। কোথাও কোন প্রাচীর বা গাছের ছায়া পেলে সেখানেই শুয়ে পড়তেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে অনুমতি চাইল, তাঁকে একটি ঘর নির্মাণ করে দেয়ার। তিনি নিষেধ করলেন। বার বার পীড়াপীড়িতে শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন ঘর তৈরি করবে? লোকটি বলল : এত ছোট যে, দাঁড়ালে মাথায় চাল বেঁধে যাবে এবং শয়ন করলে দেয়ালে পা ঠেকে যাবে। এ কথায় তিনি রাজী হলেন। তাঁর জন্য একটি ঝুপড়ি ঘর নির্মাণ করা হয়। হাসান (রা) বলেন : 'সালমান যখন পাঁচ হাজার দিরহাম

বেতন পেতেন, তিরিশ হাজার লোকের ওপর নেতৃত্ব দিতেন তখনও তাঁর একটি মাত্র 'আবা' ছিল। তার মধ্যে ভরে তিনি কাঠ সংগ্রহ করতেন। নিদ্রা যাওয়ার সময় আবাটির এক পাশ গায়ে দিতেন এবং অন্য পাশ বিছাতেন।'

সালমান (রা) যখন অন্তিম রোগ শয্যায়, সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস (রা) তাঁকে দেখতে যান সালমান (রা) কান্নাকাটি শুরু করলেন। সা'দ বললেন : আবু আবদুল্লাহ, কাদছেন কেন? রাসূলে করীমﷺতো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাউজে কাওসারের নিকট তাঁর সাথে আপনি একত্রিত হবেন। বললেন : আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না। কান্নার কারণ হচ্ছে, রাসূলে করীমﷺআমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম যেন একজন মুসাফিরের সাজ-সরঞ্জাম থেকে বেশি না হয়। অথচ আমার কাছে এতগুলো জিনিসপত্র জমা হয়ে গেছে। সা'দ বলেন : সে জিনিসগুলো একটি বড় পিয়ালা, তামার একটি থালা ও একটি পানির পাত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্টতা : অন্তত ৪১৫টি বিভিন্ন বর্ণনার সাথে সালমান আল ফারেসীর সম্পর্ক রয়েছে বলে দেখা যায়।

সালমান থেকে ষাটটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে তিনটি মুত্তাফাকুন আলাইহি, একটি মুসলিম ও তিনটি বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী, আবু তুফাইল, ইবনে আব্বাস, আউস ইবনে মালিক ও ইবনে আজযা (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাঁর শিষ্য ছিলেন।

সালমান সেসব বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা রাসূলে করীমﷺ-এর বিশেষ নৈকট্য অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলে করীমﷺ যেদিন রাতে সালমানের সাথে নিভৃতে আলোচনায় বসতেন, আমরা তাঁর স্ত্রীরা অনুমান করতাম সালমান হয়তো আজ আমাদের রাতের সান্নিধ্যটুকু কেড়ে নেবে।'

২০. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)

একবার আম্মার নবী করীম ﷺ-এর কাছে এ অসহনীয় যুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল। নবী করীম ﷺ-এর বললেন, صَبْرًا اٰلَ يَا سِرٍ اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ 'ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর তোমাদের জন্য জান্নাত।' তারপর দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! ইয়াসির খান্দানের লোকদের ক্ষমা করে দাও।'

আম্মার ইবনে ইয়াসার এবং সালমান ফারেসী (রা) জান্নাতী।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْجَنَّةَ لَتَشْتَاقُ اِلٰى ثَلاَثَةِ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ وَسَلْمَانَ (رضـ)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাত তিন ব্যক্তির প্রতি আসক্ত আলী, আম্মার, সালমান (রা)।

(হাকেম, সহীহ আল জামে আসসাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ১৫৯৪)

নাম ও বংশ পরিচিতি : তাঁর নাম 'আম্মার, উপনাম 'আবুল ইয়াকজান'। পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়্যা। পিতা কাহতান বংশের সন্তান। আদি বাসস্থান ইয়ামান। তাঁর এক ভাই হারিয়ে যায়। হারানো ভাইয়ের খোঁজে অন্য দু ভাই হারিস ও মালিককে সাথে করে তিনি মক্কায় গমন করেন। অন্য দু'ভাই ইয়ামান প্রত্যাবর্তন করলেও ইয়াসির একা মক্কায় রয়ে যান। মক্কার বনী মাখযুমের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আবু হুজাইফা মাখযুমীর 'সুমাইয়্যা' নামের এক দাসীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এ সুমাইয়্যার গর্ভেই আম্মার জন্মগ্রহণ করেন। আবু হুজাইফা শিশুকালেই আম্মারকে মুক্তি করে দেন এবং আমরণ পিতা-পুত্রের মতো দু'জনের সম্পর্ক বজায় রাখেন।

ইসলাম গ্রহণ : আম্মার ও সুহাইব ইবনে সিনান দু'জন একই সাথে ইসলাম কবুল করেন। আম্মার বলেন, 'আমি সুহাইবকে আরকাম ইবনে আবুল আরকামের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম : 'তোমার উদ্দেশ্য কি? সে বলল : প্রথমে তোমার উদ্দেশ্যটি কি তাই ব্যক্ত কর।' বললাম, মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কিছু কথা শুনতে চাই।' সে বলল, 'আমারও সে একই উদ্দেশ্য।' তারপর দু'জন এক সাথে ইসলাম কবুল করেন। আম্মারের সাথে অথবা কিছু পূর্বে বা পরে তার পিতা ইয়াসিরও ইসলাম কবুল করেন।

'আম্মার ইসলাম গ্রহণ করে দেখলেন, আবু বকর ছাড়া আরও পাঁচজন পুরুষ ও দু'জন নারী তার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তবে এর অর্থ হচ্ছে যে, তখন মাত্র এ ক'জনই তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। অন্যথায় সহীহ বর্ণনা মতে আম্মারের পূর্বে তিরিশেরও অধিক সাহাবী ইসলাম কবুল করেছিলেন। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই কাফিরদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন।

মুশরিকদের নির্যাতনের শিকার পুরো পরিবার : মক্কা আম্মারের জন্মভূমি নয়। আপন বলতে সেখান তাঁর কোন স্বজন ছিল না। ইহকালীন আভিজাত্য বা ক্ষমতার দাপটও তাঁর মধ্যে ছিল না। এছাড়া তখন পর্যন্ত তাঁর মা সুমাইয়্যা বনী মাখযুমের গোলামী থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেননি। এমনি এক অবস্থায় তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং ঈমানী শক্তিতে একদিনও বিষয়টি লুকায়ে রাখতে পারলেন না। সবার কাছে প্রকাশ করে দিলেন। মক্কার মুশরিকরা দুর্বল পেয়ে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ব্যক্তিবর্গের ওপর নানা প্রকার নির্যাতন শুরু করে দিল। গ্রীষ্মের দুপুরের প্রচণ্ড গরমের সময় উত্তপ্ত পাথরের ওপর তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হতো, জ্বলন্ত লোহা দিয়ে দেহ ঝলসে দেয়া হতো। কিন্তু আম্মারের ঈমানী শক্তির কাছে মুশরিকদের সকল অত্যাচার ও উৎপীড়ন পরাভূত হলো।

আম্মারের মা সুমাইয়্যাকে নরাধম আবু জাহল নিজের হাত দিয়ে নির্মমভাবে শহীদ করে। ইসলামের ইতিহাসে সুমাইয়্যা প্রথম শাহাদাতবরণকারী। আম্মারের পিতা ইয়াসির এবং ভাই আবদুল্লাহও মুশরিকদের নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে শহীদ হন। একদিন মুশরিকরা আম্মারকে আগুনের অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দিয়েছে। এমন সময় রাসূলে করীম ﷺ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি ব্যথিত চিত্তে আম্মারের মাথায় পবিত্র একটি হাত অর্পন করলেন এবং বললেন, 'হে

আগুন! ইব্রাহিমের মতো তুমি আম্মারের জন্য শীতল হয়ে যা।'

নবী করীম ﷺ যখনই আম্মার পরিবারের বাড়ির কাছ দিয়ে যেতেন এবং তাদেরকে নির্যাতিত অবস্থায় দেখতে পেতেন, সান্ত্বনা দিতেন। একদিন তিনি বলেন, 'আম্মার পরিবারের লোকেরা, তোমাদের জন্য সুখসংবাদ। জান্নাত তোমাদের জন্য প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে।' একবার আম্মার নবী করীম ﷺ-এর কাছে এ অসহনীয় যুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করল। নবী করীম ﷺ-এর বললেন, صَبْرًا اٰلَ يَا سِرٍ اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ 'ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর তোমাদের জন্য জান্নাত।' তারপর দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! ইয়াসির খান্দানের লোকদের ক্ষমা করে দাও।'

একদিন মুশরিকরা তাঁকে এত দীর্ঘক্ষণ পানিতে ডুবিয়ে রাখে যে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় শত্রুরা তাঁর মুখ দিয়ে তাদের ইচ্ছেমত স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে অনুশোচনায় জর্জরিত হতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে রাসূলে করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলেন। রাসূলে করীম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার অন্তর কি বলছে?' বললেন, 'আমার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ।' প্রিয় নবী ﷺ অন্যান্যদের সাথে তাঁর চোখের পানি মুছে দিয়ে বললেন, 'কোন ক্ষতি নেই। এমন অবস্থার সম্মুখীন হলে আবারও এমনটি করবে।' তারপর তিনি সূরা আন নাহলের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন–

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ.

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করে, তবে যাদেরকে বাধ্য করা হয় এবং তাদের অন্তর ঈমানের ওপর দৃঢ় (তাদের কোন দোষ নেই)।

(সূরা আন নাহল : আয়াত-১০৬)

একবার সাঈদ ইবনে যুবাইর (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন : কুরাইশরা কি মুসলমানদের ওপর এতই অত্যাচার নির্যাতন করত যে, তারা ধর্ম ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো? জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম, হ্যাঁ। কুরাইশরা তাদেরকে নির্যাতন করত, অনাহারে রাখত। এমন কি তারা এতই দুর্বল হয়ে পড়ত যে, উঠতে বসতে অক্ষম হয়ে যেত। এ অবস্থায়

তাদের অন্তরের বিরুদ্ধে কুরাইশরা বিভিন্ন বিষয়ে স্বীকৃতি আদায় করে নিত। এসব নির্যাতিত মুসলিমদের একজন আম্মার ইবনে ইয়াসির।"

হিজরত : আম্মার হাবশায় হিজরত করেছিলেন কিনা সে বিষয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হাবশাগামী দ্বিতীয় কাফিলার সহযাত্রী হয়েছিলেন। মদীনায় হিজরতের আদেশ হলে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং মুবাশশির ইবনুল মুনযিরের মেহমান হন। রাসূলে করীম ﷺ হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান আল আনসারীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তাঁকে একখণ্ড ভূমিও প্রদান করেন।

হিজরতের ছয়-সাত মাস পর মদীনার মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। রাসূলে করীম ﷺ নিজেও মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করেন। আম্মারও সক্রিয়ভাবে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মাথায় করে ইট বহন করেছিলেন আর মুখে এ চরণটি পাঠ করতে ছিলেন : نَحْنُ مُسْلِمُوْنَ نَبْتَنِى الْمَسَاجِدَ। আমরা মুসলিম, আমরা নির্মাণ করি মসজিদ।' আবু সাঈদ বলেন, আমরা একটি করে ইট উঠাচ্ছিলাম, আর আম্মার উঠাচ্ছিলেন দু'টি করে। একবার আম্মার যাচ্ছিলেন নবী করীম ﷺ-এর পাশ দিয়ে।

নবী করীম ﷺ অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাঁর মাথায় ধুলো-বালি ঝেড়ে দিয়ে বললেন, "আফসুস আম্মার! একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে শহীদ করবে। তুমি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করবে, আর তারা তোমাকে আহ্বান করবে জাহান্নামের দিকে।' একবার কেউ তাঁর মাথায় এত বোঝা চাপিয়ে দিল যে, লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'আম্মার মারা যাবে, আম্মার মারা যাবে রাসূলে করীম ﷺ এগিয়ে গিয়ে আম্মারের মাথা থেকে ইট তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলেন।

প্রতিটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ : বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, প্রতিটি যুদ্ধে আম্মার অংশ গ্রহণ করেন। আবু বকর (রা)-এর যুগে সংঘটিত বেশির ভাগ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেও তিনি সাহসী যোদ্ধার পরিচয় দেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধে আম্মারের একটি কান দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে লাফাতে থাকে। তা সত্ত্বেও তিনি বেপরোয়াভাবে আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে থাকেন। যে দিকে তিনি যাচ্ছিলেন, কাফিদের ব্যূহ চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। একবার মুসলিম বাহিনী প্রায় ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম হলো।

আম্মার এক বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে একটি পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন : 'ওহে মুসলিম মুজাহিদবৃন্দ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পলায়ন করছ আমি আম্মার ইবনে ইয়াসির। এসো, আমার দিকে এসো।' এ শব্দ মুসলিম বাহিনীর মধ্যে যাদুর মত কাজ করে। তারা আবার লড়াইয়ে ফিরে আসে। বিজয় ছিনিয়ে আনে।

কুফায় আমির নিয়োগ : হিজরী ২০ সনে দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রা) তাঁকে কুফার ওয়ালী বা শাসক নিযুক্ত করেন। এক বছর নয় মাস অতি দক্ষতার সাথে তিনি এ দায়িত্ব পরিচালনা করেন। এ সময় বসরাবাসীরা কিছু নতুন বিজিত এলাকা বসরার সাথে দেয়ার জন্য খলিফার কাছে দাবি করে। কুফার কিছু নেতৃবৃন্দ তাদের আমীর আম্মারকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন উক্ত এলাকাসমূহ কুফার সাথে দেয়ার বিষয়ে খলিফাকে রাজী করেন। কিন্তু আম্মার ঝগড়ায় জড়িয়ে পরতে রাজী হলেন না। কুফার নেতারা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। একজনতো তাকে 'কান কাটা' বলে গালিই দিয়ে বসেন। জবাবে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'আফসুস! তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ও উত্তম কানটিকে গালি দিলে, যে কানটি আল্লাহর পথে কাটা গেছে।'

এ বিষয়টি নিয়ে কুফার কিছু নেতৃবৃন্দ তাঁর বিরুদ্ধে শাসন কার্যে অদক্ষ বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন। খলিফা তাঁকে বরখাস্ত করেন। বরখাস্তের পরের দিন খলিফা আহ্বান করে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি আমার এ কাজে সন্তুষ্ট নয়?' তিনি জবাব দেন, 'আপনি যখন জিজ্ঞেস করেছেন, সত্য কথাটি বলা অপরিহার্য। পূর্বে যেমন আমার নিয়োগের সময় খুশী ছিলাম না, তেমনি এখন বরখাস্তের সময় নাখোশও নই।'

তৃতীয় খলিফা 'উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে চতুর্দিকে যখন বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেধে ওঠে, তখন হিজরী ৩৫ সনে তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য খলিফা একটি তদন্ত বাহিনী গঠন করেন। আম্মারও ছিলেন এ বাহিনীর একজন অন্যতম সদস্য। বিক্ষোভের মূল কেন্দ্র মিসরের তদন্তভার তাঁর ওপর অর্পিত হয়। তিনি মিসর গমন করেন।

বাহিনীর অন্য সদস্যরা খুব দ্রুত প্রত্যাবর্তন করে নিজ নিজ এলাকার রিপোর্ট উত্থাপন করেন। কিন্তু আম্মার ফিরতে আশাতিরিক্ত দেরি করলেন। এদিকে দারুল খিলাফত মদীনায় তাঁর ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের গুজব ও ধারণা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি যখন মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বিদ্রোহ ও

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা তাঁকে প্রভাবিত দেখা গেল। তিনি প্রকাশ্য মজলিসে উসমানের শাসনপদ্ধতি ও প্রাদেশিক শাসকদের নানাবিধ কর্মের কঠোর সমালোচনা শুরু করলেন।

ফলে খলিফার লোকদের সাথে বিবাদ শুরু হয়ে গেল। একবার উসমান (রা)-এর দাসেরা তাঁকে এমন মারাত্মক আঘাত করে। এতে তাঁর গোটা দেহ ফুলে গেল। তিনি পাঁজরের একটি হাড়ে ভীষণ চোট পেলেন। বনী মাখযুমের সাথে তাঁর জাহিলী যুগে চুক্তিবদ্ধ ছিল। তাঁরা খলিফার দরবারে পৌঁছে হুমকি দেয়, যদি আম্মার এ আঘাত থেকে প্রাণে না রক্ষা পান তাহলে আমরা অবশ্যই এর প্রতিশোধ নেব। (আল-ইসতিয়াব) এমনি ধরনের ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকে। যখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা মদীনায় চড়াও হয়, 'উসমান (রা) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে আম্মারের কাছে বলে পাঠান, তিনি যেন তার প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে তাদেরকে ফেরত দেন। কিন্তু আম্মার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। (তাবারী)

কুফায় গমন : 'উসমান (রা) শহীদ হলেন। খিলাফতের দায়িত্ব আলী (রা)-এর ওপর ন্যাস্ত হলো। আয়েশা, তালহা ও যুবাইর প্রমুখ উসমানের রক্তের প্রতিশোধ দাবি করে বসরার দিকে অগ্রসর হলেন। আলী কুফাবাসীদেরকে স্বপক্ষে আনার জন্য ইমাম হাসানের সাথে আম্মারকে কুফায় প্রেরণ করলেন। আম্মার যখন কুফা পৌঁছেন, আবু মূসা আশ'আরী (রা) তখন কুফার জামে মসজিদে এক জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁকে মিম্বর থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রথমে হাসান, পরে আম্মার ভাষণ দেন এবং আলী (রা)-এর প্রতি কুফাবাসীদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। পরদিন সকালে প্রায় সাড়ে নয় হাজার সৈনিকের একটি সশস্ত্র বাহিনী আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য আম্মারের পাশে মিলিত হয়।

উষ্ট্রের যুদ্ধ : হিজরী ৩৬ সনের জমাদিউল আখের মাসে বসরার অদূরে 'যিকার' নামক স্থানে আলী ও আয়েশার বাহিনী মুখোমুখি হলো। আম্মার কুফার বাহিনীসহ এ যুদ্ধে যোগ দিলেন। যুদ্ধের সূচনাকালেই যুবাইর যখন দেখলেন আম্মার আলীর পক্ষে, তখন তার স্মরণ হলো রাসূলে করীম ﷺ-এর বাণী, 'সত্য আম্মারের সাথে, বিদ্রোহী দল তাঁকে হত্যা করবে।' তিনি নিজের ভুল অনুধাবন করতে পারলেন। রণে ভঙ্গ দিয়ে কেটে পড়লেন। এ যুদ্ধে আম্মারের অটল বিশ্বাস ছিল তিনি সত্যের ওপর রয়েছেন। তাই অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন এবং বিজয় অর্জন করেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'উটের যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

সিফফীনের যুদ্ধ : উটের যুদ্ধের পর আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আম্মার এ যুদ্ধেও আলীর পক্ষে শরীক হন। তখন তাঁর বয়স একান্নব্বই, মতান্তরের তিরান্নব্বই বছর। এ বৃদ্ধ বয়সেও তিনি জিহাদের অনুপ্রেরণায় ঘরে বসে থাকতে পারেননি। তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সত্য আলী (রা)-এর পক্ষে। তাই এ বয়সেও তিনি সিংহের মতো বীর বিক্রমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি যেদিকেই আক্রমণ চালাচ্ছিলেন বিপক্ষ শিবির ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল। একবার বিপক্ষ শিবিরের পতাকাবাহী আমর ইবনুল 'আসের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। তিনি বললেন, 'আমি এ পতাকাবাহীর বিরুদ্ধে রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে তিনবার যুদ্ধ করেছি। তার সাথে এ আমার চতুর্থ যুদ্ধ। আল্লাহর কসম, সে যদি আমাকে পরাজিত করে 'হাজার' নামক স্থানেও ঠেলে নিয়ে যায়, তবুও আমি বিশ্বাস করব, আমরা সত্য এবং তারা মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত।' (তাবাকাত ১/১৮৫)

সিফফীনের যুদ্ধে আলী (রা)-এর পক্ষে যোগদানের জন্য তিনি মানুষকে আহ্বান করে বলতেন, "ওহে জনমণ্ডলী! আমাদের সাথে এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বের হও, যারা মনে করে তারা 'উসমানের রক্তের প্রতিশোধ নিচ্ছে। আল্লাহর কসম, রক্তের প্রতিশোধ তাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে তারা ইহকালের স্বাদ উপভোগ করেছে। সে স্বাদ আরো অর্জন করতে চায়।... ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাদের এমন কোন অবদান নেই যার ভিত্তিতে তারা মুসলিম উম্মার আনুগত্য দাবি করতে পারে। মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের কোন অধিকার তাদের নেই। তাদের অন্তরে এমন কিছু আল্লাহর ভয়-ভীতি নেই যাতে তারা সত্যের অনুসারী হতে পারে। তারা উসমানের রক্তের প্রতিশোধের কথা বলে মানুষকে প্রতারণা করছে। স্বৈরাচারী রাজা হওয়া ব্যতীত তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।
(রিজালুন হাওলার রাসূল/২১৬)

শাহাদতবরণ : সিফফীনের যুদ্ধ তখন এগিয়ে চলছে। একদিন সন্ধ্যায় আম্মার কয়েক চুমুক দুধ পান করে বললেন, 'রাসূলে করীম ﷺ আমাকে বলেছেন, দুধই হবে আমার শেষ খাদ্য। তারপর–'আজ আমি আমার বন্ধুদের সাথে একত্রিত হব, আজ আমি নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাথীদের সাথে একত্রিত হব'– এ কথা বলতে বলতে সৈনিকদের সারিতে যোগ দিলেন। অতঃপর প্রচণ্ডবেগে শত্রু শিবিরের ওপর হামলা চালালেন। উল্লেখ্য যে, বিরোধী শিবিরের জনগণ

আম্মারকে সব সময় এড়িয়ে চলত। কারণ, আম্মার সম্পর্কে নবী করীম ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর বিরাট ফযিলাত ও মর্যাদা তাদের জানা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক নও-মুসলিম ছিল যারা আম্মার প্রসঙ্গে অজ্ঞ ছিল। তাদেরই একজন ইবনুল গাবিয়া–তীর নিক্ষেপ করে আম্মারকে প্রথম মাটিতে ভূপতিত করে দেয়। তারপর অন্য একজন শামী ব্যক্তি তরবারি দিয়ে দেহ থেকে তাঁর মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

আম্মারকে শহীদ করার পর হত্যাকারী দু'জনই এককভাবে এ কৃতিত্ব দাবি করে ঝগড়া শুরু করে দেয়। ঝগড়া করতে করতে তারা মুয়াবিয়া (রা)-এর কাছে উপস্থিত হয়। ঘটনাক্রমে আমর ইবনুল আসও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি লানত করে তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, এরা দু'জন জাহান্নামের জন্য ঝগড়া-বিবাদ করছে।' এক কথায় আমীর মুয়াবিয়া একটু ক্ষুণ্ন হয়ে বললেন, 'আমর, তুমি এ কি বলছ? যারা আমাদের জন্য জীবন দিচ্ছে, তাদের সম্পর্কে এমন কথা বলছ?' আমর বললেন, 'আল্লাহর কসম, এটাই সত্য কথা। আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে যদি আমার কথা হতো, কতই না ভালো হতো।'

আম্মারের (রা) শাহাদাতের পর 'আমর ইবনুল 'আস দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি এ সংঘাত থেকে কেটে পরার জন্য তৈরি হয়ে যান। কিন্তু মুয়াবিয়া তাকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, আম্মারের হত্যাকারী আমরা নই, বরং যারা তাকে ঘর থেকে বের করে এ যুদ্ধের ময়দানে সাথে করে নিয়ে এসেছে বাস্তবে তারাই তাঁর প্রকৃত হত্যাকারী। (তাবাকাত)

পর্যালোচনা : আম্মার (রা)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে সত্য মিথ্যার ফায়সালা নির্ধারিত হয়ে যায়। খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) উষ্ট্রীর যুদ্ধ ও সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোন পক্ষেই তরবারি কোষমুক্ত করেননি। আম্মারের শাহাদাতের পর তিনি বুঝলেন, আলীর পক্ষ অবলম্বন করাই অত্যাবশ্যক। তিনি এবার তরবারি কোষমুক্ত করে মুয়াবিয়া (রা)-এর বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ হন। এমনিভাবে যে সকল সাহাবী দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে দোল খাচ্ছিলেন, তাঁরাও সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে আলী (রা)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন।

আলী (রা) তাঁর প্রিয় সংগী আম্মার (রা)-এর শাহাদাতের সংবাদ শ্রবণ করে দুঃখের সাথে বলে ওঠেন, "যেদিন আম্মার ইসলাম কবুল করেছে, তার ওপর আল্লাহ্ রহম করেছেন, যেদিন সে শাহাদাত বরণ করেছে, তার ওপর আল্লাহ্ রহম

করেছেন এবং যেদিন সে জীবিত হয়ে উঠবে আল্লাহ তার ওপর রহম করবেন। আমি সেই সময় তাঁকে রাসূলে করীম ﷺ-এর সাথে অবস্থান করতে দেখেছি যখন মাত্র চার-পাঁচ জন সাহাবীর ঈমানের ঘোষণা দানের সৌভাগ্য অর্জন হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ের সাহাবীদের কেউই তাঁর ক্ষমা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন না। আম্মার এবং সত্য একে অপরের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর হত্যাকারী নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী।"

সমাহিত : অতঃপর আলী (রা) আম্মারের সমাহিত করার নির্দেশ দেন। আলী জানাযার সালাত পড়ান এবং আম্মার রক্ত-ভেজা পোশাকেই দাফনের নির্দেশ দেন। এটি হিজরী ৮৭ সনের ঘটনা। আম্মার (রা) হলেন কুফার মাটিতে সমাহিত রাসূলে করীম ﷺ-এর প্রথম সাহাবী।

পরহেযগার ও খোদাভীতি : আম্মার ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার। তাকওয়া ও খোদাভীতির কারণে সব সময় নীরব থাকতেন। সব সময় কম কথা বলতেন। ফিতনা-ফাসাদ থেকে সর্বদা আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতেন। কিন্তু আল্লাহ সবচেয়ে বড় ফিতনা দ্বারা তাঁর পরীক্ষা নেন এবং স্বার্থকভাবে সত্যের সহায়তাকারী বানিয়ে দেন।

বিনয় নম্রতা : বিনয় ও নম্রতার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। মাটিই ছিল তাঁর আরামদায়ক বিছানা। ওয়ালী থাকাকালেও অত্যন্ত সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। হাট বাজারের কেনাকাটা নিজেই সমাধা করতেন এবং নিজেই সবকিছু পিঠে করে বহন করতেন। সব কাজ নিজ হাতে সম্পাদন করতেন। আম্মারের এক সমসাময়িক ব্যক্তি ইবনে আবদুল হুজাইল বলেন, 'আমি কুফার আমীর আম্মারকে দেখলাম, তিনি কুফায় কিছু শসা ক্রয় করলেন। তারপর সেগুলো রশি দিয়ে বেঁধে নিজ পিঠে উঠালেন এবং বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন।

(রিজালুন হাওলার রাসূল -২১১)

আম্মার (রা)-এর প্রতিটি কাজের মূল প্রেরণা ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে গমনের পথে বার বার তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমি যদি জানতাম পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে অথবা পানিতে ডুব দিয়ে আমার জীবন বিলিয়ে দিলে তুমি আনন্দিত হবে, আমি তোমাকে সেভাবে খুশী করতাম। আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভ করা। আমি আশা করি, তুমি আমার এ উদ্দেশ্য নিষ্ফলন করবে না। (তারাকাত)

তাঁর চারিত্রিক মহত্ত্ব ও ঈমানী বলিষ্ঠতা সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলে করীম ﷺ বলেছেন, 'আম্মারের শিরা উপশিরায় ঈমান মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

রাসূলে করীম ﷺ অন্য সাহাবীদের কাছে আম্মারের ঈমান নিয়ে গর্ববোধ করতেন। একবার প্রখ্যাত সেনা নায়ক খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও আম্মারের মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে কিছু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গটি রয়েছে নবী করীম ﷺ-এর গোচরে এলে তিনি বলেন, 'যে আম্মারের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে আল্লাহ্ তার সাথে শত্রুতা পোষণ করবেন। যে আম্মারকে হিংসা করবে আল্লাহও তাকে হিংসা করবেন। অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে আমার পরে তোমরা আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে। তোমরা আম্মারের পথ ও পন্থা থেকে হিদায়াত গ্রহণ করবে।

আম্মার আল্লাহর ইবাদাতে বিশেষ স্বাদ পেতেন। সারারাত আল্লাহ্‌র স্মরণে রাত গুজার করতেন। কোন অবস্থাতেই সালাত কাযা করতেন না। একবার সফরে অবস্থান ছিলেন। গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। বহু চেষ্টার পরও পানি পেলেন না। তাঁর স্মরণ হলো, মাটিতো পানির বিকল্প। গোসলের পরিবর্তে তিনি গোটা দেহে ধুলোবালি মেখে সালাত আদায় করলেন। সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে নবী করীম ﷺ-এর নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, 'এমন অবস্থায় কেবল তায়াম্মুমই যথেষ্ট।'

বিশিষ্ট সাহাবী হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানকে (রা) বলা হয় 'সিররু রাসূলিল্লাহ'–রাসূলুল্লাহর ﷺ যাবতীয় গোপন জ্ঞানের অধিকারী। তিনি যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, জনগণ যখন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাবে তখন কার সাথে থাকতে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন? উত্তরে বললেন, 'তোমরা ইবনে সুমাইয়্যার সাথে থাকবে। তিনি আমরণ সত্য থেকে এক বিন্দু বিচ্যুত হবেন না। মহান সাহাবী হুজাইফার এটাই ছিল জীবনের শেষ কথা।

(রিজানুল হাওলার রাসূল–২১২)

হাদীস বর্ণনা : রাসূলে করীম ﷺ থেকে তিনি বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে আবু মূসা আশ'আরী, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর প্রমুখ সাহাবীসহ অনেক তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্তত ১১১৭টি বিভিন্ন বর্ণনা আম্মার ইবনে ইয়াসির কেন্দ্রিক পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বুখারীতে ৪, আবু দাউদে ১৬, তিরমিজীতে ১৪, নাসায়ীতে ৯, ইবনে মাজাহতে ৯, মুসনাদে আহমদে ৩৯, সহীহ ইবনে খুযায়মাতে ৬টি।

২১. যায়েদ ইবনে আম্র ইবনে নুফাইল

জাহিলী যুগের আরবগণ তাদের মেয়ে সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিত, যায়েদ কাকেও এ হীনকর্মে উদ্যত দেখলে বলতেন, ভাই এটাকে প্রোথিত করো না। আমি এর খরচের দায়িত্ব বহন করব। এভাবে তিনি বহু নিষ্পাপ সন্তানের জীবন রক্ষা করেছেন।

নাম পরিচয় : যায়েদ ইবনে আম্র ইবনে নুফাইল (রা) বিশিষ্ট সাহাবী সাঈদ ইবনে যায়েদ (আশায়রায়ে মুবাশশারার একজন)-এর পিতা এবং ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর চাচাত ভাই।

বংশ পরিচয় : বংশ তালিকা হলো– যায়েদ ইবনে 'আমর ইবনে নুফাইল ইবনে 'আবদুল উযযা ইবনে কুবত ইবনে রিয়্যাহ্ ইবনে রামাহ ইবনে 'আদী ইবনে কা'ব ইবনে লুআঈ। তাঁর মাতার নাম হায়দা।

তিনি বানু ফহম-এর খালিদের কন্যা। প্রথমে তিনি ছিলেন যায়েদের দাদা নুফাইলের বিবাহিতা সহধর্মিনী, সে সময় তাঁর গর্ভে ওমর (রা)-এর পিতা খাত্তাবের জন্ম হয়। নুফাইলের মৃত্যুর পর তার পুত্র 'আমর তাঁকে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সৎমাতাকে বিবাহ্ করা জাহিলী যুগে বৈধ ছিল। যায়েদ হায়দার এ দ্বিতীয় বিবাহের সন্তান। এ হিসেবে যায়েদ ও খাত্তাব একে অপরে বৈপিত্রেয় ভাই।

ইবরাহিমী ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই যায়েদ আরব ভূমিতে একত্ববাদের আলোর রশ্মি দেখতে পেয়েছিলেন এবং বিভ্রান্ত ধর্মাদর্শনসমূহের টানাপোড়নের মধ্যে থেকেও ইবরাহিমী ধর্মাদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। সত্য ধর্মের জন্য ছিল তাঁর অদম্য অনুসন্ধিৎসা। এ কারণে প্রথম থেকেই তিনি পৌত্তলিক আরবদের প্রতিমা পূজা ও দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু বলি উৎসর্গকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারেননি।

তাদের নানা অন্যায়-অনাচারকে তিনি সব সময় ঘৃণা করতেন এবং তাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতেন। বর্ণিত রয়েছে, একদা নবী করীম ﷺ বালদাহ উপত্যকায় গমন করলে যায়েদ ইবনে আমরের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। তখন তাদের সম্মুখে খাবার পরিবেশিত হলে যায়েদ এ বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন, প্রতিমার উদ্দেশ্যে যবাহ্কৃত পশুর গোশত আমি খাই না।

আরবদের পৌত্তলিক ধর্ম বনাম সত্য ধর্ম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করার উদ্দেশ্যে একদিন ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল, 'উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ, 'উসমান ইবনুল-হুওয়ায়রিছ ও যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল মিলিত হলেন। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হল যে, তাঁদের কওম যে ধর্মের অনুসরণ করছে তার কোন ভিত্তি নেই। নিজেদের হাতে গড়া পাথরের মূর্তির পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবান্তর। কোন উপকার-অপকার করার শক্তি তাদের। তা না কথা বলতে সক্ষম না কিছু শ্রবণ করতে সক্ষম।

বস্তুত তারা তাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। সুতরাং, দেশ-বিদেশে ঘুরে একনিষ্ঠ ইবরাহীমী দ্বীনের অনুসন্ধান করা হোক। সে অনুযায়ী তারা সত্য ধর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল খ্রিস্ট ধর্ম কবুল করলেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ অনুসন্ধানকার্যেই লিপ্ত থাকলেন এবং অবশেষে ইসলামে দীক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন, কিন্তু হাবশায় হিজরত করার পর সেখানে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং সে অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হল। আর উসমান ইবনুল হুওয়ায়রিছও ক্রমে গিয়ে খ্রিস্ট ধর্মের দীক্ষা নিল।

পৌত্তলিকতা থেকে বিরত : যায়েদ ইয়াহুদী বা খ্রিস্ট কোন ধর্মই গ্রহণ করলেন না, তবে পৌত্তলিকতা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন। আসমা বিনত আবু বকর (রা) বর্ণনা করেন, আমি যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলকে তাঁর অতি বৃদ্ধাবস্থায় দেখেছি কা'বা ঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন এবং বলছেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে যায়েদের প্রাণ, আমি ব্যতীত তোমাদের মধ্যে আর কেহ .এখন ইবরাহিমী দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত নেই। অতঃপর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি যদি জানতাম কোন মুখ তোমার কাছে অধিক প্রিয়, তা হলে আমি তাঁর অনুসরণে তোমার 'ইবাদত করতাম। কিন্তু আমি তা জানি না। এ বলে তিনি নিজ হতে সিজদায় মাথা অবনত করলেন।

দ্বীনে হানিফ অবলম্বন : সত্য দ্বীনের সন্ধানে তিনি দেশ-বিদেশ সফর করতে করতে শাম (সিরিয়া) দেশে পৌছেন। সেখানে এক ইয়াহুদী পণ্ডিতের কাছে তিনি তাঁর সফরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন এবং তাকে ইয়াহুদী ধর্মের দীক্ষা দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে পণ্ডিত তাকে বললেন, আপনি যদি আল্লাহর ক্রোধে পতিত হতে চান, তা হলে আমাদের ধর্মের দীক্ষা নিন। তিনি বললেন, আমি তো এটা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তা হলে আপনি আমাকে কি পরামর্শ দেন? তিনি বললেন, আপনি দ্বীন-ই হানীফ অবলম্বন করুন।

যায়েদ জিজ্ঞাসা করলেন, দ্বীন-ই হানীফ কি? পণ্ডিত বললেন, এটা ইবরাহীম (আ)-এর একনিষ্ঠ ধর্ম। তিনি ইয়াহুদীও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না। তিনি মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদাত করতেন না। যায়েদ তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। সেখানে জনৈক খৃস্টান ধর্মযাজকের সাথে তাঁর সাক্ষাত লাভ হয়। তার সাথেও একই রকম আলাপ-আলোচনা হল। সে ধর্মযাজকও তাঁকে একই পরামর্শ দান করলেন। যায়েদ তাঁদের কাছ থেকে উক্ত পরামর্শ লাভের পর দ্বীন-ই হানীফ অনুসরণ করতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মাদর্শেরই একজন।

মৃত্যুবরণ : ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, শামের অন্তর্গত বালক নামক স্থানে জনৈক খ্রিস্টান রাহিবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁর কাছে ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মাদর্শ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। রাহিব তাঁকে বললেন, আপনি এমন এক দ্বীনের সন্ধান করছেন, যার দীক্ষা প্রদান করার মতো কোন ব্যক্তি এখন আর পৃথিবীতে নেই। তবে শেষ নবীর আগমনকাল অতি সমাসন্ন। আপনারই দেশে তিনি জন্ম লাভ করবেন। তিনি ইবরাহিমী দ্বীনসহই প্রেরিত হবেন। আপনি তাঁর শরণাপন্ন হোন। একথা শুনার পর তিনি আর বিলম্ব করলেন না। তাড়াতাড়ি স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু লাখম গোত্রের এলাকায় পৌছাতেই তিনি সেখানকার বাসিন্দাদের হাতে নিহত হন।

জাহিলী যুগের আরবগণ তাদের মেয়ে সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিত, যায়েদ কাকেও এ হীনকর্মে উদ্যত দেখলে বলতেন, ভাই এটাকে প্রোথিত করো না। আমি এর খরচের দায়িত্ব বহন করব। এভাবে তিনি বহু নিষ্পাপ সন্তানের জীবন রক্ষা করেছেন।

একজন কবি : যায়েদ ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের কবি। তাঁর কবিতায় পৌত্তলিকতার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও একত্ববাদের প্রতি গভীর অনুরাগ ফুটে উঠেছে।

তাঁর স্ত্রী সাফিয়া বিনতুল হাদরামী তাঁর সমাজ বিচ্ছুতি ধর্মাচারের কারণে তাঁর প্রতি ছিল প্রবল অসন্তুষ্ট। তিনি যাতে সত্য ধর্মের সন্ধানে দেশ-ভ্রমণে বের না হন, এজন্যও সাফিয়া আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাই তিনি স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করে কবিতা রচনা করেছিলেন।

যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল সাহাবী ছিলেন কিনা এটা আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। আল বাগাবী (র) ও ইবনে মানদা (র) প্রমুখ তাঁকে সাহাবীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কিন্তু ইবনে হাজার আল-আসকালানী তাতে ঘোর আপত্তি করে বলেন, তাঁর মৃত্যু হয় নবী করীম ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে। এমতাবস্থায় তাঁর সাহাবী হওয়ার প্রশ্নই আসে না? তবে হ্যাঁ, যদি সাহাবী হওয়ার জন্য ঈমানের সাথে তাঁর সাক্ষাত লাভ আবশ্যক না হয় এতটুকুই যথেষ্ট হয়, যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি এ বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, তিনি অচিরেই আবির্ভূত হবেন, তা হলে অবশ্য যায়েদ ইবনে 'আমর ও তাঁর মতো বক্তিগণকে সাহাবীরূপে গণ্য করা অযৌক্তিক নয়।

উল্লেখ্য, নবী করীম ﷺ-এর অতিশীঘ্র নবীরূপে আবির্ভাব হওয়া সম্পর্কে যায়েদ ইবনে আমরের গভীর বিশ্বাস ছিল। এর প্রমাণ যেমন পূর্ববর্তী আলোচনা দ্বারা পাওয়া যায়, তেমনি অন্যান্য বর্ণনা দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয়। আমির ইবনে রাবী'আ বলেন– যায়েদ ইবনে আমর মক্কা থেকে হিরা পর্বতের উদ্দেশ্যে গমন করছিলেন। পথিমধ্যে আমার সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে।

তিনি বললেন, হে আমির! আমি আমার সম্প্রদায়ের ধর্ম পরিত্যাগ ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মাদর্শ অনুসরণ করেছি এবং তাঁর পর ইসমাঈল (আ) যার ইবাদাত করতেন তাঁর ইবাদাতে নিজেকে নিবেদিত করেছি। আমি এ প্রতীক্ষায় রয়েছি যে, শীঘ্রই ইসমাঈলের বংশধর আবদুল মুত্তালিবের খান্দানে একজন নবীর আভির্ভাব ঘটবে। তবে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য বলে আমার মনে হয় না। তাঁর পূর্বে হয়ত আমার মৃত্যু ঘটবে। তবে আমি তাঁর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে এ সাক্ষ্য দেই যে, তিনি একজন আল্লাহর প্রেরিত নবী।

আমি তোমাকে তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে দিচ্ছি যা দ্বারা তুমি তাঁকে সহজেই চিনতে পারবে। তুমি যদি জীবিত থাক এবং তাঁর সাক্ষাত লাভ কর, তা হলে তাঁকে আমার সালাম জানাইও। আমির বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী করীম ﷺ-কে তাঁর সালাম পৌঁছালাম। তিনি জবাব দিলেন এবং তাঁর জন্য প্রার্থনা করলেন। সে সাথে তিনি বললেন, আমি তাকে জান্নাতে দেখতে পেয়েছি। ইসহাক বলেন, বর্ণিত আছে যে, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ও যায়দ পুত্র সাঈদ ইবনে যায়দ (রা) নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর নবী ﷺ! যায়েদ ইবনে আমর কেমন ব্যক্তি ছিলেন তা আপনি জানেন, আমরা কি তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ কিয়ামতে সে একাই এক উম্মতরূপে উত্থিত হবে। যায়েদ ইবনে আমর এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তান রেখে যান।

পুত্র সুবিখ্যাত সাহাবী ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অন্যতম সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)-এর কন্যা আতিকা। আতিকা (রা)-ও একজন সাহাবী এবং আবু বকর (রা)-এর সন্তান আবদুল্লাহর সহধর্মিনী ছিলেন। আবদুল্লাহর পর ওমর ইবনু খাত্তাব (রা) এবং তাঁর পর যুবাইর ইবনু আওয়াম (রা) তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। যায়েদের কর্মপন্থা যেমন তাঁর গভীর জ্ঞান ও বিজ্ঞতার পরিচায়ক, তেমনি তাঁর উক্তিসমূহেও প্রজ্ঞার নিদর্শন পরিস্ফুট। তিনি বলতেন, হে কুরাইশ! তোমরা অহংকার ও লোক দেখানোর মনোবৃত্তি পরিত্যাগ কর। কেননা তা দারিদ্র্য ডেকে আনে। আরো বলতেন, ব্যভিচার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দাও। কেননা ব্যভিচার দারিদ্র্যের উৎস।

জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিদের গুণাবলী

১. নরম দিল, খোশ মেজাজ, সর্বদা আল্লাহ্ ভীতু কারো কোন ক্ষতিকারী নয় এমন ধৈর্যশীল ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقْوَامٌ مِثْلَ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ -

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন ব্যক্তি যাদের অন্তরসমূহ হবে পাখির অন্তরের ন্যায়। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা)

২. জান্নাতে গরীব-মিসকীন, ফকীর পরমুখাপেক্ষী দুর্বল লোকদের সংখ্যাধিক্য।

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (رضـ) سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوا بَلٰى قَالَ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٌ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَاُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ -

হারেসা বিন ওহাব (রা) নবী কারীম ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন : আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের গুণাবলীর কথা বলব না? সাহাবাগণ বলল : হ্যাঁ বলুন। তিনি বললেন : প্রত্যেক দুর্বল, লোক চোখে হেয়, কিন্তু সে যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর নামে কসম করে তাহলে আল্লাহ্ তার কসম পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের কথা বলব না? তারা বলল, বলুন। তিনি বললেন : প্রত্যেক ঝগড়াকারী, দুশ্চরিত্র, অহংকারী ব্যক্তি। (মুসলিম)

৩. নরম দিল, ভদ্র, খোশ মেজাজ ও প্রত্যেক ভালো ব্যক্তি যাকে চিনে।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ النَّاسِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক নরম অন্তর ভদ্র এবং মানুষের সাথে মিশুক লোকদের জন্য জাহান্নাম হারাম। (আহমেদ)

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ أُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبٰى قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّأْبٰى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ أَبٰى ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে ঐ সব লোক ব্যতীত যারা জান্নাতে যেতে চায় না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কে জান্নাতে যেতে চায় না? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার নাফরমানী করে সে জাহান্নামী। (বুখারী, কিতাবুল ইতে'সাম বিল কিতাবি ওয়াস্‌সুন্ন। বাব ইকতেদা বি সুনানি রাসূলিল্লাহ)

৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি প্রতিদিন বার রাক'আত সালাত (ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত, জোহরের পূর্বে চার রাকআত, পরে দু'রাকআত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, এশার পরে দু'রাক'আত সুন্নাত) আদায় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رضـ) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّىْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللّٰهُ لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ ـ

নবী কারীম ﷺ-এর স্ত্রী, উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে

প্রতিদিন ফরজ ব্যতীত বার রাক'আত নফল সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (মুসলিম, কিতাব সালাতুল মুসাফেরীন, বাব ফযলু সুনানিরম্বাতিবা) .

৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اَعْمَلُهُ يُدْنِيْنِىْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رِحْمِكَ فَلَمَّا اَدْبَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ تَمَسَّكَ بِمَا اُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল : আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলেন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন : আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, যখন ঐ লোক ফিরে যেতে লাগল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে যা করতে বলা হল যদি সে এর ওপর আমল করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বয়ানুল ঈমান আল্লাযী ইয়াদখুলুল জান্নাহ)

৭. চরিত্রবান, তাহাজ্জুদগুজার, অধিক পরিমাণে নফল রোযা আদায়কারী ও অন্যকে খাদ্য দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرٰى ظُهُوْرُهَا مِنْ بُطُوْنِهَا وَبُطُوْنُهَا مِنْ ظُهُوْرِهَا فَقَامَ اِلَيْهِ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِىَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ؟ قَالَ هِىَ لِمَنْ اَطَابَ الْكَلاَمَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ـ

আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতে এমন কিছু ঘর আছে যার ভিতর থেকে বাহিরের সব কিছু দেখা যাবে,

আবার বাহির থেকে ভিতরের সব কিছু দেখা যাবে। এক বেদুইন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ঘর কার জন্য? তিনি বললেন : ঐ ব্যক্তির জন্য যে ভালো কথা বলে, অন্যকে আহার করায়, অধিক পরিমাণে নফল রোযা রাখে, আর যখন লোকেরা আরামে নিদ্রারত থাকে তখন উঠে সালাত আদায় করে। (তিরমিযী, আবওয়াবুল জান্না, বাব মা যায়া ফি সিফাত গুরাফিল জান্না– ২/২০৫১)

৮. ন্যায়পরায়ণ বাদশা, অপরের প্রতি অনুগ্রহকারী, নরম অন্তর, কারো নিকট কোন কিছু চায় না এমন ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ خُطْبَتِهٖ وَاَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُوْسُلْطَانٍ مُقْسِطٍ مُتَصَدِّقٍ وَمُوَافَقٍ رَجُلٍ رَحِيْمٍ رَقِيْقِ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيْفٍ مُتَعَفِّفٍ ذُوْعَيَالٍ ـ

ইয়াজ বিন হিমার মাজাসেয়ী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : তিন প্রকারের লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। ন্যায়পরায়ণ বাদশা, সত্যবাদী, নেক আমলকারী, আর ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়ের সাথে এবং প্রত্যেক মুসলমানের সাথে দয়া করে। ঐ ব্যক্তি যে লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে এবং বিনা প্রয়োজনে কারো নিকট কোন কিছু চায় না। (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়িমিহা, বাব সিফাতু আহলিল জান্না ওয়ান্নার)

৯. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনায় আনন্দ অনুভবকারী, ইসলামকে সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীয় দ্বীন হিসেবে বিশ্বাসকারীও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ -কে নবী হিসেবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। (আবু দাউদ, আবওয়াবুল বিতর, বাব ফিল ইস্তেগফার– ১/১৩৫৩)

১০. দুই বা দুয়ের অধিক কন্যাকে সুশিক্ষা দানকারী এবং বালেগা হওয়ার পর তাদেরকে সুপাত্রে পাত্রস্থকারী ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ وَضَمَّ اَصَابِعَهٗ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা তাদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, শেষ বিচারের দিন আমি ও ঐ ব্যক্তি এক সাথে উপস্থিত হব, একথা বলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন (যে এভাবে)। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব ফযলল ইহসান ইলালবানাত)

১১. ওজুর পর দুই রাক'আত নফল সালাত (তাহিয়্যাতুল ওজু) রীতিমত আদায়কারীও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِبِلَالٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ يَابِلَالُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهٗ عِنْدَكَ فِى الْاِسْلَامِ مَنْفَعَةً فَاِنِّىْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ قَالَ بِلَالٌ مَاعَمِلْتُ عَمَلًا فِى الْاِسْلَامِ اَرْجٰى عِنْدِىْ مَنْفَعَةً مِنْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا تَامًّا فِىْ سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَالِكَ الطُّهُوْرِ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ফজরের সালাতের পর বেলাল (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তোমার এমন কি আমল আছে যার বিনিময়ে তুমি পুরস্কৃত হওয়ার আশা রাখ? কেননা আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার চলার শব্দ পেয়েছি। বেলাল (রা) বলল : আমি এর চেয়ে অধিক কোন আমল তো দেখছি না যে, দিনে বা রাতে যখনই আমি ওজু করি তখনই যতটুকু আল্লাহ তাওফীক দেন ততটুকু নফল সালাত আমি আদায় করি। (বুখারী ও মুসলিম, মুখতাসার সহীহ মুসলিম লি আলবানী, হাদীস নং ১৬৮২)

১১. যথাযথ সালাতী ও স্বামীর অনুগত স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّتِ الْمَرْاَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصُنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الْجَنَّةَ مِنْ اَىِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, স্বীয় লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে শেষ বিচারের দিন তাকে বলা হবে যে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। (ইবনে হিব্বান, সহীহ আল জামে আসসাগীর ওয়া যিয়াদাতিহি লি আলবানী, ১ম খণ্ড হাদীস নং ৬৭৩)

১৩. আম্বিয়া, শহীদ, ঈমানদারদের নবজাতক শিশু মৃত্যুবরণকারী এবং জীবন্ত প্রোথিত সন্তান (অন্ধকার যুগে যা করা হতো) জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ حَسْنَا بِنْتِ مُعَاوِيَةَ (رضـ) قَالَتْ حَدَّثَنَا عَمِّىْ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَنْ فِى الْجَنَّةِ؟ قَالَ النَّبِىُّ فِى الْجَنَّةِ وَالشَّهِيْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالْوَلِيْدُ فِى الْجَنَّةِ ـ

হাসনা বিনতে মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমাকে আমার চাচা এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : আমি নবী কারীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, কোন ধরনের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন : নবীরা জান্নাতী, শহীদরা জান্নাতী, (মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু জান্নাতী, (অন্ধকার যুগে)) জীবন্ত প্রোথিত শিশু জান্নাতী।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব ফি ফজলিশ্শুহাদা- ২/২২০০)

১৪. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

মুয়াজ বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ততক্ষণ পর্যন্ত সংগ্রাম করেছে যতক্ষণ কোন উটের দুধ দোহন করতে সময় লাগে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। (তিরমিযী, আবওয়াব ফজলুল জিহাদ, বাবা মা যায়া ফিল মুজাহিদ ওয়াল মুকাতিব, ওয়ান্নাকেহ– ২/১৩৫৩)

১৫. মুত্তাকী এবং চরিত্রবান জান্নাতে যাবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ الْجَنَّةَ قَالَ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ اَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسُ النَّارَ قَالَ اَلْفَمُ وَالْفَرْجُ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল কোন আমলের কারণে সর্বাধিক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন : তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) ও উত্তম চরিত্র। (তিরমিযী, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব মাযায়া ফি হুসনিল খুলক)

১৬. ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতী হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهٗ اَوْ لِغَيْرِهٖ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَاَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطٰى ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : ইয়াতীমের লালন-পালনকারী, চাই ইয়াতীম তার আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় ও আমি জান্নাতে এ দু' আঙ্গুলের ন্যায় এ বলে তিনি তাঁর দু' আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন যে এভাবে এক সাথে থাকব। ইমাম মালেক (র) শাহাদাত ও মধ্যাঙ্গুলের প্রতি ইশারা করে দেখিয়েছেন। (মুসলিম, কিতাবুযযুহদ, বাব ফজলুল ইহসান ইলা আল আরমিলা ওয়াল মিসকীন ওয়াল ইয়াতীম)

১৭. যার হাজ্জ কবুল হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক ওমরা থেকে অপর ওমরার মাঝে যে পাপ করা হয়, পরবর্তী ওমরা তার জন্য কাফ্ফারা আর কবুল হজ্জের একমাত্র পুরস্কার হল জান্নাত। (বোখারী ও মুসলিম, কিতাবুল ওমরা, বাব ওজুবুল ওমরা ওয়া ফজলুহা)

১৮. মসজিদ নির্মাণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللّٰهُ لَهٗ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهٗ ـ

ওসমান বিন আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর জান্নাতে নির্মাণ করবেন। (মুসলিম, কিতাবুযযুহদ, বাব ফজলু বিনায়িল মাসজিদ)

১৯. লজ্জাস্থান ও জিহ্বা সংরক্ষণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ـ

সাহাল বিন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি তার দাড়ি ও গোঁফের মধ্যবর্তীস্থান (মুখ এবং উভয় পায়ের মধ্যবর্তী স্থান (লজ্জাস্থান) সংরক্ষণের জিম্মা গ্রহণ করবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মা গ্রহণ করব। (বোখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব হিফজুল লিসান)

২০. প্রতিবেশীর প্রতি উত্তম আচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فُلاَنَةٌ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا قَالَ هِىَ فِى النَّارِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنَةٌ تُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ وَتُصَدِّقُ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاَقِطِ وَلاَتُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ওমুক নারী দিনে রোযা রাখে, রাতে তাহাজ্জুদ সালাত পড়ে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, নবী কারীম ﷺ বললেন : সে জাহান্নামী। অতঃপর সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করল যে, অন্য এক নারী শুধু ফরয সালাত আদায় করে, আর পনিরের এক টুকরা করে তা দান করে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কোন কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন : সে জান্নাতী। (আহমদ, তামামুল মিন্না বিবায়ানিল খিসাল আল মুওজিবা বিল জান্না, হাদীস নং ১৩৬)

২১. আল্লাহর নিরানব্বই নাম মুখস্তকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا اَوْ مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্ত করবে সে জান্নাতে যাবে। (বোখারী ও মুসলিম, আললু'লু ওয়াল মারজান। ২য় খণ্ড হাদীস নং ১৭১৪)

২২. কুরআনের হেফাজতকারী জান্নাতে যাবে।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اِقْرَاْ وَاصْعَدْ فَيَقْرَءُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ اٰيَةٍ دَرَجَةً حَتّٰى يَقْرَءَ اٰخِرَ شَىْءٍ مَعَهٗ ـ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : কুরআন সংরক্ষণকারী যখন জান্নাতে যাবে তখন তাকে বলা হবে কুরআন পাঠ করতে থাক এবং এক এক স্তর করে আরোহণ করতে থাক। তখন সে প্রত্যেক আয়াত পাঠের মাধ্যমে এককে স্তর করে আরোহণ করবে। এমনকি তার সংরক্ষিত (মুখস্তকৃত) সর্বশেষ আয়াত পাঠ করে সে তার নির্দিষ্ট স্থানে আরোহণ করবে এবং সেটাই তার ঠিকানা হবে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, আবওয়াবুজজিকর, বাব সাওয়াবুল কুরআন– ২/৩০৪৭)

২৩. বেশি বেশি সালাম বিনিময়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوا السَّلَامَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ـ

আবদুল্লাহ বিন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : হে মানবমণ্ডলী! সালাম বিনিময় কর, মানুষকে আহার করাও, যখন মানুষ ঘুমন্ত থাকে তখন সালাত আদায় কর, তাহলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতুল কিয়ামা, অনুচ্ছেদ নং ১০/২০১৯)

২৪. রুগী দেখাশোনাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَائِدُ الْمَرِيْضِ فِىْ مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ

সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : রুগীর দেখাশোনাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জান্নাতের বাগানে থাকে। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব ফযলু ইয়াদাতির মারিজ)

২৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (মুসলিম, কিতাবুজ যিকর ওয়াদ দুআ, বাব ফযলুল ইজতিমা' আলা তিলাওয়াতিল কুরআন)

২৬. সকাল-সন্ধ্যা সাইয়েদুল ইস্তেগফার পাঠকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا

عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهٖ قَبْلَ أَنْ يُّمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

সাদ্দাদ বিন আওস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : সাইয়েদুল ইস্তেগফার হল "আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, খালাকতানী, ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা, ওয়া ওয়দিকা মাস্তাতা'তু আউজুবিকা মিন সার্‌রি মা সানা'তু, আবুউলাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, আবুও বিজানবি, ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লাইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আন্তা।

হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা, আর আমি আমার সাধ্যমতো তোমার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্টতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার গুনাহসমূহ স্বীকার করছি, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি ব্যতীত গুনাহ মাফকারী আর কেউ নেই। যে ব্যক্তি একীনসহ এ দুয়া দিনের বেলায় পাঠ করে, আর সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতী, আর যে ব্যক্তি রাতের বেলা একীনসহ এ দোয়া পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে সেও জান্নাতী। (বোখারী, মুখতাসার সহী বুখারী লি যুবাইদী, হাদীস নং ২০৭০)

২৭. যার চোখ অন্ধ হয়ে যায় আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ـ

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী কারীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন : আল্লাহ বলেন : আমি যখন আমার কোন প্রিয় বান্দাকে তার দুটি প্রিয় অঙ্গ (চোখ দ্বারা) পরীক্ষা করি, আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে তখন এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি। (বোখারী, কিতাবুল মারাজ, বাব ফজলু মান জাহাবা বাসারুহু)

২৮. পিতা-মাতার সেবাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهٗ رَغِمَ اَنْفُهٗ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْكِلاَيْهِمَا

আবু হুরাইরা (রা) নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলায় ধুলণ্ঠিত হোক, যে তার পিতা-মাতাকে বা তাদের কোন একজনকে বা উভয়কে বৃদ্ধ বয়সে পেল অথচ তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করতে পারল না। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব তাকদীম বিরুল ওয়ালিদাইন আলা তাতাউ' বিসসালা)

২৯. মুসলমানদের কোন কষ্টদায়ক বস্তু দূরকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّجَرَةَ كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسْلِمِيْنَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : একটি গাছ মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে ছিল, তখন এক ব্যক্তি এসে তা কেটে দিল, এর বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করল। (মুসলিম, কিতাবুল বির ওয়াসসিলা, বাব ফজলু ইযালাতিল আযা মিনাত্তারীক)

৩০. রোগে ধৈর্যধারণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ لِىْ اِبْنُ عَبَّاسٍ (رضـ) اَلاَ اُرِيْكَ اِمْرَاَةً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ اِنِّىْ اُصْرَعُ وَاِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ لِىْ، قَالَ اِنْ شِئْتِ

صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةَ، وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتِ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيْكَ فَقَالَتْ اَصْبِرُ فَقَالَتْ اِنِّىْ تَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ لِىْ اَنْ لَّا اَتَكَشَّفَ فَدَعَالَهَا ـ

আতা বিন রাবাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী রমণী দেখাব না? আমি বললাম, কেন নয়, তিনি এক মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : গতকাল যে মহিলাটি নবী কারীম ﷺ এর নিকট এসে বলল যে, আমি মিরগী রুগী, আর এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়, তাই আপনি কি আমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্ আমাকে সুস্থ্ করেন? তিনি বললেন : যদি তুমি চাও তাহলে ধারণ কর আর এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাকে সুস্থ্ করবে। আর যদি তুমি চাও তা হলে আমি তোমার জন্য দোয়া করি, তিনি তোমাকে সুস্থ্ করে দিবেন। তখন ঐ নারী বলল : আমি ধৈর্য ধারণ করব, কিন্তু সাথে এ আবেদনও করছি যে, এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যাতে আমার সতর না খুলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দোয়া করলেন। (বোখারী, কিতাবুল মারজা, বাব ফজলু মান ইয়ুসরাউ মিনাররিহ)

৩১. নবী, শহীদ, সিদ্দীক, মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং স্বীয় স্বামীর ভক্ত, অধিক সন্তান জন্মদানে কষ্ট সহ্যকারী এবং স্বামীর নির্যাতনে ধৈর্যধারণকারিণী ও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْمَوْلُوْدُ فِى الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُوْرُ اَخَاهُ فِىْ نَاحِيَةِ الْمِصْرِ فِى اللّٰهِ فِى الْجَنَّةِ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ اَلْوَدُوْدُ الْوَلُوْدُ، اَلْعَوْدُ الَّتِىْ اِذَا ظُلِمَتْ قَالَتْ هٰذِهِ يَدِىْ فِىْ يَدِكَ، لاَ اَذُوْقُ غَمْضًا حَتّٰى تَرْضٰى ـ

কা'ব বিন আজরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : আমি কি জান্নাতী পুরুষদের কথা তোমাদেরকে বলব না? নবী, শহীদ, সিদ্দীক, মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু, দূর থেকে স্বীয় মুসলিম ভাইকে আল্লাহ্‌র

সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেখতে আসে এমন ব্যক্তি জান্নাতী, (তিনি আরো বলেন) আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী মহিলাদের ব্যাপারে অবগত করাব না? স্বীয় স্বামী ভক্ত, অধিক সন্তান প্রসবে ধৈর্যধারণকারী, ঐ সতী নারী যে তার স্বামীর অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে বলে যে, আমার হাত তোমার হাতে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রাগ করব না যতক্ষণ না তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও। (ত্বাবারানী, আল জামে'আসসাগীর লি আলবানী, হাদীস নং ২৬০১)

৩২. শরীয়তে হালালকৃত বিষয়গুলোকে হালাল এবং হারামকৃত বিষয়গুলোকে হারাম বলে জানা এবং সে অনুযায়ী আমলকারীও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَرَاَيْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ وَصُمْتَ رَمَضَانَ وَاَحْلَلْتَ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتَ الْحَرَامَ وَلَمْ اَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ شَيْئًا اَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ نَعَمْ ـ

জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি ফরজ সালাত আদায় করি, রমযানে রোযা রাখি শরীয়তে হালালকৃত বিষয়গুলোকে হালাল বলে মনে জানি এবং যাতে হারামকৃত বিষয়গুলোকে হারাম বলে জানি, আর এর চেয়ে অধিক আর কোন কিছু না থাকে তাহলে কি আমি জান্নাত পাব? তিনি বললেন : হ্যাঁ। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব বায়ান আল্লাজি ইয়দখুলুল জান্না)

৩৩. দু'জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চার মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةِ الْاَنْصَارِ لَايَمُوْتُ لِاِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ اِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ اَوِاثْنَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ اَوِاثْنَانِ ـ

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এক আনসারী মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে যার দুটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে আর সে তাতে সওয়াবের আশা নিয়ে ধৈর্যধারণ করে সে জান্নাতী হয়, তাদের মধ্যে এক নারী জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! যদি দু'জন মৃত্যুবরণ করে? তিনি বললেন : দু'জন মৃত্যুবরণ করলেও। (মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াসসিলা, বাব ফজলু মান ইয়ামুতু লাহু ওলাদ ফায়াহতাসাবুহু)

পিস পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম		মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবী, বাংলা, ইংরেজী)		১০০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN		২০০
৩.	কিতাবুত তাওহীদ	- মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৪.	বিষয়ভিত্তিক-১-কুরআন ও হাদীস সংকলন	-মো: রফিকুল ইসলাম	৩৫০
৫.	বিষয়ভিত্তিক -২ - লা-তাহ্যান (Don't be Sad)	- ডা. মুহাম্মদ নূর হোসাইন	৪০০
৬.	রাসূলুল্লাহ (স.) এর হাসি কান্না ও জিকির	- মো: নূরুল ইসলাম মণি	২১০
৭.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা - ইকবাল কিলানী		১৫০
৮.	রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
৯.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন	- যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১০.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন	-ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
১১.	রাসূল (স.) এর ২৪ ঘন্টা	- মুফতী আবুল কাসেম গাজী	২২৫
১২.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী	- মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
১৩.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী	- মো: নূরুল ইসলাম মণি	২০০
১৪.	রাসূল (স.) সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন	-সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
১৫.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	-মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
১৬.	রাসূল (স.) লেনদেন ও বিচার ফয়সালা	- মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
১৭.	রাসূল (স.) জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে	- ইকবাল কিলানী	১৩০
১৮.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	- ইকবাল কিলানী	২২৫
১৯.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে)	- ইকবাল কিলানী	২২৫
২০.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব)	- ইকবাল কিলানী	১৫০
২১.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী	-সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
২২.	Golden Usefull Wordbook (আরবী-বাংলা-ইংরেজী)	- মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী	১২৫
২৩.	দোয়া কবুলের পূর্বশত	- মো: মোজাম্মেল হক	১০০

বের হচ্ছে ....

ক. কবীর গুনাহ, খ. বুলুগুল মারাম বা বাছাইকৃত ১৫০০ হাদীস, গ. জাদু টোনা, ঘ. শেখ আহমদ দিদাত লেকচার সমগ্র ঙ. ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র, চ. বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান

ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

২৪.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫
২৫.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
২৬.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ ও তার প্রমাণভিত্তিক জবাব	৬০
২৭.	প্রশ্নোত্তরে ইসলামে নারীর অধিকার -আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০
২৮.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০
২৯.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০
৩০.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৩১.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৩২.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
৩৩.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
৩৪.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
৩৫.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
৩৬.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
৩৭.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
৩৮.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
৩৯.	সালাত : রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নামায	৬০
৪০.	ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সাদৃস্য	৫০
৪১.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
৪২.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিৎ	৫০
৪৩.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
৪৪.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৪৪.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
৪৬.	পোশাকের নিয়মাবলী	৪০
৪৭.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৪৮.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (সা.)	৫০
৪৯.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
৫০.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
৫১.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
৫২.	সিয়াম : আল্লাহ'র রাসূল (স.) রোজা রাখতেন যেভাবে	৫০
৫৩.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৫৪.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৫৫.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৫৬.	ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	
৫৭.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
৫৮.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০
৫৯.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৬০.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৬১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৬৩.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০
৬৪.	রমজানের ত্রিশ শিক্ষা ডা. জাকির নায়েক	২০০